দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

চখাচখি



চখাচখি

চখাচখি

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

শব্দ প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০২৪

শব্দ প্রকাশন ৭৭/২ কিউ ইব্রাহিমপুর রোড, যাদবপুর, কলকাতা ৭০০ ০৩২ কর্তৃক প্রকাশিত এবং শরৎ ইম্প্রেশনস প্রা. লি., ১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭৩ থেকে মুদ্রিত।

ISBN 978-93-94659-76-6

অলংকরণ: আশীষ ভট্টাচার্য

বিপণি

শব্দ প্রকাশন

স্টল নং ১১, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার (দক্ষিণ), কলকাতা ৭০০ ০১২

Chokhachokhi

[Collection of short stories]

by

Debjyoti Bhattacharyya

Shabdo Prokashon

77/2Q Ibrahimpur Road, Jadavpur, Kolkata 700 032

Contact/WhatsApp : 9851741215, email : shabdopub@gmail.com

মালকিনকে—

কিছু কথা...

রবীন্দ্রনাথ কবেই বলে গেছেন, "...শেষ হয়ে হইল না শেষ..." আমরা তো ছার, কে পারে সেই অমোঘ টান উপেক্ষা করতে! সেই রেশ আজও বর্তমান, বহাল তবিয়তে— ছোটোগল্প। দিনের শেষে গরম ভাতের পাশে নরম নুনের মতো থেকে যাওয়া— আটপৌরে জীয়নের সব মুহূর্তগাথা— ছোটোগল্প।

একটি দৃশ্য ভাববার চেষ্টা করুন তো— ট্রেনের জানালা, নাম-না-জানা স্টেশন, জানলায় শাড়ি পরিহিতা এক তন্বী বই হাতে বসে আছে, এলোমেলো চুল তার মুখের পাশে উড়ছে, দুই আঙুলে কানের পাশে সে গুঁজে রাখছে সেই অলোকচূর্ণ, মৃদুমন্দ বাতাসে কামরা জুড়ে অদ্ভুত সম্মোহন! আপনি কি উপেক্ষা করতে পারবেন এই দৃশ্য? এই দৃশ্য-মায়া কি আপনাকে কোনোভাবেই বিব্রত করবে না— মিঠেল বিব্রত! কিংবা এক বৃদ্ধ দম্পতির হাতে হাত; রুক্ষ হাত, আন্তরিকতায় ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আছে অতীত, অভিজ্ঞতার এক দীর্ঘ যাপন, আকাশে চখাচখির দ্বৈত উড়ে যাওয়া। পারবেন এই সম্পর্কের টাইমলাইন থেকে বিচ্যুত হতে? কিংবা, কেউ কি আদৌ পারে!

এভাবেই আবহমানকাল ধরে বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্পের মাধুর্যের গতিপথ এগিয়েছে— ছোটো-ছোটো গল্পের প্লট আমরা নিজেদের মধ্যে বুনে যাই, খুঁজে যাই। এই আখ্যানে লেখক একের পর এক দৃশ্যের অবতারণা করেন যার রেশ বুনে দেয় এক অপার কৌতূহল, আমরা নিজেরাই নিজেদের আবিষ্কার করি গল্প থেকে উঠে আসা বিভিন্ন চরিত্রে কিংবা নিজেরাই হয়ে উঠি এক-একটি চরিত্র!

আমাদের এই অনুভব যদি পাঠককেও ছুঁয়ে যায় তাহলেই আমাদের এই শ্রম সার্থক হয়েছে বলে জানব।

ধন্যবাদ।

শব্দ প্রকাশন

সূচি



চখাচখি

"তিয়াস, এই তিয়াস—"

বেশ খানিকক্ষণ ধরে ডাকাডাকিটা চলছিলই। তিয়াস বারকয়েক কানের ওপর বালিশ চাপা দিয়ে ডাকটা এড়াবার চেষ্টা করল। শেষমেশ না পারতে বালিশ থেকে মুখ তুলে চোখ পিটপিট করে রাগ-রাগ গলায় বলে, "উঃ আর জ্বালিয়ো না তো মা! কাল কত রাতে শুয়েছি জানো তো—"

বলতে বলতেই মায়ের মুখের দিকে চোখ পড়তে একটু সন্ত্রস্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"তোর ঠাম্মাকে পাওয়া যাচ্ছে না রে।"

ধড়মড় করে উঠে বসল তিয়াস, "সে কী? কেক, পার্টি, সব সেলিব্রেশান রেডি আর বিয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর সকালে নায়িকা উধাও?"

"মজা করিস না তিয়াস," মা'র গলায় উদ্বেগের ছোঁয়া, "একা একা পথেঘাটে বুড়োমানুষ—"

"কেসটা বলো," উঠে তাড়াতাড়ি শার্টটা গায়ে গলাতে গলাতে তিয়াস বলল।

"সকালবেলা সদরে তালা দিয়ে রেখে রায়কতপাড়ার কালীবাড়িতে ওঁদের নামে পুজো দিতে বেরিয়েছিলাম। খানিক আগে ফিরে প্রসাদ নিয়ে ওঁদের ঘরে গিয়ে দেখি মা বিছানায় নেই। খিড়কির দোরটা খোলা হা-হা করছে।"

"মর্নিং ওয়াকে বেরোয়নি তো?"

উঁহু। বিয়ে হয়ে এসে ইস্তক কোনোদিন তো দেখিনি সকালে তোর দাদুকে চা না দিয়ে কোথাও গেছেন। বেছে বেছে শেষে আজকের দিনটাতেই এরকম করবেন নাকি?"

"দাদু—"

"সে আর এক মুশকিল। একটু আগে জেগেছেন। চা নিয়ে যেতে বললেন, 'বৌমা তুমি কেন? অণু কোথায়?' তারপর সব শুনে চা-টা না খেয়েই একেবারে বাসিমুখে বেরিয়ে চলে গেলেন খুঁজতে। একটা কথা শুনলেন না। সঙ্গে মোবাইল-টোবাইলও কিছু নেই, চোখেও দেখেন না ভালো! আমি যে কী করি!"

"দাদুর সাথে কোনো ঝগড়াটগড়া-মনকষাকষি হয়নি তো?"

মা ঠোঁট ওলটালেন, "সে তো রোজকার ব্যাপার। খিটিরমিটির লেগেই আছে সকালবিকেল। কালকেও তোর দাদুর ওষুধ খেতে ভুলে যাওয়া নিয়ে খানিক বকাঝকা হল। কিন্তু ওতে করে—"

"হুম। তা-ও বটে। তা আমায় বা বাবাকে আগে ডাকলে না কেন?"

"তোর বাবা অনেকক্ষণ আগেই ঘুম থেকে উঠে খুঁজতে বেরিয়ে গেছে স্কুটার নিয়ে। আর তোকে আমি কতক্ষণ ধরে ডাকছি জানিস? আয় এখন। তাড়াতাড়ি কর—"

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল তিয়াস। মনামী ডেকরেটার্সের গোপীনাথদা ঠোঁটে একটা বিড়ি ঝুলিয়ে প্যান্ডেলের তদারক করছিল উঠোনে। ওকে দোতলা থেকে নামতে দেখে বলে, "তিয়াসবাবা দেইখা যাও দাদুগোর লাইগ্যা কী জব্বর বেদি বানাইছি একখান! তুমার ছুটোকাকার নকশার সঙ্গে মিলাইয়া লও। চুক পাইবা না কোন। শিলিগুড়ি থেইক্যা স্পেশাল সিংহাসন আনাইছি—"

বেদিটা সত্যিই বেশ জমকালো হয়েছে। সিংহাসনটাও। এসবই হচ্ছে ছোটোকাকার প্ল্যান অনুযায়ী। ওর উৎসাহেই দাদু-ঠাকুমার বিয়ের সুবর্ণজয়ন্তীটা করা। সিয়াটলে বসে বসে গোটা অনুষ্ঠানটার প্ল্যান, নেমন্তন্নের লিস্ট থেকে শুরু করে কেক-এর ডিজাইন, রাতের লোক খাওয়াবার মেনু সব কিছু পাঠিয়ে চলেছে গত একমাস ধরে। আজ দুপুরের মধ্যে কাকিমাকে নিয়ে এসে পৌঁছোবার কথা ছোটোকাকার। এতক্ষণে দিল্লি পৌঁছে গেছে প্রায়। নেমেই তো প্রথমে বাড়িতে ফোন করে ঠাম্মাকে চাইবে। বাড়ি জুড়ে প্যান্ডেল, একপাশে বেদির ওপরে 'শুভ সুবর্ণজয়ন্তী' লেখা বোর্ড, সব কেমন ফ্যাকাশে ঠেকছিল তিয়াসের।

ফোনটা বেজে উঠল একবার। হাসপাতাল থেকে বাবার কল। ওখানে কিছু নেই। কাছাকাছি আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতেও যাননি। মন্দির-টন্দিরে খুঁজে লাভ নেই। ঠাম্মা আর দাদু দু'জনই ঘোর নাস্তিক। বাবা থানায় খবর দিতে যাচ্ছেন এখন। বললেন, "তুই সাইকেলে একটু বের হয়ে এদিক ওদিক দ্যাখ তো!"

বান্ধব নাট্য সমাজের একহারা গড়নের দোতলা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা দুজন। বৃদ্ধের চোখে বহুকালের চেনা সেই হাসিটা তিরতির করছে: "সেই প্রথমবারের কথা মনে আছে অণু?"

"মনে নেই আবার? কী যে রাগ হয়েছিল তোমার ওপর! অত কষ্ট করে পার্ট মুখস্থ করলাম, আর স্টেজে উঠে তুমি কিনা কিউ গুলিয়ে বেমালুম পরের ডায়ালগে চলে গেলে! কথাগুলো বলবার সুযোগই পেলাম না আমি।"

"ভাগ্যিস করেছিলাম। শোয়ের পরে রণরঙ্গিনী হয়ে তেড়ে এলে, আর আলাপটাও অমনি হয়ে গেল।"

"সেই বুদ্ধি করেই অমনটা করেছিলে নাকি?"

হেমেন্দ্র হাসলেন একটু। জবাব দিলেন না। একটু রহস্য থাক না!

বেলা বাড়ছে। অণুশীলা একটু চঞ্চল হচ্ছিলেন। হেমেন্দ্রর হাত ধরে মৃদু টান দিয়ে বললেন, "একসঙ্গে ঘুরে সুবর্ণজয়ন্তী সেলিব্রেশান হল তো? এবার চলো। দেরি কোরো না। বাড়িতে ওদিকে ওরা—"

"ড্যাম ইয়োর বাড়ি। সন্ধের পরে কেক কাটবে, মালা পরিয়ে চেয়ারে বসাবে। তখন গিয়ে সং সেজে বসলেই হবে'খন। এখন আমরা হাঁটব। শুধু আমরা দু-জন।"

অণুশীলা মুখ লুকিয়ে হাসলেন একটু। দেখিয়ে হাসা যাবে না আবার। যা মেজাজি মানুষ! খারাপ লাগছে না অবশ্য। কতকাল পরে— সেই প্রথমদিকের বছরগুলোর মতন—

"কামরাঙা মাখা কিনবে?"

হেমেন্দ্র একটু থমকে দাঁড়ালেন। ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞাগুলো একদল বেয়নেট উঁচনো পুলিশের মত ভাসছে চোখের সামনে। বড়োবউমা এসব ব্যাপারে বড়ো শক্ত শাসনে রাখে আজকাল। কামরাঙার নুন লংকা মেশানো টুকরোগুলো কেমন উলসে উলসে খেতো অণু। তিনিও দু একটা টুকরো তুলে নিতেন মাঝেমাঝে কাঠিতে করে। পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বের করে দিলেন তিনি, "নিয়ে নাও—"

***

"আর একটা নেবে নাকি?"

কাঠিতে করে একখানা তারামাছের মতো দেখতে নুনলঙ্কায় জারানো টুকরো তুলে মুখে পুরলেন হেমেন্দ্র। গাল ব্যথা করে লালা বের হয়ে আসছে।

"সরে এসো একটুখানি এদিকে," অণুশীলা খাওয়া বন্ধ করে শক্ত করে তাঁর হাতটা ধরেছেন। বড়ো ভিড় রাস্তায়। আগে এত ভিড় ছিল না। শীতের দুপুরে কতদিন এই করলার সেতুর ওপর দিয়ে একাকী সম্রাট হয়ে হেঁটে গেছেন তিনি তাঁর রাজ্ঞীকে পাশে নিয়ে। সেসময় সবার সামনে হাত ধরবার চল ছিল না। ভালোই হয়েছে সময় পালটে।

করলার সেতুর গায়ে শ্বেতপাথরের স্মৃতিফলকটার সামনে গিয়ে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন হেমেন্দ্র। "১৯৬৮-র চৌঠা অক্টোবর রাতে যাঁরা তিস্তার বন্যায় হারিয়ে গেলেন, তাঁদের স্মরণে—"

সুধীন তখন পেটে। জল উঠেছিল কোমর ছাপিয়ে। আসন্নপ্রসবা অণুশীলাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে নিয়ে দিকশূন্য জলজমির বুকে পাড় খোঁজবার যাত্রা। মৃত্যুকে সেই একবারই একেবারে মুখোমুখি দেখেছিলেন তাঁরা দু-জন—

"মনে পড়ে অণু?"

অনুশীলা মাথা নাড়লেন। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "হিরণকে মনে আছে তোমার? ও না থাকলে সেদিন—"

বড়ো প্রিয় ছাত্র ছিল সে অণুশীলার। সেই দুর্যোগের রাত্রে প্রিয় শিক্ষিকার সামনে সামনে সে-ও হেঁটেছিল রাক্ষসী তিস্তার জল ভেঙে, পায়ের স্পর্শে নিরাপদ পথ খুঁজে খুঁজে। তিস্তা তাকে সে রাত্রে ক্ষমা করেনি—

***

"এসো, ভেতরে গিয়ে বসি।"

যাযাবর রেস্তোরাঁর ছোট্ট একচালা বাড়ি। হেমেন্দ্রর পিছু পিছু ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে অণুশীলা ঠোঁট কামড়ালেন। বাড়িতে তোলপাড় হচ্ছে নিশ্চয়ই এতক্ষণে। কী যে ভূত চেপেছে আজ এর মাথায়। কিন্তু তার পরেই একটা আশ্চর্য বেপরোয়া আনন্দের অনুভুতি ছড়িয়ে গেল তাঁর শরীরেও। একটা প্রায় ভুলে যাওয়া শিরশিরে অনুভূতি ঝংকার তুলছিল তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে।

স্টিলের থালায় একূল-অকূল ছাপানো একটি চিতল মাছের পেটি— সুগন্ধী চালের ভাত— ম্যানেজারের চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে যাযাবর মানুষটি তাঁদের সঙ্গে বসেছেন। বত্রিশ বছরের বন্ধুত্ব। তখন তাঁদের মধ্যযৌবন। স্কুলের টিফিন টাইমে সময় চুরি করে নিয়ে কতদিন দু-জনে মিলে নতুন খোলা সেই দোকানের সুগন্ধী খাদ্যের স্বাদ নিয়েছেন—

পেটিটাকে দু'টুকরো করে বড়ো ভাগটা হেমেন্দ্রর পাতে তুলে দিলেন অনুশীলা।

হেমেন্দ্র হাসছিলেন, "গোটা একখানা করে পেটি আর কোনোদিন আমাদের খাওয়া হল না অণু। আগে সামর্থ্য ছিল না, আর এখন—"

"দাঁড়ান বৌউদি। আজ ভাগযোগ চলবে না। বিয়ের পঞ্চাশ বছর বলে কথা।

আজ আমার অ্যাকাউন্টেই দু-জন একটা করে গোটা—"

বৃদ্ধ মানুষটির হাত ছুঁয়ে হেমেন্দ্র নিরস্ত করলেন, "ছেড়ে দেন দাদা। শরীরে সইবে না এক্ষন আর। চিরটাকাল ভাগযোগ করেই তো খেয়ে এলাম দু-জনে। আমাদের কপালে ও ছাড়া আর কিছু লেখাই নেই—"

***

"হাতটা ধর—"

"উঁহু, পারব।"

পাড়ের উঁচু বাঁধ থেকে নেমে বালির চরের মধ্যে ইতিউতি জল বয়ে যায়। শীতের দুপুরে গা এলিয়ে ঘুমিয়ে আছে তিস্তা।

"পারবে জানি। তাও-হাতটা ধর অণু। ফর ওল্ড টাইমস সেক—" হেমেন্দ্র হাতটা বাড়িয়েই রয়েছেন একটু নীচু থেকে।

"তোমার আজ কী হয়েছে বল দেখি? কে কখন দেখে ফেলবে কোত্থেকে—" বলতে বলতেই স্বামীর হাতটা ধরে জলের বুকে এলেন অণুশীলা। এখানে হাঁটুজল। হেমেন্দ্রর কবোষ্ণ হাত। বেশ কিছু স্মৃতি ঘিরে আসে। সেই প্রথমদিকের দিনগুলো— কত অলস শীতের দুপুর কেটে গেছে এই তিস্তার জলে-খোলা আকাশের নীচে—"

"অণু— একবার সেই আগের মতো—"

তাঁর চোখের কোণে পাখির পায়ের ছাপ। তাঁর রুপোলি চুলে রুপোলি রোদ্দুর। চোখের জানালায় সেই পুরোনো দুষ্টুমির ঝিকিমিকি একবার খেলে গিয়েই ফের পর্দা নেমে এল, "তৈরি হয়ে আসিনি যে! বাড়িভরতি লোকজনের সামনে ভেজা কাপড়ে ফেরা— তা ছাড়া শীতের অবেলায় স্নান করে শেষে একটা অঘটন ঘটুক আরকী!"

"বুড়ো হয়ে গেলাম তাহলে?"

"নয়তো কী? শোনো, অবুঝপনা না করে, চলো উঠি। একটুক্ষণ পাড়ে বসে থেকে তারপর বাড়ি যাই।"

বেলা তিনটে বাজে প্রায়। রোদ ঢলছিল। ধু-ধু তিস্তার রুপোলি বালিভরা বুকে একফালি নীল টুকটুকে জল। তার পাশে দু'জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা একলা। তাঁদের পা গুলি তিস্তার জলকে স্পর্শ করে আছে। চোখ সামনের দিগন্তে স্থির।

"ভারি ফাঁকি দিয়েছি ওদের আজ। কী দারুণ প্ল্যানটা করেছিলাম বল তো?"

"সে করেছ। পারোও বটে তুমি। তা, শখ তো মিটল! এবারে উঠবে কী? রোদ ঢলছে যে! সুশীলও বোধ হয় বাগডোগরা থেকে বাড়িতে পৌঁছে গেছে। কী যে হচ্ছে ওদিকে এতক্ষণে—"

"উঁহু। আমাদের প্রোগ্রাম এখনও শেষ হয়নি।"

বালিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন অণুশীলা। কোমরে পুরোনো ব্যথাটা একটু একটু জানান দিচ্ছে এতক্ষণে।

"ঢের হয়েছে। ভীমরতি ধরা বুড়ো, তুমি একা একা বসে তোমার প্রোগ্রাম পুরো কর তাহলে। আমি চললাম।"

সামনে ছড়িয়ে থাকা দিগন্তবিস্তৃত নীল আকাশের গায়ে চোখ রেখে অনেকক্ষণ ধরেই কী একটা যেন খুঁজছিলেন হেমেন্দ্র। উঠে দাঁড়াতে উদ্যত বৃদ্ধার হাতটি ধরে তাঁকে পাশে টেনে নিলেন তিনি, "আর বেশিক্ষণ নেব না অণু। এইখানে আজ আমাদের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে যে! আর জাস্ট একটুক্ষণ প্লিজ।"

"কে আসবে এখানে এই ভরা দুপুরে? কী বলছ তুমি খ্যাপার মতো বলো তো?"

হেমেন্দ্র আকাশ থেকে চোখ না সরিয়েই হাসলেন একচিলতে, "একটু অপেক্ষা করো। দেখলেই ঠিক চিনতে পেরে যাবে তুমি। সময় হয়ে এল। আমি জানি ওরা আজ আসবেই—"

বলতে বলতেই তাঁর মুখটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, "ওই যে। দেখো দেখো—কিপ স্টিল অণু। একদম নোড়ো না। ওরা নীরবতা ভালোবাসে—"

রোদমাখা নীল আকাশের বুকে তখন দেখা দিয়েছে একজোড়া চখাচখি। মাথার ওপর চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে একসময় তাঁদের খানিক দূরে তারা বালির ওপর নেমে এল। পক্ষিণীটিকে ঘিরে পাখিটি লেজ নাচিয়ে ঘোরে। মেটিং ডান্স।

"এইবারে মনে পড়েছে অণু? পঞ্চাশ বছর আগে, আজকের দিনটার কথা? রেজিস্ট্রির ঠিক আগে এইখানটায় বসে আমার হাত ধরে ওইরকম একটা চখাচখির জুড়িকে সাক্ষী রেখে কী বলেছিলে?"

অণুশীলার চোখে স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ খেলছিল। ঘাড় নেড়ে, জরাকুঞ্চিত দুটি হাতে বৃদ্ধের হাতদুটি ধরে তিনি ফিশফিশ করে বললেন, "ভালোবাসি—"

স্তব্ধ চরাচরে নতুন করে বলে ওঠা সেই কথাগুলো কেউ শুনল না। সাক্ষী রইল শুধু তিস্তার চর আর সেই চিরকালের পক্ষীদম্পতি।



কিন্নরী

"শাম্ব দেখ দেখ! মেঘের ঝর্না। মোবাইলটা ছাড়ো তো।"

"রিনি, ভালো হচ্ছে না। ফোনটা দে বলছি আমার!"

"উঁহু দেব না। কত কষ্ট করে সব কিছু ম্যানেজ করে আসতে হয়েছে ট্রিপটায় জানো? আর তুমি সেই বেরহুল-এ গাড়িতে ওঠার পর থেকে—"

"রিনি প্লিজ। জাস্ট এই মেসেজটা শেষ করতে দে।"

যুবতির মুখে আঁধার ঘনিয়ে এল হঠাৎ। গলায় বিদ্যুৎক্ষরণের আভাস, "কাজ আমিও করি শাম্ব, অ্যান্ড আই গেট দ্য সেম পে প্যাকেট অ্যাজ ইউ।"

"মার্কেটিং একটা চ্যালেঞ্জিং এলাকা রিনি। টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন। আমরা না থাকলে ওই যে বসে বসে খুটখাট প্রোগ্রাম প্যাচ লিখিস ও সফটওয়্যার বেচবে কে? তা ছাড়া সীতারমণের বাক্যবাণ তো জানিস—"

"ছাড়ো তো ওর কথা!" রিনি ঝাঁজিয়ে উঠল, "উইক এন্ড আর একটা দিন এক্সট্রা দিয়েছে তাতেই মুখখানা দেখেছিলে? তার ওপর আবার মরাল গার্জেনগিরিও করবে। 'আনম্যারেড কাপ্‌ল্, বিয়েটা করেই তারপর একেবারে—' ছুটির মধ্যে ওর নাম তুমি একদম নেবে না আমার সামনে। এনজয় করতে এসেছি এনজয় করব। তাতে যদি কিছু বলে তাহলে সটান রিজাইন করে দেবে এই বলে দিলাম। ওই টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন করে তো এই বয়সেই সুগার বাধিয়ে বসেছ। সারাটা জীবন সামলাবে কে? আমি, না তোমার সীতারমণ? ইট্‌স্ আওয়ার টাইম।"

ফোনটার সুইচ বন্ধ করে দিয়েছে রিনি। রাগলে ওকে কী মিষ্টি যে দেখায়! শাম্ব হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিল, "ভালো বুদ্ধি। বিয়েটা হয়ে গেলে তুই কাজ করবি, আমি বাচ্চা সামলাব।"

"হুঁ। তাহলেই হয়েছে। অন্যের খেয়াল রাখবে তুমি। কতক্ষণ চা খাইনি, একবারও জিজ্ঞেস করেছ?"

নির্জন রাস্তাটা পাসাতি পাস পেরিয়ে এসে সটান ঝাঁপ দিয়েছে উর্ণা নদীর উপত্যকায়। পাহাড়ের ফাঁকফোকর দিয়ে চোখ ধাঁধানো মেঘের স্রোত এসে ঝাঁপ খেয়ে পড়ছিল ধেয়ে যাওয়া উর্ণার দিকে।

ড্রাইভার ছেলেটা ভালো। একেবারেই নন-ইন্টারফেয়ারিং টাইপ। তবে সবদিকে নজর থাকে। কিন্নরের এই এলাকায় আসা প্রচুর বাঙালি টুরিস্টের কল্যাণে বাংলাটাও বোঝে একটু একটু। রাস্তার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, "চায়ে পীনা হৈ মেমসা'ব?"

শাম্বর দিকে একটা কটাক্ষ হেনে রিনি বলল, "সামনে দোকান আছে কোনো? এনার তো ওসব দিকে কোনো খেয়ালই পড়ে না!"

"হৈ এক। টার্নিং কে বাদ থোড়িসি হি জানা পড়েগা—"

"দাঁড়াও দাঁড়াও। হিম্মত বস্তি, তাই তো?" হঠাৎ শাম্ব তার কথার মাঝখানে বলে উঠল।

"হাঁ সা'ব। পহলে ইধর আ চুকে হৈ ক্যা?"

রিনিও একটু অবাক হয়ে শাম্বর দিকে দেখছিল। চোখাচোখি হতে শাম্ব চোখ টিপল একবার। চোখ টিপলে শাম্বর মুখে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি হয়। কমিকাল। ম্যাজিকাল। রিনির মনে আছে ব্যাঙ্গালোরে জয়েন করবার দুদিন পর কফি কর্নারে ওই ভঙ্গিটা দেখেই সে প্রথমবার হেসেছিল। চিরকেলে 'গডসচাইল্ড হোম' ছেড়ে, মিরিয়ম সিস্টারের আদর ছেড়ে নতুন শহরে একলা আসবার দুঃখে তখন তার মনখারাপের পালা চলছিল।

"মাধ্যমিক দেবার পর বাবার সঙ্গে একবার এসেছিলাম, বুঝলি? ওই সিসকা যাবার পথে মিনিট দশেকের ব্রেক। দাঁড়িয়ে একটু চা খেয়ে ফের বেরিয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য তখন রাস্তাটা আরো সরু ছিল। আনপেভ্ড্। দশ বছরে একেবারে আমূল বদলে গেছে।" বলতে বলতেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল শাম্ব। আপনমনেই বিড়বিড় করে বলে, "এ জায়গাটায় কিছু একটা ম্যাজিক আছে।"

রিনি তার দিকে দুষ্টুমিভরা চোখে চেয়ে দেখল, "আছে, তাই না? ইন্টারেস্টিং কিছু মেমরিজ! আহা, হয়তো কোনো কিন্নরী বালিকার জাদুচক্ষু—"

"হিংসে হচ্ছে?"

"হুম। তা একটু তো-"

"আ গয়া ম্যাডাম।"

সরু রাস্তার একপাশে পাহাড়ের খাড়াই দেয়াল আর অন্যপাশে, পায়ের

অনেকটা নীচে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শতধারায় ভেঙে ঝরঝর করে বয়ে যেতে থাকা উর্ণা, আর তার ওপর ঝুঁকে থাকা পাহাড়ের সার। এখান থেকেও অত নীচে ছুটন্ত জলের ঝরঝর শব্দ পাওয়া যায়।

"নদীটার ধারে একটু নামা যাবে হ্যাপি?"

রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করতে করতেই মাথা নাড়ল ছেলেটা, "নহী সাব। খাই গহ্‌রা হৈ। উতরনে কা রাস্তা ভি হৈ নহি কোই ইধর। নাহানা হৈ তো বিশ কিলোমিটার আগে পনসরঘাটিমে উতর সকতে হৈ। ওয়াটার স্পোর্টস্‌কা ইন্তেজাম হৈ উধর।"

গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে পাথরের একটা ছোটো ঘরের পাশে। তার দরজায় ঝোলানো পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরে গুটিকয় প্লাস্টিকের চেয়ার দেখা যায়। ঘরের ভেতর থেকে ফুটন্ত জলের আরামদায়ক শব্দ। গাড়ি থামিয়ে হ্যাপি দোকানঘরের ভেতরে ঢুকে যেতে যেতে ডাক দিয়ে গেল, "অন্দর আ যাইয়ে সার। বাহর সর্দি জাদা হৈ।"

"নামবি না রিনি?"

রিনি তার পার্সটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। সেই করতে করতেই বলে, "তুমি এগোও, আমি আসছি।"

"ওকে। দেরি করিস না। দশ মিনিটের স্টপ কিন্তু। এক কাপ চা খেয়ে নিতে যেটুকু সময় লাগে—" বলতে বলতে কাঁধের ব্যাগটা গাড়িতে রেখে শাম্ব নেমে এল।

—কিছু একটা বদল এসেছে জায়গাটায়। নদীটার দিকে দেখতে দেখতেই শাম্ব বদলটাকে ধরবার চেষ্টা করছিল। দোকানটা একইরকম আছে তো! পাহাড় বা উর্ণা— তারাও বদলায়নি একটুও। উদ্দাম জলের শব্দের সঙ্গে সেই আগেরই মতো মিশে যাচ্ছে পাসাং পাস থেকে নেমে আসা হাওয়ার গুমগুম শব্দ। অথচ— কোথাও যেন কিছু একটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। কিছু একটা অভাব—

—পুরোনো অ্যালবামে এ জায়গাটার ছবি আছে তার! বারবার সে ছবির স্মৃতির সঙ্গে বাস্তবের ভূমিটিকে মিলিয়ে দেখতে চায় যুবকটি। তফাত নেই কোনো! অথচ—

"টিপটা ঠিক আছে?"

রিনি কখন যেন গাড়ি থেকে নেমে এসে তার পেছনে দাঁড়িয়েছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'হাতে তার মুখটাকে কাছে টেনে নিল শাম্ব। তার সামনে দুটো সুন্দর ঠোঁটের নিমন্ত্রণ। মাথায় রেশমি একটা স্কার্ফ জড়িয়ে নিয়েছে রিনি। চোখ রোদচশমার কালো কাচে ঢাকা। তাতে ছুটন্ত উর্ণার ছবি পড়েছে। তার গলার সফেদ চামড়ায় ছোট্ট প্রজাপতি উলকিটা একটুকরো লোভনীয় চকোলেটের মতো জেগে আছে। শাম্বর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা রিনির শরীরে। প্রথম দিন ওই উলকিটা দেখেই তো—

"একদম ঠিক। পারফেক্ট। ইউ আর লুকিং সো—"

কথাটা শেষ হল না শাম্বর। দু'হাতে রিনির মুখটাকে ধরে রেখেই হঠাৎ সে স্থির

হয়ে গেছে তার চোখের দিকে তাকিয়ে। তার রোদচশমার অন্ধকার কাচে তখন হঠাৎ করেই জেগে উঠছে একটা তীব্র গোলাপির ঝলক। সেদিকে চোখ ধরে রেখে হঠাৎ শাম্বর মনে পড়ে গেল—

"কী হল, শাম্ব?" রিনির ঠোঁটে হালকা হাসির আস্তর যেন।

কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল শাম্ব। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "কিচ্ছু না। দাঁড়া, দুটো চেয়ার নিয়ে আসি বাইরে। চা-ও বলে দি দুটো। মশলা চা খাবি তো?"

***

বড়োসড়ো চায়ের গ্লাসটা দু-হাতে জড়িয়ে ধরেছে রিনি। এলাচের গন্ধমেশা দুধ চায়ে ছোটোছোটো চুমুক দিচ্ছে আপনমনে। নদীর দিকে চোখ রেখে তার পাশে বসে ছিল শাম্ব। অনেকটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সরু-মোটা ধারাগুলোর মাঝখানে বিস্তীর্ণ একখণ্ড জমির বুকে রামদানার খেতে গোলাপি আগুন লেগেছে যেন। গেরুয়া জলস্রোত আর চোখ ঝলসানো বরফপাহাড়দের মাঝখানে একটা রঙিন চাদর যেন ছড়িয়ে আছে। রিনির রোদচশমায় তার গোলাপি ছায়া ঘুরেফিরে যায়।

খেতের এক কোণে একটা ছোট্ট স্কুলবাড়ি। দূর থেকে তার উঠোনে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে নজরে আসছিল। একটা পিকচার পোস্টকার্ড যেন জেগে উঠেছে হঠাৎ উর্ণার বুকে।

এই ছবিটাই বাদ ছিল তো এতক্ষণ! স্মৃতির ক্যানভাসে ধরে রাখা পুরোনো কোনো ওয়াটারকালারের মাঝখান থেকে মুছে যাওয়া একটা টুকরোর মতো। বারবার সেইদিকে ফিরে ফিরে চায় যুবকটি। ফুলন্ত রামদানার এই খেত তার বড়ো পরিচিত ঠেকে! হয়ত কখনো তাতে লাঙলের মুঠ ধরে ছিল কোন কিশোর! তার দিকে চেয়ে দেখেছিল কোন কিন্নরীর আয়ত দুটি চোখ— কুসুম—

হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল শাম্ব। খানিক বিরতির পর আগস্টের মৌসুমি মেঘ ঘিরে আসছে আবার। খানিক আগের রোদ ঝলসানো বরফচুড়োগুলোকে ঢেকে দিচ্ছে পরিচিত কুয়াশার ভিড়।

"কোথাও যাচ্ছিস?"

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি নেমে আসছে ফের। রিনির খোঁপা করা চুলে, চোখের পল্লবে জলের গুঁড়ো জমে উঠছিল।

শাম্ব ইঙ্গিতে নদীর বুকের সেই কৃষিজমির দিকে দেখিয়ে বলল, "যাবি?"

"তুই এগো। আমি চলে আসব ঠিক—"

***

খাড়াই নদীর পাড় ধরে নেমে যাওয়া সরু ফাটলটার দিকে তাকিয়ে একবার একটু ইতস্তত করল শাম্ব। বাঁকের এপাশ থেকে দোকানটাকে দেখা যায় না। এ জায়গাটায় জটিল বাঁক নেওয়া পথের দুধারেই পাহাড়ের দেয়াল। হাতের বাঁয়ে সেই দেয়ালের গায়ে একটা সরু ফাটল থেকে নদীখাতের দিকে একসার পাথরের ধাপ নেমে গেছে।

একটা মৃদু হাসি খেলে গেল তার মুখে। আগেরবারেও ঠিক এমনিই হয়েছিল তো! স্মৃতিগুলো হুড়মুড় করে ফিরে আসছে হঠাৎ। এমনি করেই তো হঠাৎ বাবার হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে আসা কৌতূহলী এক কিশোর— এইখানে এসে হঠাৎ পাওয়া এই সিঁড়ি ধরে—

—তার স্মৃতির গভীর থেকে বার বার কেউ যেন উঠে এসে হাতছানি দিয়ে ডাক দিয়ে যায় তাকে। তখন তাকে ঘিরে ছুটন্ত সময় স্থির হয়ে থাকে। চলমান বিশ্বের মধ্যে নিশ্চল হয়ে থাকা সেই সিঁড়িটির দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় যুবকটি—

দ্বিতীয় আবর্ত

এখানে জলের স্রোত তীব্র। উর্ণার অনেক ধারার মধ্যে একটা সরু ধারা এইখানে এসে কঠিন পাথরের খাদে বাঁধা পড়ে ফেনা তুলে ছুটে যায়। তার ওপাড়ে, বিস্তীর্ণ চরের কাঁকড়মেশা মাটির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাওয়া পথটা দূরের ইশকুলবাড়িটার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। জলের দিকে গভীর মনোযোগ নিয়ে তাকিয়ে দেখল সে। ওর ভেতরে পা রাখবার মতো নিরাপদ পাথর আছে কিছু। সে তাদের খবর জানে। অন্ধকার রাত্রেও এ পথ দিয়ে চলাচল করতে তার বা কুসুমের কোনো সমস্যা হয় না।

আস্তে আস্তে পাড়ের একটা পাথরে ভর রেখে জলের ভেতর নেমে গেল সে। তীব্র স্রোত তার শরীর ধরে দোলা দেয়। তার শীতল আলিঙ্গনে পুরোনো পরিচিতির ছোঁয়া—

"সারজি নমস্কার।"

ছোট্ট ছেলেটা এসে মিষ্টি হেসে হাতদুটো বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে। শাম্ব নীচু হয়ে তাকে কোলে তুলে নিল, "ক্লাসে না গিয়ে বাইরে খেলছিস যে বড়ো! এখন তো টিফিনটাইম নয়! কুসুম মিস কিছু বলল না তোকে?"

"কুসুম মিস নে-এ-এই।" ঘাড় দুলিয়ে হাসল ছেলেটা, "খেতিতে পাখি পড়েছে তো! মিস তাই দেখে একটা গুলেল নিয়ে খেতির দিকে গেল।"

"ওরে দুষ্টু। আর তুমিও অমনি ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছ, তাই না?" বলতে বলতেই তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিল শাম্ব। তারপর লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে গেল স্কুলরুমের পাশে তাদের শোবার ঘরটার খোলা দরজার দিকে। ওখানে পটকার

বাক্সটা রাখা আছে।

দূরে গোলাপি ফুল ফোটা খেতের মধ্যে থেকে কুসুমের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। মাঝে মাঝেই তার থেকে একঝাঁক পাখি বাতাসে ভেসে উঠে ফের নেমে এসে ডুব মারে খেতের মধ্যে। শাম্বর বুকের ভেতরটা আনচান করছিল। কষ্টের ফসল। বুনতে গিয়ে এ বছর বাজারে ধারকর্জও হয়েছে খানিক। এখন তা কাটবার মুখে এসে—

কুসুমটা বোকা মেয়ে একটা। গুলেল দেখিয়ে এই বজ্জাত পাখির ঝাঁককে কখনো শায়েস্তা করা যায়?

বারান্দার এক কোণে একটুখানি ঘেরা দিয়ে রান্নাঘর। থলেটা সেখানে নামিয়ে রেখে ঘরে গিয়ে ঢুকল শাম্ব। ছোটো একটা টিপয়ের ওপর শরবত ঢাকা দিয়ে রেখেছে কুসুম। এসব কাজে তার ভুল হয় না।

শরবতের গ্লাসটা তুলে নিয়ে তাতে চুমুক দিতে একটা আশ্চর্য শান্তি নেমে এল যুবকটির মনে। দশটা বছর সুখে-দুঃখে কেটে গেল তার এখানে। প্রথম যেদিন এখানে এসেছিল সে দিনটার কথা এখনও মনে পড়ে তার।

কোথা থেকে, কীভাবে এখানে এসে পৌঁছেছিল, সে জানে না। হঠাৎ শুধু নিজেকে সে আবিষ্কার করেছিল উর্ণার ওই ধারাটার ভেতরে। জলের তীব্র ধাক্কায় হাবুডুবু খেতেখেতেই কানে এসেছিল খিলখিল করে হাসির শব্দটা। আর তারপর একটা নরম কিন্তু জোরালো হাত ওপাশ থেকে এগিয়ে এসে তাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল স্রোতের মধ্যে— "ডাইনে পা বাড়ালে একটা পাথর পাবে। ওতে ভর দিয়ে সামলে দাঁড়াও, তারপর আমার হাত ধরে ধরে—"

শাম্বর তখন আর তার গলার শব্দের দিকে খেয়াল ছিল না অবশ্য। তার মুখের একেবারে কাছে এগিয়ে আসা একজোড়া ঝিলমিলে চোখ, একটা সফেদ গ্রীবা— সেখানে ছোট্ট একটা—

সেই কুসুম! এই নির্জন দ্বীপে প্রতিটা দিন সে এর পর তাকে সঙ্গ দিয়েছে। সূর্য ওঠবার আগে সে এসে তার ঘুম ভাঙাত। তারপর সারাটা দিন একসঙ্গে কাজ করে সূর্য ডোবার মুখে ফের ফিরে যেত নদী পেরিয়ে পাহাড়ের ওপাশে। কোথায় যে তার বাড়ি সে-কথা সে শাম্বকে কখনো বলেনি। জিজ্ঞেস করলে মিষ্টি হেসে এড়িয়ে যেত শুধু।

আস্তে আস্তে পাথুরে চরের বুক খুঁড়ে ওই খেতি বসিয়েছে তারা। এ চত্বরে একটাই বড়ো বসতি আছে। মাইলপাঁচেক দূরে। কিন্নরদের পনসরিয়া বস্তি। ওর হাটেই তার কেনাকাটা, তার ফসল বেচা। বছরখানেক আগে একদিন সেই হাট থেকে ফেরবার পথে কুসুম বলল, "আমায় চরায় একটা পাথরের ঘর তুলে দেবে?"

"পাথরের ঘর দিয়ে কী হবে রে?"

"একটা ইশকুল দেব চরার বুকে।"

শাম্ব অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল, "পড়াবে কে? আমি তো হি হি—"

কুসুম কটাক্ষ করে হেসেছিল, "তোমার ভরসায় আছি আরকী! আমি পড়াব। আজকেই হাটে লোকজনকে বাজিয়ে দেখছিলাম। আট-দশটা বাচ্চা জুটে যাবে দেখো।"

"তুই— তুই পড়াশোনা জানিস?"

"জানি তো! আরও অনেক অ-নেক কিছু জানি।" একগাল হেসে জবাব দিয়েছিল কিশোরী কিন্নরী। আর তারপর, তার লতাপাতায় গড়া কুঁড়েঘরটার পাশে পাথরের ওপর পাথর গেঁথে যখন ছোটো স্কুলবাড়িটা গেঁথে তুলছিল শাম্ব, তখন লাজুক হেসে বলেছিল, "ওর পাশে আর একটা ছোটো ঘর তুলে নাও, আর একটুখানি বারান্দা। ওই ঝোপড়ায় তোমার থাকা হবে না এই বলে দিলাম।"

পাকা ঘরে শাম্বর কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ততদিনে কুসুমের কথায় কোন প্রশ্ন করবার ইচ্ছেটাই চলে গেছে তার।

এখানে জীবন বড়ো সরল। কোনো মন্ত্রোচ্চারণ করেনি তারা। অপরিচিত ভাষায় অপ্রয়োজনীয় কোনো প্রতিজ্ঞার উচ্চারণও নয়। স্কুল চালু হবার পর, মাসকয়েক আগে একদিন সন্ধেবেলা খেত থেকে ফিরে তার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে অবাক হয়ে ভেতরে ঢুকে সে শুধিয়েছিল, "বাড়ি গেলি না কুসুম?"

জবাবে কিন্নরী তাকে দু-হাতের বাঁধনে জড়িয়ে বলেছিল, "বাড়িতেই এলাম তো!" তখন তার একুশ। কুসুম বোধ হয় অষ্টাদশী ছিল।

"সারজি, কুসুম মিস একলা একলা খেতের মধ্যে পাখি তাড়াচ্ছে যে এখনও! তাড়াতাড়ি চলো না!" দরজায় এসে দাঁড়ানো ছোট্ট মানুষটার গলার শব্দে চমকটা ভেঙে গেল শাম্বর। তার মিসকে বড়ো ভালোবাসে সে। তাড়াতাড়ি তাক থেকে আছাড়িপটকার বাক্সটা সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল শাম্ব।

পাখিগুলো এখনও ঝাঁক বেঁধে খেতের মাথায় উড়ছে। খেতের ধারে এগিয়ে গিয়ে পাথরের গায়ে একসঙ্গে দু'দুটো আছাড়িপটকা ছুড়ে মারল শাম্ব। দুম দুম শব্দ করে পটকাগুলো ফেটে নীল রঙের খানিক ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। কাছাকাছি গোল্ডেন নেক ফিঞ্চের ঝাঁকটা এবার খেত ছেড়ে উড়াল দিল, কিন্তু আগের মতো একটা চক্কর কেটে নেমে আসবার বদলে একটা এলোমেলো ঝাঁক হয়ে উড়ে গিয়ে চরের অন্য দিকে নামল। এই পটকাই এদের আসল ওষুধ।

পটকার বাক্সটা হাতে করে এবার খেতের ভেতরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শাম্ব ডাক দিল, "কুসুম!"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খানিক দূর থেকে গাছপালার ভিড় ঠেলে সে বের হয়ে এল। অত ঠান্ডাতেও তার কপালে স্বেদবিন্দু জমে আছে। মাথার চুল এলোমেলো হয়ে

উড়ছে হাওয়ায়। গুলেলটা কোমরে গুঁজতে গুঁজতে কাছে এগিয়ে এসে রাগ-রাগ গলায় সে বলল, "এতক্ষণে সময় হল? আমি ছেলেমেয়েগুলোকে একলা ফেলে—"

তার লাল হয়ে ওঠা মুখটার দিকে একনজর চোখ রাখল অপরাধী পুরুষ। তারপর হঠাৎ দুটো সবল হাত তাকে একটা পাখির মতোই মাটি থেকে তুলে এনে জড়িয়ে নিল নিজের শরীরের সঙ্গে। দুটো কর্কশ ঠোঁট তার গ্রীবার ওপর আঁকা ছোট্ট প্রজাপতি উল্কিটার ওপর গিয়ে বসেছে। বর্ষণসিক্ত ঋতুমতী মাটির বুকে জেগে থাকা ফুলন্ত খেতের সেই নির্জনে একে অন্যের শরীরে মিশে গিয়ে এক আশ্চর্য ছবি হয়ে যেন থেমে ছিল তারা—

***

এক স্নেহ মেরিয়া অম্মা জো
জলী জায়ে সৌরয়াঁ দা দেশ হো
উড়য়া বো উড়য়া কালী কোয়েলিয়া
জাঈ ওয়া মেরে পকৈয়া দেশ হো

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। ছেলেমেয়েদের দলটা স্কুলবাড়ির বাইরে এসে জড়ো হয়েছে এখন। পশ্চিমের পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে দিনের শেষ আলো এসে রাঙিয়ে দিয়েছে তাদের। সন্ধের বাতাস বেয়ে তাদের গানের মিলিত সুর এসে পৌঁছোচ্ছিল পরিশ্রান্ত পুরুষের কানে। একটা লম্বা ডালের দুপাশে তার সদ্য কাটা ফসলের বোঝা তুলে নিয়ে এইবার সে পা বাড়াল তার উঠোনের দিকে।

হঠাৎ ছেলেমেয়েদের সেই মিলিত গলার কচি স্বরকে দুহাতে জড়িয়ে নিয়ে সন্ধের আকাশে যেন উড়াল দিল একটা তীব্রমধুর কণ্ঠ। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে তার সুর ছড়িয়ে যাচ্ছিল— হাওয়ার শব্দকে, উর্ণার ঝরঝর শব্দকে ছাপিয়ে—

এক স্নেহ মোরিয়া পীতম জো
তুসা সঙ্গ দেস ছোড় পরদেস হো
উড়য়া বো উড়য়া কালী কোয়েলিয়া
জাঈ ওয়া মেরে পকৈয়া দেশ হো

আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসছিল সেই চরভূমিতে। তার ম্লান হয়ে আসা আলোয় সেই ছেলেমেয়ের দলটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নেচে চলেছে একটি দীর্ঘ লাবণ্যময় শরীর। শিশুগুলি গান গাইতে গাইতেই ধীরে ধীরে তাকে ছেড়ে একটা লম্বা সার বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছিল, চর থেকে বের হয়ে যাবার রাস্তা ধরে উর্ণার ধারাটার দিকে। এই ভূমিতে তাদের জন্ম। এর নদী বা অন্ধকারকে তারা ভয় করে না।

যুবতির কাছে এসে ফসলের বোঝা নামিয়ে রাখল শ্রান্ত পুরুষ। সন্ধ্যার হাওয়া ছেড়েছে নদীর বুক থেকে। সেই তীব্র ঠান্ডা হাওয়া তার ক্লান্ত শরীরকে তাজা করে তোলে। তাদের মাথার ওপরে জেগে ওঠে একটি একটি তারা। সেই তারার আলোয় লীলায়িত ছন্দে নেচে চলে দুই কিন্নর-কিন্নরী—

"তুস সঙ্গ দেস ছোড় পরদেশ হো—"

***

—এইবার সময় হয়েছে। কত দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর— আজ আমার গর্ভে এস প্রিয় পুরুষ-আমাকে ফলবতী কর—

বাক্যহীন সুতীব্র শীৎকারে পুষ্পবতী নারী সর্পিণীর মতোই আঁকড়ে ধরেছে তার প্রিয় যুবকের শরীর। এখন গভীর রাত। পাহাড়ে মৃদঙ্গধ্বনি তুলেছে গম্ভীর বাতাস। তাদের ঘিরে অনন্ত জলধারার ঝরঝর শব্দ, বনফুলের মৃদু সুবাস মিশে যায় নারীর কামগন্ধের সঙ্গে—

—আমার সন্তান হয়ে ফিরে এস হে তুমি— বহে যাক অস্তিত্বের ধারা মৃত্যু থেকে নতুন জন্মের দিকে। আমি কতকাল, কালে কালান্তরে তোমারই অপেক্ষায় থাকি হে প্রিয়তম—

***

"মা!"

দুটো সতেজ তরুণ হাত তার পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরেছে তাকে।

রুটি বানানো বন্ধ করে কুসুম ঘুরে বসে তাকে বুকে জড়িয়ে নিল। এত বড়োটি হল, এখনও মায়ের কোলে ঢুকে আদর খাবার কমতি নেই ছেলের।

"কিছু আবদার আছে মনে হচ্ছে!"

"হুঁউউ-তিনটে।"

"তাহলে বলে ফেলা হোক।"

"এক নম্বর, আজ আমি ইশকুলে যাব না।"

"হুম। দু'নম্বর?"

"আজ আমি বাবার সঙ্গে খেতিতে গিয়ে সকালবেলা চাষি-চাষি খেলব।"

"আর তিন নম্বর?" কুসুম ভুরুদুটো বাঁকিয়ে কিষণের দিকে ফিরে চাইল।

"আজ দুপুরবেলা বাবা যখন হাটে যাবে, তখন আমার জন্য একটা এই এতবড়ো কাঠপুতলি আনতে বলবে।"

"বেশ। এবার আবদারের কারণটা জানতে পারি কি?"

"তুমি ভুলে গেলে? আজ যে আমার দশ বছর হল মা। দশ বছরের জন্মদিনে যা

চাইব তুমি তাই দেবে বলেছিলে যে।"

তাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল কুসুম। তারপর কপালে একটা চুমু দিয়ে বলল, "ঠিক আছে। সব চলে'খন। এখন যাও তো বাবা। বাবাকে খেতে গিয়ে এই জলের বোতলটা দিয়ে একদৌড়ে ফিরে এস। ইশকুল আছে তো!"

"বললাম যে আজ ইশকুলে যাব না!"

"দুর বোকা। তোর তো ছুটি। কিন্তু আমায় তো যেতে হবে!"

"না মা। আজ তুমিও যেয়ো না। আজ আমরা দুজন মিলে না—"

মৃদু হেসে তার গালদুটো টিপে একটু আদর করে দিল কুসুম, "আজ তো শনিবার। হাফছুটি। দুপুরবেলা বাবা যখন খেতে আসবে, আমিও তখন ইশকুল বন্ধ করে বাড়ি এসে তোকে নিয়ে—"

তার চলে যেতে থাকা ছোট্ট শরীরটার দিকে তাকিয়ে মুখে মৃদু হাসি ফুটছিল কুসুমের। সময় হয়েছে ফের। দশ বছরের আর একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। অবচেতনে যে সাড়া কদিন ধরেই নাড়া দিচ্ছিল তার, আজ শিশুটির কথা তাকেই জাগিয়ে তুলেছে পুরোপুরি। মায়ার আবরণ সরে যাচ্ছে তার চেতনা থেকে। অস্তিত্বের গভীরে সে অনুভব করতে পারে পাথরের ঘরটি থেকে মাত্রই কিছু দূরে, উর্ণার সরু ধারাটির বুকে গড়ে উঠতে থাকা অদৃশ্য শক্তির সুতীব্র ঘূর্ণনকে। আর কিছুক্ষণ পরেই, দশ বছরের ব্যবধানে, ফের ফিরে আসবে দ্বিতীয় অস্তিত্বের প্রবেশপথ। যেতে তাদের হবেই। অদৃশ্য নিয়তির বাঁধন বড়ো কঠিন।

সে অস্তিত্বে যে জীবন লুকিয়ে আছে, এইবার তার পরিচয় ধীরে ধীরে ফুটে উঠছিল তার সামনে। এ সময়গুলো ঈশ্বরকন্যা কিন্নরীর বড়ো কষ্টে কাটে। দুটি অস্তিত্বের একত্র উপস্থিতির টানাপোড়েণ বড়ো যন্ত্রণার। তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। অন্য ভুবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তো ফের বিস্মৃতির আড়াল এসে ঢেকে দেবে এই চর, নদী, তার কিষণ সব কিছুকে। তারপর— দ্বিতীয় জগতের দশ বছর বসবাসের পর ফের এ জীবনের এই মুহূর্তটিতে ফিরে আসা— তারপর ফের— এ যাওয়া-আসার অন্ত নেই।

দূরে রামদানার ক্ষেতের মধ্যে মিলিয়ে যেতে থাকা কিষণের ছোট্ট শরীরটার দিকে তাকিয়ে তার চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসছিল। শাম্ব ভালো আছে। সে সাধারণ মানুষ। ঈশ্বরকন্যার চেতনা তার নেই। দুই অস্তিত্বের একত্র উপস্থিতির যন্ত্রণা সে কখনো অনুভব করে না।

***

"বলি কি কুসুম, আজ তুমিও আমার সঙ্গে হাটে চল না।" শাম্ব রুটির বড়োবড়ো টুকরো ছিঁড়ে ডালে ভিজিয়ে মুখে ফেলছিল, "ওসব পুতুলটুতুল কেনা আমার আসে

না সে তো তুমি জানো। ছেলের কী পছন্দ না পছন্দ সে তুমি আমার চেয়ে অনেক ভালো জানো।"

বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে কিষণ। ঘুমের মধ্যে এখনও দেয়ালা করে সে। সেদিকে একনজর তাকিয়ে দেখল কুসুম। তারপর নিজের খালি হয়ে যাওয়া থালাটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এক কাজ কর। তুমি খেয়ে উঠে এগিয়ে যাও। আমি ওকে নিয়ে একটুখানি শুই। নদী পেরিয়ে গিয়ে হাঁটতে থাক। আমি ঠিক চলে এসে ধরে নেব'খন তোমায়—"

এ নদীর প্রতিটি পাথরকে চেনে শাম্ব। স্বচ্ছন্দে ছুটন্ত জলের নীচে নিরাপদ পাথরগুলোর ওপর পা দিয়ে দিয়ে সে এগিয়ে চলে তার অন্যপাড়ের দিকে—

তৃতীয় আবর্ত

—কটা বেজেছে কে জানে! নদীটার এপাড়ে এসে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সেলফোনটা বের করে সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলল শাম্ব। সেই যে রিনি ফোনটাকে বন্ধ করে দিয়েছিল, তারপর অন করা হয়নি আর।

আস্তে আস্তে সিঁড়ির ধাপগুলো বেয়ে ওপরে উঠে সে খানিকটা এগিয়ে গেল চায়ের দোকানটার দিকে। তারপর একটা জুতসই পাথর দেখে তার ওপর চেপে বসে ফোনটা অন করল—

এগারোটা বেজে পাঁচ। তার মানে ম্যাক্সিমাম মিনিটদশেক হয়েছে তার এখানে। নাথিং সিরিয়াস। তবে এটা ঠিক, এভাবে স্রোতটায় পা ডুবিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা তার উচিত হয়নি। রিনিটাও আসবে বলেছিল খানিক বাদে। ভাগ্যিস এখনও এসে পৌঁছোয়নি! এসে যদি তাকে ওপর থেকে ওভাবে জলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখত তাহলে কিছু একটা কাণ্ড বাঁধাত ঠিক। জলে বেজায় ভয় মেয়েটার। শাম্ব আগেও দেখেছে।

"এই যে! ব্যাপারটা কী বল তো!" দোকান ছেড়ে নদী দেখবে বলে এসে এখানে পাথরে বসে আছ যে! লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছিলে না তো!"

ওপরের দিক থেকে বাঁকটা পেরিয়ে রিনি নেমে আসছিল তার দিকে। শাম্ব তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, "আপন গড রিনি। নো সিগারেট। বিশ্বাস না হয় তো টেস্ট করে দ্যাখ! একফোঁটা গন্ধ—"

বলতে বলতেই এগিয়ে আসা তরুণীটিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে তুলে নিয়েছে সে। নির্জন পাহাড়ের বুকে তাদের ঠোঁটেরা একে অন্যের খবর নিচ্ছিল গভীর ভালোবাসায়।

খানিক বাদে তার আলিঙ্গনে ধরা থেকেই রিনি বলল, "দোকানে কথা বলেছিলাম আমি। ওদের একটা স্পেয়ার ঘর আছে। এ জায়গাটা খুব রোমান্টিক।

আজ এখানটাতে থেকে যাবে? কাল না হয় সিসকার দিকে—"

***

"নেক্সট মানডে জিষ্ণুর টেন্‌থ্ বার্থডে। তোমার মনে আছে শাম্ব?"

"জানি। কখনো মিস করেছি গত পাঁচ বছরে? আমি সানডে দিল্লিতে নামছি," মহাদেশীয় দূরত্ব থেকে রিনির প্রাক্তন সঙ্গীর গলা ভেসে আসছিল, "সন্ধের মধ্যে কলকাতা। ম্যারিয়ট-এ উঠব। অ্যাজ ইউজুয়াল ফ্যানিজ কিচেন-এ চারজনের একটা টেব্‌ল্ বুক করে দিয়েছি ইন্টারনেট থেকে। সন্ধে সাড়ে ছ'টা।"

ফোনের রিসিভারটার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখল রিনি। কথাটা শাম্ব ঠিকই বলেছে। বিয়েটা টেকেনি তাদের। কিন্তু দূরে থেকেও কর্তব্যে শাম্ব কোনো ত্রুটি রাখে না। অ্যাক্সেপ্টেব্‌ল্ অ্যারেঞ্জমেন্ট।

মাঝে মাঝে তার একটা অদ্ভুত কথা মনে হয় আজকাল। কেরিয়ার কি এতটাই ইমপর্ট্যান্ট? তাদের দু-জনের জন্যই? শাম্বর যখন পার্মানেন্ট ওভারসিজ অ্যাসাইনমেন্টটা এল তখন বিয়েটা টিকিয়ে রাখতে হলে তাদের যে-কোনো একজনকে নিজের কেরিয়ার ছাড়তে হত। তারা কেউ তাতে রাজি হয়নি। তবে হ্যাঁ তিক্ততা হয়নি কোনো এটাই আসল কথা। শাম্ব ইজ স্টিল আ গুড ফ্রেন্ড্।

"চুপ করে আছ যে? কিছু বলবে?"

"একটা কথা ভাবছিলাম," রিনি ফোনে আস্তে আস্তে বলে উঠল, "ডোন্ট ব্রেক ইট টু জিষ্ণু। ওকে টেন্‌থ বার্থডেতে একটা স্পেশাল সারপ্রাইজ দেব। টেবিলটা ক্যানসেল করে দাও। আমি সানডে দিল্লি চলে আসছি জিষ্ণুকে নিয়ে। ওখান থেকে সবাই মিলে মানালি হয়ে স্ট্রেট হিম্মত বস্তির দিকে যাব। দু'দিনের মামলা। যাবে? নাথিং পার্সোনাল। ছেলেটা জ্ঞান হয়ে ইস্তক তার বাপ'মার সঙ্গে একত্রে কোথাও যায়নি—"

একটুক্ষণ চুপ করে রইল শাম্ব। তারপর বলল, "অলরাইট। কিন্তু এত জায়গা থাকতে—"

সত্যি কথাটা তাকে প্রাণে ধরে বলতে পারল না রিনি। কারণটা সে নিজেও জানে না। শুধু এইটুকু জানে, জায়গাটা তাকে টানছে! প্রবল, দুর্নিবার আকর্ষণে টান দিয়ে চলেছে তাকে গত কয়েকদিন ধরে। হয়তো তার কাছাকাছি গিয়ে কিছু মনে পড়বে তার। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা শুধুই অন্ধ একটা টান। তাকে এড়ানো রিনির সাধ্যের বাইরে।

তবে শাম্বকে একটা কিছু জবাব দিতে হবে। খানিক বাদে নিজেকে সামলে নিয়ে সে হাসল একটু, "ছেলেটা জানবে না, কিন্তু ওর জন্মস্থানটা ওকে একবার দেখিয়ে নিয়ে আসা এই আরকী।"

"জন্মস্থান! বাট—"

"আমার আরও একটা পেটি সেন্টিমেন্ট শাম্ব। নো ভ্যালু অ্যাডিশান। ও তুমি বুঝবে না।"

রিনির গলায় ফের বিয়ের শেষদিকের কয়েকটা মাস বারংবার ওঠা ঝড়ের ইঙ্গিত পাচ্ছিল শাম্ব। একটা মৃত সম্পর্কের বুকে সে ঝড় নতুন করে তোলবার অর্থ নেই কোনো। ছেলেটার তো আনন্দ হবে। তাতেই ঢের।

"অলরাইট। আমি বুকিংগুলো সেরে নিচ্ছি। তোমার আর ছেলের এয়ার টিকিটগুলো পাঠিয়ে দেব কাল-পরশুর মধ্যে। এখন রাখি, কেমন?"

চতুর্থ আবর্ত

"নদীটার দিকে একটু ঘুরে আসছি আমি। তোমরা যাবে?"

চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়ানো গাড়িটার পেছনের সিটে জিষ্ণু ঘুমোচ্ছিল। সেদিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে শাম্বর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মাথা নাড়ল রিনি, "তুমি এগোও। ছেলেটা জাগলে ওকে নিয়ে একটু বাদে—"

(শেষ নেই)



বীজ

"অরুন্ধতী? ও লা অরুন্ধতী? নাইতে যাবি তো?"

বড়দির গলা। অরুন্ধতীর এই বড়োননদটি বেশ গ্রামভারী চেহারার মানুষ। সম্প্রতি ছেলে হয়ে আরও মোটাসোটা, গোলগাল হয়েছে। চৌধুরীপাড়ায় শ্বশুরবাড়ি।

"কী রে কানে খোল জমেছে? শুনতে পাস না?"

বড়দির গলাটা এইবার ঘরের ভেতর ঢুকে এসেছে। একচিলতে বারান্দা ঘরের বাইরে। তার ওপর উঠে এসে দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি মারছে। উনুনের তলায় পেতলের পাইপটা দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে অরুন্ধতীর চোখে ধোঁয়ার জলের সঙ্গে অন্য একটু জলও চলে এল। ছেলে হয়ে বড়দির শ্বশুরবাড়িতে প্রতাপ বেড়েছে। কাজের লোক রাখা হয়েছে একটা। তাকে এসব কাজকর্ম এখন খুব একটা করতে-টরতে হয় না।

"দেখ না বড়দি। হতচ্ছাড়া উনুন..." গলা ধরে এল অরুন্ধতীর। দেশের বাড়িতে কাঠের উনুনে দুটো কাঠিকুটো ফেললেই গনগনে আগুন ওঠে আর এদেশের এই হতচ্ছাড়া কয়লা...

অতসী এসে উঁকি মেরে উনুনটার দিকে একনজর চেয়েই ফিক করে হেসে ফেলল, "উফ। মরি মরি। উনুন ভরতি কয়লা চাপিয়ে তলায় কাগজের নুড়ো জ্বেলেছেন। এভাবে সারাদিনে তোর উনুন ধরবে? দাদাটা যে কোত্থেকে এই গেঁয়ো ভূতটাকে..."

"গেঁয়ো ভূত? আমাদের জলপাইগুড়ি তোমাদের এই দেনগাঁ-র চাইতে অনেক বড়ো শহর।" অরুন্ধতী মুখ নীচু করে রেখেই রাগে গরগর করে উঠল।

"হ্যাঁ সে তো বটেই। বাড়ি তো বেনেপুর। জলপাইগুড়ি সদর ছাড়িয়ে বিশ মাইল। আমার মেজোবোনের শ্বশুরবাড়ি আমি জানি না? তার আবার শহরের গর্ব, হুঃ। নে এখন সর। আঠারো বছুরে মেয়ে, তাকে এখন উনুন ধরানো শেখাই। ঘুঁটে

আছে ঘরে? ঘুঁটে? ওই দুখানা..."

বলতে বলতেই কথা থামিয়ে হাসিতে ভেঙে পড়েছে অরুন্ধতী, "ও দাদা, উঠে এসে দেখে যা, বউয়ের কী রূপ খুলেছে তোর!"

দ্বিজেন ধুতির ওপর পাঞ্জাবি গলাচ্ছিল। সাড়ে ছটায় ইশকুল বসে যায়। সাইকেল মেরে যেতে আধঘণ্টার ওপর সময় লাগবে। বাজে পৌনে ছ'টা। বোতাম আঁটতে আঁটতেই বলে, "আবার কী হল?" আর সেই বলতে বলতে বের হয়ে এসে অতসীর দু'হাতে ধরা অরুন্ধতীর মুখটা দেখে হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ল সে। অতসীও হাহাহিহি করে হাসতে লেগেছে। তারপর উঠে গিয়ে বারান্দার দিকে ঝোলানো আয়নাটা এনে অরুন্ধতীর মুখের সামনে ধরে বলে, "মুখপুড়ি, মুখে কয়লার কালি মেখে হনুমানের মা হয়ে..."

বড়ো ক্লান্ত লাগছিল অরুন্ধতীর। রাতে রুটি করা নিয়ে একচোট হয়ে গেছে দ্বিজেনের সঙ্গে। ত্যাড়াবাঁকা আধপোড়া রুটি পাতে নিয়ে বসে একবার শুধু বলেছিল, "রুটিটাও ভালো করে গড়তে পারোনি? সারাটা দিন খেটেখুটে ঘরে ফেরা। এখন তবে আমি..."

কথাগুলো শুনে হঠাৎ তার গত ছ'মাসের একাকিত্ব, দেশের বাড়ির ওই বিস্তীর্ণ দুনিয়া ছেড়ে এসে শহুরবাজারের এই একচিলতে ভাড়ার ঘরে সংসার, হাজারো দায়িত্বের শেকল, তার সঙ্গে মানিয়ে নেবার লড়াই এই সব কিছুর নির্যাস হয়ে একরাশ তিক্ততা এসে ভর করেছিল অরুন্ধতীর গলায়।

"খেতে হবে না তোমায় আমার রুটি। চারবেলা ভাত খেয়ে মানুষ। জম্মে কখনো রুটি দেখেছি চোখে? রুটি খাবার শখ তো তেমন মেয়ে বিয়ে করে আনলেই পারতে! দেনগাঁয় মেয়ের অভাব ছিল?"

কথাগুলো বলতে বলতেই কেন যে অমন চণ্ডাল রাগ চেপে বসল তার মাথায়! দ্বিজেনের সামনে থেকে থালাটা টান দিয়ে সরিয়ে এনে জল ঢেলে দিয়েছিল সে তাতে। তাদের দু-জনেরই আর খাওয়া হয়নি তারপর।

পাশে শুয়ে অনেক রাত্রে দ্বিজেন তাকে নিজের দিকে টেনেছিল। অন্ধকারে কাছে এসে তার চুলে মুখ গুঁজে বলেছিল, "খিদে পেলে উঠে মুড়ি খেয়ে নাও দুটো।"

অরুন্ধতী কোনো জবাব দেয়নি। বুক জুড়ে তখন তার একটা অবাধ্য জেদ মাথা তুলছে। এ-মানুষের সঙ্গে এই অচেনা পুরীতে এমনভাবে ঘর করতে সে পারবে না।

ভোর-ভোর ঘুম ভেঙে আবার, পাশে শুয়ে অকাতরে ঘুমিয়ে থাকা মানুষটার দিকে চোখ রেখে মনটা ভিজে গিয়েছিল অরুন্ধতীর। আহা মুখটা শুকিয়ে গেছে রাত্তিরে না খেয়ে। যদি ইশকুলে বেরোবার আগে অন্তত দুটি ভাতে-ভাত ফুটিয়ে দেয়া যায়, সেই আশায় অন্ধকার থাকতে উঠে এসে উনুনটা নিয়ে পড়েছিল সে।

এমনিতে দ্বিজেনই ধরিয়ে দিয়ে যায় রোজ। আজ ভেবেছিল নিজেই...

আয়নায় মুখটা দেখে নিজের ওপরে একটু করুণাই হচ্ছিল অরুন্ধতীর। পেছন থেকে দুই ভাইবোনের বাঁধভাঙা হাসির শব্দ, একটা ব্যর্থ উনুন আর গাল ও কপালে কয়লার কালির একরাশ দাগ যেন শতমুখে তাকে বলছিল, "হেরে গেছিস। হেরো..."

বড়বউদি ভুল কিছু বলত না। তার রোজকার গঞ্জনাগুলো বারংবার কানে এসে বাজছিল এখন অরুন্ধতীর, "মর তুই আপদ। মরে হাড় জুড়ো আমার। ভেবেছিস রূপের ঝুড়ি দিয়ে জগৎ ভোলাবি? ওরে আবাগি, যার গলায় ঝুলবি, তার জীবন অতিষ্ঠ করে ছাড়বি তুই আর নয়তো সারাজীবন আমার গলগ্রহ হয়ে..."

নাঃ। ও-বাড়িতে আর ফেরা নয়। তা ছাড়া, চাইলেও তো একা চিনে যাওয়ার উপায় নেই। ট্রেনে এক রাত্রের রাস্তা। মেজদা... না না, সে ভারি লজ্জা। কাছেই থাকে। এ-মানুষ ও-বাড়িতে যায় তো মাঝে মাঝে। চোখের ওপর সে জীয়ন্ত ঘোরাঘুরি করলে...

দ্বিজেন বেরিয়ে গেছে। না খেয়েই গেছে। উনুনটা ধরিয়ে দিয়ে বড়দিও স্নানে চলে গেছে অনেকক্ষণ। গনগনে উনুনের পাশ থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল অরুন্ধতী। মুখের কালিঝুলি লেগেই রয়েছে। থাক গে। মা গঙ্গা সব ধুয়ে নেবেন।

ফাঁকা ঘরটার দরজা হা-হা করছে খোলা। ভেতরে খাঁ-খাঁ করে জ্বলছিল উনুনটা। তার পাশে পেতে রাখা শিলের ওপর নোড়া চাপা দেওয়া একটা কাগজে কাঁচা হাতের লেখায় ক'টি অক্ষর তার প্রাপকের আশায় চুপ করে জেগে থাকে...

"স্রিচরনেশু,

আমি চলীলাম। তুমি একটী ভাল মেয়ে বিবাহ করিবা। সে তোমাকে সুখে রাখিবে।

অভাগিনি

অরুন্ধতী

***

"অনু..."

মুখের ওপর ঝাপসা একটা মুখ ঝুঁকে রয়েছে তার। অরুন্ধতী চোখ খুলে তাকিয়ে দেখল একবার। একটা ছিটেবেড়ার ঘর। জানালায় বড়ো বড়ো কচুগাছে রোদ পড়েছে এসে।

মুখটা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। বড়দি। তাকে তাকাতে দেখে একচিলতে হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

"ভেবেছিলি ফাঁকি দিয়ে পালাবি তাই না? কিন্তু অতসী বামনি কাছে থাকতে সে অত সহজ কাজ নয়। বাঁড়ুজ্জেঘাটে ডুব দিতে দিতে দেখি ও মা, আঘাটায় লাল

পাড় শাড়ি পরে ওটা কে ভেসে যাচ্ছে! ভাগ্যিস জোয়ার ছিল। নইলে ভাটায় টেনে নিলে আজ আর...”

“বড়দি...”

দরজা থেকে ভারী গলাটা পেয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল হঠাৎ অরুন্ধতীর। আর তারপরেই একই সঙ্গে একটা স্বস্তি আর হতাশা এসে ফের চেপে বসল তার সমস্ত সত্ত্বায়। সে নয়। মেজদার গলা। এ-ঘরটা তার চেনা। মেজদার ঘর।

বড়োননদ তার পাশ থেকে উঠে ঘোমটা টেনে দাঁড়ালেন। মেজদার মুখটায় উদ্বেগ আর খুশি একসঙ্গে মিলেমিশে গেছে। কাছে এসে বড়দির দিকে হাতজোড় করে ফিরে বলছেন, “আপনার কাছে চিরঋণে বাঁধা পড়লাম দিদি। আজ আপনি না থাকলে বোনটা আমার...”

বাকি কথাগুলো আর মুখ থেকে বের হচ্ছিল না তাঁর।

“একটু বাইরে আসুন দাদা। কথা আছে,” বলতে বলতে বড়দি মেজদাকে ধরে বাইরে বের হয়ে গেলেন। একটা ফাঁকা অনুভূতি এসে যেন গিলে খেতে চাইছিল অরুন্ধতীকে। মরতেও দেবে না তাকে এরা। আবার সেই নিত্যদিনের গ্লানি। শহরের বুকে একচিলতে ঘরে আটকে থেকে...

আস্তে আস্তে একটা শক্ত প্রতিজ্ঞা গড়ে উঠছিল তার মাথায়। দ্বিতীয়বার আর ভুল সে করবে না। ওখানেই যদি ফিরে যেতে হয়, তাহলে এইবার একদিন রাত্তিরবেলা উঠে একলা একলা...

একটা কোমল হাত এসে তার কপালে ঠেকল হঠাৎ। শরীরটা একটু কেঁপে উঠল অরুন্ধতীর। এ-ছোঁয়া সে চেনে। এবার? কোথায় পালাবে সে? দুর্বল হাত দিয়ে হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে চোখদুটো শক্ত করে বন্ধ করে শুয়ে রইল সে। লজ্জা? ভয়? অভিমান? তার অনভিজ্ঞ মন, বুকের ভেতর ওঠা তোলপাড়টাকে চিনতে পারে না। শুধু এইটুকু সে টের পায় ওই বিষামৃতে ভরা স্পর্শে বড়ো কষ্ট হয় তার।

***

নিঃশব্দে চৌকিটার পাশে একটা হাতলভাঙা চেয়ারে বসে রইল দ্বিজেন। স্কুলে খাওয়াদাওয়া ছিল আজ। কিছু মুখে তুলতে পারেনি সে। বলেছিল, “খিদে নেই। আমি বরং আমার শেয়ারটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে...” হেডমাস্টারমশাই মুচকি হেসেছিলেন জবাবে। বলেছিলেন, “আরে ইয়াংম্যান ওসব অজুহাত না-ই বা দিলে। আমরাও একদিন নববিবাহিত ছিলাম হে! গুড ওল্ড ডেজ। পেট ভরে খাও। তারপর বউমার জন্য ছাঁদা বাঁধবার দায়িত্ব আমার।”

খেতে পারেনি সে। দুজনের ভাগের মাংস ভাঁড়ে নিয়ে, কলাপাতায় খানিক

পোলাও বেঁধে সাইকেলে ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরেছিল হাওয়ার বেগে প্যাডেল করে। বারো মাইল পথ। সে-খাবার বাড়িতে পড়ে আছে। হাতের মুঠোয় অরুন্ধতীর চিঠিটা দলা করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। স্ত্রীর পত্র। প্রথম চিঠি।

মেজদির শ্বশুরবাড়ি গিয়ে প্রথম অরুন্ধতীকে দেখেছিল দ্বিজেন। খোলা প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো একটি পাখির মতোই একটা অদ্ভুত গান গাইতে গাইতে ফিরছিল। কলিটা দ্বিজেনের মনে আছে,

মই হইনু অবোলা নারী ডিহির বান্ধা জল...

ভালো লেগেছিল। মেজদির তা নজর এড়ায়নি। ছোটো এলাকা। সবাই সবাইকে চেনে। বলেছিল, "মেয়েটা কষ্টে আছে রে। বাপ-মা নেই। দাদার সংসারে থাকে। ওর আর এক দাদা তো তোদের ওখানেই মিলে কাজ করে। নাম সুগত। চিনিস?"

হ্যাঁ। সুগতকে দ্বিজেন চিনত। গভীরভাবেই। এই দেনগাঁ-তেই বাসা করে থাকেন। রেলপাড়ে। গ্রামের দিকে। বিয়ে-থা করেননি।

ওর পর আর সমস্যা হয়নি। পালটি ঘর। অরুন্ধতীর দাদাবউদিও এক কথায় রাজি। শুধু দেয়াথোয়া কিছু করতে পারবেন না সে-কথা পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন। দ্বিজেন চায়ওনি কিছু। প্রাইমারি ইশকুলের মাস্টার। সে-ই বা কোন লাট-বেলাট।

বাইরে সুগতদা আর বড়দি দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। দ্বিজেন উঠে গিয়ে দাঁড়াল সেখানে। তাকে দেখে সুগত মুখ তুলে চাইলেন।

"কী করি বলুন তো সুগতদা? যতটুকু সাধ্য সে তো করছি। তবু... মেয়েটা তিন মাসে কেমন শুকিয়ে গেল। অত সুন্দর গানের গলা! কিন্তু তিন মাসে, জানেন, গানের একটা কলি বেরোয়নি গলা থেকে। শুধু বলবে এই বাড়িতে আমার দম আটকে যায়। তুমি গাঁয়ের দিকে খানিক জমি নিয়ে... আচ্ছা আপনিই বলুন তো দাদা, মাস্টারি করে ক'টা টাকা পাই হাতে যে জমি কিনব? কাল রাতে রান্না নিয়ে খানিক রাগারাগি করেছিল। তারপর সকালে বড়দি আসতে খানিক হাসি-মশকরাও হল দিব্যি। তারপর এ যে এমন একটা কাণ্ড করে বসবে...

"রাত্তিরে কিচ্ছু দাঁতে কাটেনি। একটু ভালো খাবার-দাবার নিয়ে এসেছিলাম তাই। যদি খুশি হয়। তা এসে দেখি... এই দেখুন চিঠিও লিখে রেখেছিল একটা..."

চিঠিটা হাতে নিয়ে একবার সেদিকে, আর একবার দ্বিজেনের শুকিয়ে ওঠা মুখটার দিকে দেখলেন সুগত। অনেক দেখেছেন তিনি জীবনে। তার সমস্ত বাঁধনের আনন্দ যন্ত্রণা দুটিকেই চেনেন গভীরভাবে। একটা যন্ত্রণার পথ বেয়ে চলেছে যুবক-যুবতি দু-জন।

বড়ো একাকী বেড়ে উঠেছে দু-জনেই। দ্বিজেনের বড়ো হয়ে ওঠা দেশভাগের পটভূমিতে। দুই দিদির বিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে ছোটোবেলাতেই এদিককার হোস্টেলে

পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বাপ-মা। তারপর, এক দুঃস্বপ্নের রাত্রে দেশভাগের দাঙ্গা এসে তাঁদের খেয়েছে।

আর এ-মেয়ের কপালও তথৈবচ। দূর সম্পর্কের আত্মীয় তাঁদের। বাপ-মা মরতে বড়দার সংসারে মানুষ। বড়োবউদি সুবিধের মানুষ নন কোনোকালেই।

ফলে, যৌথ জীবনকে নিজের বলে বুঝতে শেখেনি দুটো একক সত্বাই। সুখকে সুখ বলেও চিনতে শেখেনি কোনোকালে। তার জন্যে তাদের কেউই দায়ী নয়।

তবু ওদের মধ্যে ভালোবাসার অস্ফুট বীজটিকে তিনি ছুঁতে পারছিলেন। ওদের অজান্তেই বীজটির ভেতরে অঙ্কুর দেখা দিচ্ছে এখন। প্রকৃতির পথ। ওদের আচরণে তাঁর অভিজ্ঞ চোখ সে-লক্ষণগুলোকে পড়ে নিতে পারছিল। সংঘর্ষ থেকে সযত্নে সরিয়ে রেখে তাকে বেড়ে ওঠবার সময় দিতে হবে এখন।

খানিক বাদে শান্ত গলায় তিনি বললেন, "ভেবো না। ক'টা দিন মেয়েটাকে বরং আমার কাছে এনে রাখি। গাঁ-গঞ্জ এলাকা। খোলামেলায় থাক। ঠিক হয়ে যাবে'খন।"

"সেই ভালো রে," অতসী দ্বিজেনের দিকে মুখ ঘোরাল, "তুই বরং বিয়ের আগে যেমন আমার ওখানে দুবেলা খেয়ে যেতিস, তেমনি ফের..."

ম্লান হেসে মাথা নাড়ল দ্বিজেন, "না রে। আমি নিজেই সামলে নেব।" কেন যেন ফের একবার দিদির সংসারে দুটি অন্নের জন্য ফিরে যেতে একরাশ সংকোচ তাকে গ্রাস করেছে তখন। নিজের বাড়ি থাকতে...

। ২ ।

বাড়িটা অনেকটা জায়গা নিয়ে। স্টেশান থেকে মাইলদুয়েক ভেতরে। একপাশে পুকুর আছে একটা। তাতে মাছ ঘাই দেয়। উঠোনের খানিক জায়গা খোলা রেখে দুপাশে, পেছনে সবজির খেত।

বারান্দার এক কোণে কাঠের জ্বালে ভাত হয়ে এসেছিল। হাঁড়িটা তুলে তার ফ্যান গালতে গালতেই একটা লম্বা শ্বাস ফেলে সে ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। দাদাটা বড়ো অগোছালো মানুষ। যত গুছিয়ে রাখো, তত এলোমেলো করে সব কিছু ছড়িয়ে ফেলবে! অথচ ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখলে এ-ঘরে জায়গা কম নাকি?

বেলা চড়ছিল। দাদার মর্নিং শিফটে ডিউটি আজ। ফেরার সময় বাজার করে নিয়ে ঢুকবে। তখন বাকি রান্না। বাইরে রোদ উঠেছে কড়া। আশ্বিনের রোদ। সেদিকে একবার দেখে নিয়ে সে গলা তুলে ডাকল, "ভোঁদড়!"

"যাই দিদি।"

বছর দশেক বয়েস হবে ছেলেটার। দাদার কাছেই থাকে। ফাইফরমাশ খাটে

টুকটাক। রাতে দাদা ওকে পড়ায়। আজকাল সে-আসরে অরুন্ধতীও এসে বসছে।

সে আসতে আঁচল খুলে একটা কাঁচা টাকা তার হাতে দিল অরুন্ধতী। "ছুটে যা। হারুর দোকান থেকে একটা ছুঁচ আর গুলিসুতো নিয়ে আসবি। আর দু'গজ লাল শালু।"

"আর আমি?"

অরুন্ধতী হাসল, "ঠিক আছে। একটা মাছ লজেন্স। তার বেশি নয়।"

ভোঁদড় অবশ্য তাতেই বেজায় সন্তুষ্ট। পয়সা হাতে নিয়ে টিটিটিটি করে কী এক আজব সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সে ভোঁ দৌড় দিয়েছে উঠোন পেরিয়ে সামনের রাস্তা ধরে।

ঘরে ঢুকে দাদার তোশকটা বাইরে এনে রোদে দিল অরুন্ধতী। তাকে চৌকিটা দিয়ে দাদা ওই পেতে মাটিতে শোয়। বর্ষায় মাটি থেকে ভাপ উঠে স্যাঁতসেঁতে হয়ে এসেছে জিনিসটা। এখানে-ওখানে ছেঁড়া। রোদ খাক এখন খানিক। তারপর ভোঁদড় ছুঁচসুতো, শালু আনলে ছেঁড়াফাটাগুলো ঠিকঠাক করে দিলেই হবে। অরুন্ধতী আঁচলে বাঁধা অবশিষ্ট টাকা ক'টাকে একবার ছুঁয়ে দেখে নিল। দ্বিজেন তার মাসখরচা দাদাকে দেবে বলেছিল। দাদা রাজি হয়নি। বলে, "নিজের বোনকে খাইয়ে পয়সা নেব কী গো? ও তো আমার ঘরে দুদিনের অতিথ।"

'দুদিনের অতিথ' শুনে অরুন্ধতী মাথা নেড়েছিল শক্ত করে। দেনগাঁর গঙ্গার ধারের ওই একচিলতে নরকটাতে সে আর কিছুতেই ফিরে যাবে না। তারপর থেকে মাসে দশটা করে টাকা তার হাতেই দিয়ে যায় দ্বিজেন। তার হাতখরচ। অরুন্ধতী মানা করে না। বারবার দাদার কাছে হাত পাতবার দায় থাকে না ওতে। তারই বা আর কতটুকু রোজগার! তার চাইতে যার দায় সে করুক না! ক্ষতি কী?

বাড়িটা নিঃঝুম হয়ে আছে। চালের ওপর তোশক রোদে দিয়ে বারান্দার এক কোণে বসে চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল অরুন্ধতী। পুজো গিয়েছে সবে। বাতাসে শেষ শরতের ছোঁয়া। কাল কোজাগরী। প্রকৃতিতেও তার প্রস্তুতি চলেছে।

"ছুঁচসুতো নিয়ে কী করবি রে?"

দাদার গলা শুনে হঠাৎ চমক ভেঙে ঘুরে তাকাল সে। দুটো বড়ো বড়ো বাজারের থলে একপাশে নামিয়ে রাখতে রাখতেই সুগত হাসছিলেন, "ফিরছি, তখন দেখি ভোঁদড় হাতে ছুঁচের পাতা, গুলিসুতো আর এই শালুর টুকরো নিয়ে ঘোষপুকুরে মাছ ধরা দেখছে। আমায় দেখে বলে 'বদ্দাদা তুমি দিদিকে এগুলো দিয়ে দিও। আর, এই যে চল্লিশ পয়সা ফেরত।' হ্যাঁ রে তোর দাদাটা কি তোকে একটা ছুঁচসুতোও কিনে দিতে পারে না? নিজের পয়সা দিয়ে..."

অরুন্ধতী অবশ্য তাঁর সে-কথার কোনো জবাব দিচ্ছিল না। বাজারের থলেদুটোর দিকে তখন তার চোখ গিয়েছে।

"তোমার তোশকটা একটু সেলাই করে দেব ভাবছিলাম। কিন্তু অত কী

বাজার করলে দাদা?"

সুগত হাসলেন, "উঠে এসে দেখ একবার।"

অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে থলেদুটো খুলে দেখল। তারপর অবাক হয়ে বলে, "মরাই, লক্ষ্মীর পট, দশকর্ম, ফলফুলুরি, কদমা, খেলনা... তুমি... হঠাৎ?"

"তোর দ্বারা সংসার করা আর হবে না। কাল কোজাগরী ভুলে গেলি?"

"তু— তুমি পুজো করবে বাড়িতে?" এবার অরুন্ধতীর অবাক হবার পালা। এ-বাড়িতে কোনো ঠাকুরদেবতা নেই। গত তিনমাসে কখনো তার এই দাদাটিকে কোনো ঈশ্বরের নাম নিতে সে দেখেনি। কিছু বললে একগাল হেসে, ঘরের এক কোণে রাখা মোটা মোটা কয়েকটা লাল মলাট দেওয়া বই দেখিয়ে বলেছে, ও-ই আমার ভগবান।

ফের মাথা নেড়ে হাসলেন সুগত, "আমি নয়। আমার আর এক বন্ধুর বাড়িতে পুজো হবে। সে-বেচারা নতুন বিয়ে করেছে। বড়ো আশা করে ভিটেয় প্রথমবার পুজো করছে। কায়দাকানুন কিছুই জানে না। শেষে আমি বললাম, নিজে মানি ছাই না-মানি, বামুনের ছেলে, নিয়মকানুন তো কিছু জানি। টাকাপয়সা নিয়ে বাজারটা করে আনলাম। চল কাল আমরা ভাইবোন মিলে গিয়ে পুজো উঠিয়ে দিয়ে আসি গিয়ে। আসলে জানিস, যার যা বিশ্বাস সেইটে নিয়ে ভালো থাকলে ক্ষতি কী?"

বাড়ি! পুজো! নিজের অজান্তেই একটা ঈর্ষার ছায়া উড়ে গেল অরুন্ধতীর চোখ বেয়ে। খানিক বাদে মাথা নেড়ে সে বলল, "কোথায় গো?"

"কাছেই। সোনারিপুকুরের ওদিকে খানিক জমি নিয়েছে। আমিই খোঁজ দিয়েছিলাম। সস্তায় হয়ে গেছে। কাল চল। গিয়েই দেখতে পাবি।"

***

দিনটা ভারি সুন্দর। সোনারিপুকুরের পুব পাড়ে এই বাড়িটা একদম নতুন। ছিটেবেড়ার দেয়াল। মাথায় টালি। গোবর-লেপা ঠনঠনে উঠুন। তার গায়ে কাঁচা হলুদ রঙের বিকেলের রোদ এসে পড়ছিল। কাঠাদশেক জমি। দেখলে হিংসে হয়। তার যদি এমন একটা...

আজ উপোস করেছে অরুন্ধতী। হোক না পরের পুজো। নিয়মকানুন তো মানতে হয়। দুপুর-দুপুর দাদা তাকে নিয়ে চলে এসেছিল এখানে। এসে অরুন্ধতী অবাক। বাড়িতে জনমনিষ্যি নেই। দেখে খানিক অবাকই হয়েছিল অরুন্ধতী।

দাদা তার মুখের বাঁকা হাসি দেখে তাড়াতাড়ি বলে, "না রে, আসবে। আসলে আজ একেবারে লক্ষ্মীপুজো করে তারপর গৃহপ্রবেশ করবে কি না! বোধায় তাকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে গেছে তার কর্তা।

হবে হয়তো। তবু একটুখানি বিরক্তই হয়েছিল অরুন্ধতী। বলিহারি যাই বাড়ির গিন্নির। নিজের ঘরে লক্ষ্মীপুজো তা নিজেরই দেখা নেই! পরের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে...

উঠোন জুড়ে চালের গুঁড়োর পিটুলি দিয়ে আলপনা দেওয়া সারা হয়ে এল অরুন্ধতীর। বড়ো বড়ো পদ্মফুল এঁকেছে। লম্বা লম্বা লতা আর লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ। ছাপ দেখে দাদা একটু হেসেছিল অবশ্য। বলে, "ও কী রে? মা লক্ষ্মী কেবল ডান পায়ে কিতকিত খেলতে খেলতে ঘরে আসবে বুঝি?"

ভুলটা বুঝতে পেরে অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি আবার একটা একটা করে পা মুছে নতুন আঁকতে বসে।

হাত ধুয়ে বারান্দায় উঠে এল এবারে সে। ঘরের মালিকের দেখা নেই এখনও। দাদার অবশ্য তাতে বিশেষ হেলদোল নেই। দিব্যি ঘরের ভেতর লক্ষ্মীর সরা বসিয়ে পুজোর জোগাড় করছে। সুন্দর সাজিয়েছে সবকিছু। কলাগাছের খোলের নৌকোয় শস্যের মরাই। কলাপাতায় চাল ভেজা, কলা, পাঁচরকম ফল। লক্ষ্মীর পটের সামনে একটা শাড়ি, আলতা-সিঁদুর... একদম আসল পুজোর মতো। তাকে দেখে দাদা মুখ তুলে বলে, "চন্দনটা একটু পিষে দিবি নাকি?"

পুবে গাছপালার আড়ালে থালার মতো চাঁদটা মুখ বাড়িয়েছে। সেদিকে একনজর দেখে নিয়ে কী মনে হতে অরুন্ধতী বলল, "দাঁড়াও, শাঁখটায় তিনটে ফুঁ দিয়ে দি আগে। এদের তো তুলসিতলা নেই। প্রদীপ দেখাব কোথা কে জানে!"

দাদা হাসল, "সব হয়ে যাবে একে একে।"

মাথায় ঘোমটাটা টেনে দিয়ে শাঁখটা হাতে নিয়ে গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিতে দিতেই হঠাৎ দরজার কাছে ছায়া পড়ল একটা। দাদা তাড়াতাড়ি সেদিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বলে, "আরে দ্বিজেন যে! এস এস।"

শাঁখটা নামিয়ে রেখে মুখ ঘুরিয়ে দেখল অরুন্ধতী। বারান্দার নীচে জুতো খুলে রেখে উঠে আসছে সে। হঠাৎ বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল তার। ও তাহলে ফের..."

ভয়টাকে আরও বাড়িয়ে দিয়ে দ্বিজেন উঠে এসে তার দিকে তাকিয়ে ফিকে একটু হাসি দিয়েই দাদার দিকে ঘুরে বলল, "বেশি দেরি হয়নি তো? সন্ধের লগ্নে পুজো বলেছিলেন না দাদা?"

"উঁহু। দেরি হয়নি। এসো। পুকুরে গিয়ে স্নান সেরে পোশাক পালটে নাও। তারপর জোড়ে এসে বসে সংকল্প হবে প্রথমে..."

"যাই।"

বলে তার পাশ দিয়ে অন্ধকারে নেমে ডোবাটার দিকে চলে গেল দ্বিজেন। যাবার সময় কী যেন বলবে বলে তার দিকে তাকিয়েছিল একবার। অরুন্ধতী চোখ ঘুরিয়ে নিল।

নাঃ। কাঁদবে না সে। দ্বিজেনের দোষ কী? সে-ই তো চিঠি লিখে তাকে অনুমতি দিয়ে এসেছিল। শুধু একটাই দুঃখ হচ্ছিল তার। দাদা তাকে আগে কিছু বলল না কেন? জানলে সে দ্বিজেনের নতুন সংসারে কিছুতেই এভাবে...

মুখ ঘুরিয়ে আঁচলে চোখদুটো একবার মুছে নিল সে। লোকটা একা একা আগে আগে ঢুকে এসেছে। বউটা বোধহয় এখনও পিছু পিছু রাস্তাতেই...

বাড়ির সীমানায় মেহেন্দির বেড়া। তার মধ্যে কাঠের ছোট্ট দরজাটি। সেইটি ধরে বাইরের অন্ধকার রাস্তাটার দিকে তাকিয়েছিল অরুন্ধতী। অন্ধকারে নিজের অজান্তেই বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছিল চোখের কোল বেয়ে। তখন হঠাৎ পেছন থেকে দ্বিজেনের গলাটা ভেসে এল। কখন যেন অন্ধকারে চুপচাপ আর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে,

"কাকে খুঁজছ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে?"

ধরা পড়ে গিয়ে একটু অস্বস্তিতে পড়ল অরুন্ধতী, "না, নতুন বউ..."

"হুম। শোনো। পুকুরে একটা ডুব দিয়ে, ভিজে শাড়ি পালটে এইটে পরে ঘরে এসো। শিগগির_"

বলতে বলতেই একটা কাগজের প্যাকেট অন্ধকারে তার হাতে গুঁজে দিয়েছে দ্বিজেন। মুখ ঘুরিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েছিল সে। কিন্তু তার আগেই অন্ধকারে দুটো সবল হাত এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। দুটো আগ্রাসী ঠোঁট এসে তার না-বলা কথাগুলোকে থামিয়ে দিল। খানিক বাদে অন্ধকারের ভেতর দ্বিজেনের গলাটা ফিশফিশ করে তার কানে কানে বলল, "নতুন আর কোথা পাব? একটাই পুরোনো বউ। তার জন্যেই তো..."

***

আজ কোজাগরী। গেরস্তকে আজ সস্ত্রীক রাত জাগতে হয়। দাদার অবশ্য ওসব রীতিনিয়মে ভক্তি নেই। পুজোটুজো সেরে খাওয়াদাওয়া মিটিয়ে সে ছোটো ঘরটায় গিয়ে আরামে শুয়ে পড়েছে। বলে, "যাদের ঘর তারা রাত জাগুক গে। আমি ওসবে নেই।"

উঠোনে ডগডগে চাঁদের আলো। বেড়ার ওধারে বিস্তীর্ণ ধানের খেতের বুকে সে আলোয় ঢেউ খেলছে। সেদিকে দেখতে দেখতে অরুন্ধতী বলল, "এতগুলো টাকা..."

দ্বিজেন হাসল মিটিমিটি, "সব সুগতদার জন্য, বুঝলে? খুব সাহায্য করেছে। কিছুতেই কথা শুনল না। নিজের বাড়িটা ব্যাঙ্কে মর্টগেজ দিয়ে টাকা তুলেছে। বলে 'আস্তে আস্তে ব্যাঙ্কের কিস্তি শোধ দিবি। তাহলেই হবে। যা করছি সে আমার বোনের জন্য। তাতে তুই কথা বলবার কে?' এখন বছরপাঁচেক খানিক টানাটানিতে চলবে। ধারটা শোধ দিতে হবে তো! সে যাক গে! তুমি খুশি কি না তাই বলো। এমন একটা বাড়িই তো চেয়েছিলে? তাই না?"

"হুঁ উ..."

***

উঠোনের ঠনঠনে আলপনা আঁকা মাটিতে শুয়ে পড়েছে অরুন্ধতী। লাল শাড়িটিতে কোনো তরুণ ঈশ্বরীর মতো দেখায় তাকে সেই চাঁদের রুপোলি আলোয়। ঘরের ভেতরের অন্ধকার থেকে সেদিকে তাকিয়ে দেখছিলেন সুগত। দুটি মানুষ বড়ো সুখে ঘন হয়ে মিশে এক হয়ে রয়েছে সেখানে। তাদের মাথায় আশীর্বাদের মতো চাঁদের আলো ঝরে পড়ছে। গুনগুন করে গান ধরেছে মেয়েটি। জীবনের গান।

একটা অদ্ভুত ফাঁকা ভাব ছড়িয়ে পড়ছিল তাঁর বুকে। দ্বিজেন তাঁর বড়ো প্রিয় শিষ্য ছিল। এই উনসত্তর সালের গত কয়েকটা মাস জুড়ে উত্তরবঙ্গে একটা ঝড় ঘনিয়ে উঠেছে। তার ঢেউ এসে লাগছে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ কলকারখানায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। অতিবামপন্থী সেই আন্দোলনে তলায় তলায় নিজেদেরও জড়িয়েছিলেন সুগত ও দ্বিজেন। সেই পার্টির কাজেই উত্তরবঙ্গে গিয়ে যখন দ্বিজেন তাঁরই বোনটাকে বিয়ে করে ফিরল তখন একটা অদ্ভুত দ্বন্দ্ব জেগেছিল তাঁর মনে।

বিয়ে করেননি তিনি। সে তাঁর পথ নয়। প্রথম যৌবনে বামপন্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। সে বাঁধন আর খুলবে না। সামনেই যুদ্ধ আসছে। রক্ত ঝরবে অনেক। হয়তো তিনি নিজেও তাতে...

...সে হোক। তার একটা জীবনের আর মূল্য কতটুকু। কিন্তু, সেই অনাগত রণাঙ্গণের বুকে, নিজের যথাসর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসার এই বীজটুকু তিনি ছড়িয়ে রেখে গেলেন। যুদ্ধশেষে, রণাঙ্গণের বুকে ফসল ফলাবার জন্য কৃষকেরও তো প্রয়োজন হয়!



চিন্ময়ী

কল্যাণী মেইন ছেড়ে গাড়ি চলল ব্রাঞ্চলাইন ধরে ঘোষপাড়ার দিকে। ভাদ্রের ভ্যাপসা গুমোট কাটিয়ে এইবার খানিক হাওয়া আসছে জানালা দিয়ে।

তবে তীর্ণার সেদিকে মন ছিল না। হাতে ধরা বইয়ের পাতায় তার চোখদুটো আটকানো। যদিও এলোমেলো হাওয়ায় তার অবাধ্য চুল, তার শাড়ির আঁচল উড়ছিল।

"কী পড়ছিস রে?"

সুব্রতদা কখন যেন ওপাশ থেকে উঠে তার পাশে এসে বসেছে। তীর্ণা মুখ তুলে বইটা তার দিকে এগিয়ে ধরল।

"উরিব্বাস! ফার্স্ট ইয়ারের প্রোবাবিলিটির ক্লাসে আজকাল আজকাল 'রস'-এর স্টোকাস্টিক প্রসেস রেফার করছে নাকি? আমরা তো থার্ড ইয়ারেও ও-জিনিস ধরতে..."

তীর্ণা একটু অপ্রস্তুত মুখে হাসল, "না মানে সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে গিয়ে বই হাঁটকাতে হাঁটকাতে..."

"আজেবাজে জিনিস পড়া ছাড় তো..." সুব্রতর গলায় সামান্য গুরুজনসুলভ কর্তৃত্ব। কখন যেন তার গায়ের ওপর একটুখানি ঘেঁষে এসেছে সে।

আঁচলটা টেনে জানালার দিকে একটু সরে বসল তীর্ণা। বইটা তেমনি হাতে ধরা। সুব্রত ফের তার কাছে ঠেলে এল। "কী রে? কথা কানে যাচ্ছে না?"

তীর্ণা তাড়াতাড়ি বইটা ঝোলার ভেতর চালান করে দিল। ওপাশ থেকে রুদ্র আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হতে চোখ নামিয়ে সে বাইরের দিকে তাকাল ফের।

"গুড!" সুব্রতর মুখে একচিলতে হাসি ছড়িয়ে পড়ছিল, "ওবিডিয়েন্স ইজ দ্য

ফার্স্ট স্টেপ টু সাকসেস। ওসব পিজি লেভেলের জিনিস সিভিলসে আসবে না। একস্ট্রা টাইম পেলে বরং জিকের চ্যাপ্টারগুলো এখন থেকে...”

আসলে সুব্রত সব বিষয়েই একেবারে নিশ্চিত থাকে। সবসময়। তীর্ণাকে তার ভালো লাগে। অতএব তীর্ণার মালিকানার বিষয়ে সে নিশ্চিত। সে সিভিলস দিচ্ছে আগামীবার, অতএব তীর্ণাও তার পথে হেঁটে সিভিলস দেবে সে-বিষয়ে সে নিশ্চিত।

...হঠাৎ একটু শিউরে উঠল তীর্ণা। সুব্রত বড়ো বেশি অ্যাগ্রেসিভ। মধ্যে একদিন ছুতো করে বাড়িতে এসে বাবা-মা'র সঙ্গে আলাপও করে গেছে। অমন ঝকঝকে একটা মুখ! ওরকম দুর্ধর্ষ ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড! মা-বাবা বেশ নরম হয়ে পড়েছে। চলে যেতে বাবা বলে, “খুব ড্যাশি আর ম্যাচিওর ছেলে কিন্তু। এমনটা সচরাচর চোখে পড়ে না। আর কী হেল্পফুল! নিজে সিভিলস দিচ্ছে, তোকেও গাইড করতে চাইছে। বাঃ! বন্ধুত্বটা রাখিস। ম্যাচুরিটি! দ্যাটস হোয়াট আ গার্ল নিডস ফ্রম আ ম্যান...”

পুরোনো দিনের মানুষ। সরাসরি বলবেন না। কিন্তু বাবার গলার প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ের পেছনে একটা নির্দেশেরও ইঙ্গিত ছিল।

গাড়ি ঘোষপাড়া স্টেশনের খানিক আগে, স্পোর্টস সেন্টারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছে। দেখে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সুব্রত। এখান থেকে ওদের হোস্টেল একেবারে সামনা-সামনি। দরজার হ্যান্ডেলটা ধরে লাইনে নেমে যেতে যেতেই ফের একবার বলে গেল, “দেড়টায় ক্যান্টিনে আসছি।”

তীর্ণা জবাব দিল না। “চলে আসিস কিন্তু,” এই বাক্যবন্ধটা সুব্রত উচ্চারণ করেনি। কারণ সে নিশ্চিত তীর্ণা আসবেই।

***

“এই ওঠ ওঠ... নামবি তো, নাকি?”

রুদ্রর গলা। চমক ভেঙে তীর্ণা তার দিকে ঘুরে দেখল একবার। রুদ্রর মুখটায় আশ্চর্য একটা ছেলেমানুষি মাখানো থাকে সবসময়। এখনও বালকত্ব যেন কাটেনি তার। ট্রেন কখন যেন ঘোষপাড়া স্টেশনে এসে ঢুকেছে। কামরা প্রায় ফাঁকা।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল তীর্ণা। গাড়ি নড়ে উঠেছে।

“লাফা... লাফা...” নীচে নেমে দাঁড়ানো রুদ্র তার ডানহাতটা ধরে টান দিচ্ছিল। তীর্ণা ভারসাম্য হারিয়ে প্ল্যাটফর্মে লাফ দিল।

“বদমাশ ছেলে! প্ল্যাটফর্মে আছাড় খেলে আজ...”

বড়ো বড়ো শ্বাস ফেলছিল তীর্ণা। দুহাতে রুদ্রর কাঁধদুটো তখনও শক্ত করে ধরা। সেদিকে চোখ রেখে ঝরঝর করে হেসে ফেলল রুদ্র, “আছাড় খেতি না। ঝাঁটার কাঠির মতো চেহারা। না ধরলে হাওয়ায় উড়ে গিয়ে...”

"তবে রে..."

"কান ছাড় বলছি... কান ছেড়ে দে তুই..."

"শয়তান কাঁহিকা..."

"তীর্ণা..."

হঠাৎ তার হাতদুটোর মধ্যে একেবারে স্থির হয়ে গেছে রুদ্রর মাথাটা, "নড়বি না! জাস্ট ফ্রিজ। না! চোখের এক্সপ্রেশান যেন না বদলায়... ঠিক যেভাবে তাকিয়ে আছিস... দেখি দেখি..."

খ্যাপা ছেলে। কখন যে কোন ভাব-এ থাকে কে জানে। এই মুহূর্তে মুখের একেবারে কাছে জেগে থাকা দুটো অনাবিল, সরল চোখ তার যেন তাকে বিঁধে ফেলতে চাইছে। সে চোখে লোভ, গ্লানি বা লজ্জা নেই। শুধু সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ কুমারীর নিজের অজান্তেই দেখিয়ে দেওয়া রুদ্ররূপটুকুকে যেন শুষে নিয়ে ধরে রাখছে তার মস্তিষ্কের কোনো গোপন রত্নকোষে।

"সাক্ষাৎ রুদ্রাণী... এই মুখটাই তো আমি..."

"রুদ্র, অসভ্যতা করবি না বলছি।"

কথাটা তীর্ণার মুখ থেকে বের হয়ে এসে হঠাৎ মুহূর্তের ম্যাজিকটাকে ভেঙে দিয়ে গেল যেন। রুদ্র ভারি লজ্জা পেয়ে মাথা নাড়ছিল দু'দিকে, "এই, মাক্কালী বলছি, আমি ওসব কিছু মিন করে রুদ্রাণী বলিনি... মাইরি..."

২

"স্যার!"

"আবার কী হল?" নিমাই ভটচায বোর্ডে হাতের নোট্স্ থেকে এস্টিমেশানের থিয়োরেমটা টুকতে টুকতেই জবাব দিলেন।

রুদ্র মিটমিট করে হেসে বলল, "কলমের কালি ফুরিয়ে গেছে।"

নিমাই ভটচাযের ভুরুদুটো রুদ্রর প্রত্যাশা মতো গিঁট পাকিয়ে উঠল। ক্র্যামারের বই থেকে টুকে এনে ক্লাসে উগরে দেন। বাধা পড়লে লাইন গুলিয়ে যায়।

খানিক বাদে একটা শ্বাস ছেড়ে ভটচায বললেন, "যাও। তবে আমার ক্লাসে আর ফিরে এসো না। পুজোর তো আর দিনতিনেক বাকি! বাড়ি গিয়ে বাবার সঙ্গে ঠাকুরের গায়ে রঙ চড়াও বরং। উপকার হবে। কুমোরের ব্রেন-এ এস্টিমেশান থিয়োরেম..."

রুদ্রর চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক। ক্লাশ পালাবার কায়দাটা তার কাজে লেগে গেছে দেখে ভারি খুশি। তবে যেতে যেতেই হঠাৎ ফিরে এসে একগাল হেসে বোর্ডের ডানদিকে ইশারা করে বলে, "ও স্যার, ক্র্যামারের বইতে একটা টাইপো আছে। ওই রাইট লিমিটটা ওপেন হবে তো! নইলে মিলবে না।"

একনজর বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখে হঠাৎ নিমাই ভটচাযের গলায় বাজ ডেকে উঠল যেন, "গেট আউট..."

ক্লাস জুড়ে একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে যাচ্ছিল।

***

"তুই আজ ক্লাসে ও'রকম অসভ্যের মতো বিহেভ করলি কেন?"

"রুদ্র মিটিমিটি হেসে ফিশফিশ করে বলল, "চিৎকার করলে রিডিং রুম থেকে তাড়িয়ে দেবে। তাহলে আর মহলানবীশ ডি-স্কোয়ারের রহস্যটা..."

এই একটা ব্যাপারেই তীর্ণার দুর্বলতাটা রুদ্র ধরে ফেলেছে। পড়াশোনার ব্যাপারটা তার সত্যিই প্রিয়। রুদ্ররও। তীক্ষ্ণ মেধার ছেলেটা ইউজির প্রথম বছরটা শেষ করবার আগেই রাশিবিজ্ঞানের গভীর ও জটিল দিকগুলোতে একা একাই পা বাড়িয়ে ফেলেছে। তীর্ণাকেও সে সঙ্গে নিয়েছে এই যাত্রায়। ফার্স্ট ইয়ারের সাধারণ অঙ্কের তুচ্ছ গণ্ডিকে ছাড়িয়ে সে-ও এখন রুদ্রর হাত ধরে উড়াল দিয়েছে এ-শাস্ত্রের গভীরতর সমুদ্রের বুকে।

গলা নামাল তীর্ণা, "তাই বলে তুই ক্লাসের মধ্যে স্যারের ভুল ধরিয়ে এভাবে অপদস্থ করবি? দ্যাট ওয়াজ রুড রুদ্র!"

রুদ্র মাথা নাড়ল একবার। মুখটা ছোটো হয়ে গেছে তার, "সরি রে। আসলে আমাদের ফ্যামিলি প্রফেশানটা নিয়ে ওভাবে স্যার বাঁকা কথা বলতে হঠাৎ..."

"ওহো। তুমি তাহলে এইখানে!"

নীচু গলায় কথাগুলো ভেসে আসতে হঠাৎ খাতার ওপর ঝুঁকে কাছাকাছি হয়ে থাকা মাথাদুটো মুখ উঁচু করে তাকাল। সুব্রত কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পেছনে।

"...তা দু-জনে মিলে ফাঁকা লাইব্রেরিতে বসে সন্ধেবেলা কী চর্চা হচ্ছে? কাব্যটাব্য?"

তার গলায় সন্দেহের চাপা বিষটুকুর ছোঁয়া পেয়ে ভয়ে চুপ করে গিয়েছিল তীর্ণা। খানিক বাদে রুদ্র মুখ তুলে একটু অপ্রস্তুতভাবে হাসল, "এই রে! এত দেরি হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি সুব্রতদা। আ-আমি তীর্ণাকে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে যাব বরং... এই প্রবলেমটা দেখ একবার শুধু! কী ইন্টারে..."

তাকে একরকম উপেক্ষা করেই তীর্ণার দিকে ঘুরল সুব্রত, "এভাবে নিজের টার্গেট ভুলে আননেসেসারি পড়াশোনায় টাইম ওয়েস্ট করবার মানে কী তীর্ণা? এ না-হয় গ্র্যাজুয়েশানের পর নিজের জাতব্যাবসায় ফিরে গিয়ে করে খাবে। এসব লোকদেখানি পণ্ডিতির ভড়ং এদের সাজে। কিন্তু তুমি? কোন সোসাইটির মেয়ে তুমি,

কোন লেভেলের কেরিয়ারের জন্য তোমাকে তৈরি হতে হবে, সে-সব ভুলে গেলে?"

বিষটুকু ঢেলে দিয়েই ঘুরে দাঁড়াল সে, "উঠে বাড়ি যাও সোজা, আর হ্যাঁ, আর একটা কথা। গেল মাসেই এই ছোটোলোকটার সঙ্গে ঘোষপাড়া স্টেশানে কোলাকুলি করছিলে। সুপর্ণরা দেখেছে। এখনো সতর্ক হও তীর্ণা। আমাদের পরিবারে আসতে হলে ক্যারেকটার একটা প্রধান শর্ত কিন্তু।"

***

আজ চতুর্থী। সন্ধের লোকালটা ঘোষপাড়া ঢুকতে এখনও মিনিটকয়েক দেরি। প্ল্যাটফর্মের সিমেন্টের বেঞ্চে চুপ করে বসে ছিল রুদ্র। 'মামা'-র দোকান থেকে চায়ের ভাঁড়দুটো হাতে করে তার সামনে এসে দাঁড়াল তীর্ণা।

"অপমানটার জবাব দিবি না রুদ্র?"

রুদ্র ফিকে হাসল একটু, "সুব্রতদার কথার? ধুস! তোর বর হবে তো! ওর সাতখুন মাফ।"

মুখটা কঠিন হয়ে উঠল তীর্ণার। শৈশব থেকে তাকে গড়ে তোলা হয়েছে একজন আদর্শ স্ত্রী ও মা হয়ে ওঠবার জন্য। সুব্রত তার বাবার পছন্দের মানুষ। অভিভাবকের পছন্দকে সে ভবিতব্য বলেই জানে ও মানে। কিন্তু তবু, এই মুহূর্তে তার সামনে বসে থাকা প্রিয় সহপাঠীর অপমানটা তার বুকে বড়ো বাজছিল।

"না রুদ্র। সে জবাব নয়। অত নীচু তোকে হতে বলছি না। তোকে পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে হবে রুদ্র। জন্মের ওপর কারও হাত নেই। কিন্তু মেধায় সুব্রত তোর নখের যোগ্য নয়। সেই মেধা দিয়েই জন্মের এই ক্ষুদ্রতাটাকে কাটিয়ে উঠতে হবে তোকে। যাতে তোকে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে দেখতে হয় এদের। পারবি না তুই?"

হঠাৎ তীব্র চোখদুটো তার দিকে ঘুরিয়ে ধরল রুদ্র, "তুইও এ-কথা বললি তীর্ণা?"

"ভুল কিছু বলেছি?"

"বলেছিস। সুব্রতদাই ঠিক কথা বলে গেছে। পড়তে এসেছি আমি কেবল নিজের আনন্দে। তারপর আমার পিতৃপুরুষের পেশাতেই ফিরে যাব।"

"রুদ্র... ক্ষমতা থাকতেও তুই নিজেকে এভাবে একটা তুচ্ছ প্রফেশনে গুটিয়ে রাখবি? এত অপমানের পরেও... তুই..."

ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে প্ল্যাটফর্মে। কামরায় উঠে আসতে আসতেই হঠাৎ চোখদুটো যেন ঝলসে উঠল রুদ্রর, "একটা রিকোয়েস্ট। এখন কাঁচরাপাড়ায় একটু নামতে হবে তোকে। জাস্ট আধঘণ্টা। তারপর সঙ্গে করে এনে সাতটার শান্তিপুর লোকাল ধরিয়ে দেব।"

"তোদের বাড়ি? কিন্তু..."

"না। বাড়ি না," রুদ্রর গলায় কোথাও যেন একটা মিনতির ছোঁয়া ছিল,

"আমাদের মহাবিদ্যা শিল্পালয়ে। না জেনে, আমাদের সাতপুরুষের সাধনার গায়ে এভাবে তুচ্ছতার তকমা এঁটে দিয়ে তুই চলে যেতে পারিস না। একবার অন্তত এসে দেখে যা..."

***

স্টেশন চত্বর পেরিয়ে বাঁদিকে হালিশহরের রাস্তাটা চলে গেছে। তাকে সাইকেলের কেরিয়ারে বসিয়ে মিনিটদশেক যাবার পর একটা আলোজ্বলা বাড়ির সামনে এসে থামল রুদ্র।

"এসে গেছি। আয়। ভেতরে আয়..."

বলতে বলতেই পকেট থেকে চাবি বের করে তার দরজা খুলতে খুলতে রুদ্র ফের বলল, প্রাইমারি তৈরিটা বাবা সামলায়। তারপর মুখচোখের কাজ আমার এরিয়া। আয়... দ্যাখ..."

পাশাপাশি সারি সারি দাঁড়ানো অপরূপ দুর্গাপ্রতিমাগুলোর মুখের ওপর ঢেকে রাখা কাগজের আবরণগুলো একের পর এক সরিয়ে দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছিল রুদ্র। সিংহবাহিনী রুদ্রাণীর গর্জন তেল মাখা অপরূপ মুখগুলোতে হলদেটে বালবের আলো ঝলকাচ্ছিল।

রূপের বন্যা বয়ে চলেছিল যেন তীর্ণাকে ঘিরে। দুপাশে সার বেঁধে স্থির হয়ে থাকা, তখনও প্রাণপ্রতিষ্ঠা না-হওয়া মৃন্ময়ীদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে একটা ঢেউ উঠে আসছিল সেই যুবতির। প্রতিটি প্রতিমার মুখ থেকে সে নিজেই যেন তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

"মুখের ছাঁচ তৈরি করে বসানো হয়ে গিয়েছিল, বুঝলি? তারপর, সেদিন স্টেশানে তোর ওই রাগি মুখটা দেখে চমকে উঠেছিলাম। এই তো আমার রুদ্রাণীর আসল রূপ! মাটিতে একে ধরতে পারলে আমার শিল্প সার্থক।

"ফিরে এসে সব মুখগুলো ভেঙে ফেলে দিয়েছিলাম সেদিন। তারপর দিনরাত পরিশ্রম করে, রাতের পর রাত জেগে জেগে...

"...চেয়ে দ্যাখ তীর্ণা। এই আমার জাতব্যাবসা। চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ী রূপে বাঁধা। তুচ্ছ কাজ? হ্যাঁ রে? সুব্রতদা সাধারণ মানুষ। দশটা লোক যা বলে ও-ওতো তাই-ই বলবে। কিন্তু তুই? তুই কেন ও'কথা আমায় বলবি? কেন তীর্ণা? তোকে তো আমি..."

তখন সেই মূর্তিদের সাক্ষী রেখে, নিজের সৃষ্ট রূপের সমুদ্রে ডুবে থাকা যুবকটির মুখোমুখি নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে এক যুবতী। তাদের ঘিরে থাকা রুদ্রাণী শিবাণীদের মুখে নিজের মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে দেখতে একটা প্রতিজ্ঞায় স্থিত হচ্ছিল সে, আর সে কারও আদেশ মানবে না। আজ সে বাবাকে সরাসরি জানিয়ে দেবে... না।

সুব্রতকেও তার ভয় নেই আর। আর কাউকে সে ভয় পায় না।

"কিছু বলছিস না যে?"

তীর্ণা হাসল একটু, "স্ট্যাটিসটিক্স তো অনেক শিখিয়েছিস আমাকে। আরও শেখাবিও। কিন্তু এই বিদ্যেটাও এবারে শিখতে হবে তোর কাছে। শেখাবি না? তাহলে তোর সঙ্গে কোলাবোরেশনে একটা ভেঞ্চার..."

"ধুত! 'দ্য তীর্ণা সেন' মূর্তি বানাচ্ছে... হে হে..."

"হোয়াই নট? পারব না ভাবছিস? আমি ইচ্ছে করলে..."

"কিচ্ছু পারিস না! ফুঃ!"

"কী বললি শয়তান? আমি ইচ্ছে করলে কী পারি না পারি দেখবি?"

রুদ্র কিছু একটা জবাব দিতে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই দুটো কোমল হাত তাকে জড়িয়ে ধরে বজ্র আকর্ষণে নিজের শরীরে মিশিয়ে নিল। দুটো ঠোঁট এসে তখন সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল তার শব্দহীন ঠোঁটে।

কুমারীটির মুখের আদলে গড়া একরাশ অপরূপ মুখের ভেতর থেকে মৃন্ময়ী ঈশ্বরীর দল সেই ছবিটির সাক্ষী থাকছিলেন।



চুয়া-চন্দন

ধর্মঘট

"কোন স্টেশন এল বলুন তো!"

গলাটা পেয়ে ওপরদিকে একবার দেখে নিল সমরেশ। সেখানে পর্দার আড়াল ঘুচেছে। সদ্য জ্বলে ওঠা রিডিং ল্যাম্পের আলোয় কম্বলের ফাঁক দিয়ে ঘুমজড়ানো দুটো চোখ।

জানালার বাইরে বৃষ্টিভেজা দিন। ময়লা রঙের আলো। সকাল না সন্ধে টের পাওয়া যায় না। দুটো মাত্র প্ল্যাটফর্মের নির্জন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি। নেহাতই তুচ্ছ স্টেশন। গুয়াহাটি থেকে কলকাতা যাতায়াত করা এই এক্সপ্রেস ট্রেনের এমন কুলশীলহীন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়বার কথা নয়।

এইবার উঠে বসল সমরেশ। তারপর ঘুম-ঘুম চোখে খানিক দূরে প্ল্যাটফর্মের শেড-এর খুঁটির গায়ে আটকানো হলদে টিনের চাকতিটার দিকে একনজর তাকিয়ে অবিশ্বাসের গলায় বলল, "শ্রীরামপুর! তার মানে?"

"অসম্ভব। কুড়ি ঘণ্টা একটানা ঘুম..." বলতে বলতেই কম্বলধারিণী উঠে বসেছেন এবারে। হালকা বাসন্তী রঙের শাড়িজড়ানো দুটো পা সেকেন্ড এসির ওপরের বার্থ থেকে সমরেশের সামনের বাতাসে খানিক আত্মবিশ্বাসহীনভাবে দুলছিল।

সমরেশেরও একটু অবাক লাগছিল। গুয়াহাটি থেকে ট্রেনে ওঠবার পর সে-ও বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারেনি আগের দিন। এই আউট-স্টেশন অ্যাসাইনমেন্টগুলোয় টাকা ভালো পাওয়া যায়, কিন্তু একইসঙ্গে একাধিক ক্লায়েন্টের আগ্রাসী দাবি... তার মতো পেশাদারেরও শরীরে ক্লান্তি আনে। ফলে সঙ্গে আনা

একটা বইতে চোখ বোলাবার খানিক চেষ্টা করে শেষমেশ সে-ও তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাই বলে এত লম্বা ঘুম...

আর ঠিক তক্ষুনি স্টেশানের ইংরিজি নামটার তলায় বাংলা হরফে নামটার দিকে চোখ গেল তার। 'র' দুটোর পেট কাটা। তলায় পুঁটুলি নেই।

ভদ্রমহিলা ততক্ষণে নেমে এসে তার মুখোমুখি সিটটায় জানালার ধারে এসে বসেছেন। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, বানানের বৈশিষ্ট্যটা তাঁরও চোখ এড়ায়নি। নিজের মনেই বিড়বিড় করছিলেন, "অ। এই শ্রীরামপুর! এখনও আসাম ছাড়াল না! দমদমের ফ্লাইটটা..."

বলতে বলতেই হাতের ফোনটা তাড়াতাড়ি বের করে এনেছিলেন ভদ্রমহিলা। তারপর তার পর্দার দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বললেন, "টাওয়ার নেই। এখন খবরটা ওখানে..."

বলতে বলতেই সমরেশের হাতের ফোনটার দিকে উৎসুক চোখ পড়েছিল তাঁর। দেখে সে একগাল হেসে বলল, "একই দশা।"

অবশ্য সমরেশের চিন্তার কোনো কারণ নেই। তিনদিনের আউটস্টেশন কল ছিল। ভালো ক্লায়েন্ট। পরিশ্রম গেছে খুব তা ঠিক, কিন্তু কাল গুয়াহাটি ছাড়বার ঘণ্টখানেকের ভেতর অ্যাকাউন্টে রেমুনারেশনও ঢুকে গেছে। ফিরে গিয়ে আজকের রাত আর কালকের গোটা দিনটা তার একান্ত নিজের।

"বাইরে কোথাও যাচ্ছেন?"

নিতান্তই নিরীহ প্রশ্ন। কনভার্সেশন স্টার্টার। তার পেশায় এই প্রাথমিক আইস ব্রেকিং সেশনগুলো খুব ভালো করে শিখতে হয়। ক্লায়েন্টের জড়তা থাকে অনেকরকম। হাজারো রিজার্ভেশন, ইনহিবিশান। আদ্যন্ত পেশাদার সংস্থায় কাজ করে সে। এসব কৌশল কাজেই গোড়াতেই তাদের শিখিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এ সম্ভবত গুয়াহাটিরই কোনো রইস পরিবারের মেয়ে। বাপ যেভাবে আহ্লাদ করে ট্রেনে এনে তুলে দিয়ে গেল! সিটে এনে বসিয়ে দিয়ে তার পরেও হাত ধরে আছে তো আছেই। সম্ভবত মেয়ে দূরে কোথাও যাচ্ছে।

আড়চোখে মেয়েটার দিঘল চোখের দিকে একনজর তাকিয়ে দেখে নিল সমরেশ। বাপের মুখের সঙ্গে মিল নেই কোনো। সম্ভবত মাতৃমুখী মেয়ে। নামটাও ভদ্রলোকের মুখেই শুনে নিয়েছে সমরেশ। চুয়া।

মেয়েটার মধ্যে জড়তা নেই বিশেষ। প্রশ্নটা শুনে একমুহূর্ত সামান্য থতোমতোই খেয়ে গিয়েছিল তারপর মুহূর্তের মধ্যে ভাবটাকে মুছে ফেলে গালে টোল ফেলে হাসল, "হ্যাঁ। আপনি কি কলকাতাতেই..."

"হ্যাঁ," সমরেশ হেসে মাথা নাড়ল।

রাতে যখন ট্রেনে এসে উঠল, মুখটা একেবারে শুকিয়ে বসে ছিল মেয়েটা। ভদ্রলোক নেমে যেতে যেন হাঁফ ছেড়ে ওপরের বাঙ্কে উঠে সটান কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। এইবারে ঘুমটুম দিয়ে উঠে বেশ তাজা হয়েছে।

"ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, পড়তে-টড়তে বাইরে কোথাও..."

একঝলক তার দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। সম্ভবত অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলবার বিষয়ে বাড়ি থেকে কিছু বলে-টলে দিয়েছে। তারপর আস্তে আস্তে দ্বিধাজড়ানো ঢং-এ মাথাটা ওপর-নীচে নাড়ল একবার।

একটু অস্বস্তি বোধ করছে মেয়েটা। সমরেশ আর কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল। জানালার বাইরে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে চা-ওয়ালা যাচ্ছে। কাচের ভেতর দিয়ে ডাকলে শুনতে পাবে না। নেমে হাত-পাগুলো একটু নাড়িয়ে নেওয়া যাক। ঘড়িতে আটটা বাজছে। এতক্ষণে নিউ কোচবিহার পৌঁছে যাবার কথা ছিল। একটু খোঁজখবরও করে নেওয়া যাবে।

প্ল্যাটফর্মে

"আসাম সাইডের লাস্ট স্টেশন এই শ্রীরামপুর, বুঝলেন! এই গাঁটটা ছাড়ালেই পনেরো মিনিট বাদে বেঙ্গলের ফার্স্ট স্টেশন জোরাই। এখানে বা ওখানে কোথাও শিডিউল স্টপ নেই অবশ্য। ফকিরাগ্রাম ছাড়বার পর একেবারে সিধে কামাখ্যাগুড়ি। এই শ্রীরামপুর পাস করবার কথা ছিল রাত বারোটা নাগাদ। কিন্তু কপাল..."

চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতেই মোটা মতো ভদ্রলোক তাঁর বেঢপ চেহারা নিয়ে খানিক হাঁসফাঁস করছিলেন। পাশের ক্যুপেতে উঠেছেন নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে। চলেছেন কলকাতায় চিকিৎসা করাতে। পথে এই বিপদ।

সমরেশ চারদিকে একনজর চোখ চালিয়ে দেখল। ভদ্রলোকের উৎকণ্ঠাটা এই মুহূর্তে আর কোনো স্পর্শই করছে না তাকে। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছে তাদের ঘিরে। তীব্র, চোখধাঁধানো অথচ বিষণ্ণ সবুজের বুকে হলদেটে প্ল্যাটফর্ম আর তার গায়ে দেয়াল তুলে দাঁড়ানো পোড়া লাল রেলগাড়ির জোরালো কন্ট্রাস্ট...

ভদ্রলোক কথা বলতে ভালোবাসেন খুব। খানিক আগেই নেমে এসে খবরাখবর সব জোগাড় করে নিয়েছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। বে-হিসেবের স্টেশনে হঠাৎ থমকে যাওয়া গাড়ি। তাকে খাতিরদারি করবার জন্য সামান্য যে কয়েকজন নাছোড় চা-পকোড়াওয়ালা উদয় হয়েছিল তারাই জানিয়েছে।

বিরক্ত মুখে মাথা নেড়ে তিনি ফের গুনগুন শুরু করলেন, "বেঙ্গলটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে দিনদিন। ল অ্যান্ড অর্ডার বলে আর কিস্যু নেই। নইলে ভাবুন একবার কেবল,

পাতি টি-গার্ডেনে ওয়ার্কাররা নর্থ বেঙ্গল স্ট্রাইক ডাকল আর তার ভয়ে এক্সপ্রেস ট্রেন অবধি রাত বারোটায় বেঙ্গল বর্ডারে এনে থামিয়ে দিতে হল! স্টেট গবমেন্ট এইটুকু প্রোটেকশানও দিতে পারে না যে অন্তত ট্রেনটা যেতে পারে! ছিল বটে এমার্জেন্সির টাইম। এতক্ষণে পেঁদিয়ে উদ্ধার করে দিত পুলিশে...”

“তা, ছাড়বে কখন, কোনো খবর পেলেন?”

“কাল দুপুর বারোটার পর। ফুল থার্টি সিক্স আওয়ার্স বন্ধ্।”

“শিওর?”

“শিওর মানে? ঘুম ভাঙতেই চা-ওলার কাছে স্ট্রাইকের খবরটা পেয়ে নেমে স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক ঘরে তালা এঁটে কোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছিলেন। বলে গেলেন, মেসেজ এসে গেছে। উনিও তাই কেটে পড়েছেন। পুরো দেড়খানা দিন ফালতু... কেন যে মরতে ফ্লাইটে না গিয়ে...”

হুমহুমে ভেজা হাওয়ার একটা ঢেউ ছুটে এল হঠাৎ। উত্তরের ভুটান পাহাড়ের অরণ্যভূমি থেকে নেমে এসে দক্ষিণের দিকে ধেয়ে যেতে যেতে মানুষটার ঘষা-ঘষা গলার শোকগাথাটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল তা সমরেশের কান থেকে।

একটা আস্ত ছুটির দিন! অথচ একলা ফ্ল্যাটে দুপুর অবধি খাটুনি পোষানো ঘুম নেই, জেগে উঠে জড়তামাখা শরীরে নেটফ্লিক্স, হুইস্কি আর সুইগির ফুডপ্যাকেট নেই। ছুটির দুপুরে শাঁসালো ক্লায়েন্টের আকস্মিক আবির্ভাবের বার্তা নিয়ে ওঝাজির ফোন কল নেই...

ভদ্রলোকের কথাবার্তা থেমে গেছে হঠাৎ। ডাইনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে স্থির হয়ে গেছেন। সমরেশ মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখল সেদিকে একবার। চুয়া নামের মেয়েটাও কখন যেন নেমে এসেছে ট্রেন থেকে। ওদিকে দাঁড়িয়ে চা-ওয়ালার থেকে চায়ের ভাঁড় তুলে নিচ্ছে হাতে। ছুটন্ত হাওয়ায় তার এলোমেলো বাসন্তী রঙের শাড়ির আধো আবডালের দিকে লোকটার অবাধ্য, লোভী, ক্লান্ত চোখদুটো ধরা...

মুচকি হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল সমরেশ। এখন আর ইনি তার অনুপস্থিতি টের পাবেন না।

শিমুলটাপু অভিযান

“শুনছেন? প্লিজ...”

লম্বা প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে এসে রেললাইন ধরে হাঁটছিল সমরেশ। তাড়া নেই কোনো। সামনেই ছোটো নদী একটা। কী নাম কে জানে! ভুটান পাহাড় থেকে এমন কতই জলধারা তো নেমে এসে বয়ে চলেছে দক্ষিণমুখো। খানিক দূরেই সঙ্কোশ

বইছে। এ সম্ভবত তাতেই গিয়ে মিশবে সামনে কোথাও।

নদীর ওপর দিয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়ে এগিয়ে গেছে রেলের লাইন। আপ আর ডাউন। দু'পাশ খোলা সরু রেলব্রিজদুটো তাকে ডাকছিল। নীচে খালের মতো সেই সরু নদী উপস্থিত পাহাড়ি জল পেয়ে বাঘিনি হয়েছে। একটু ইতস্তত করে ডাইনের সেতুটার ওপর পা বাড়িয়েছিল সমরেশ। মিটার ত্রিশেক লম্বা। ভাগ্যিস এখন কোনো ট্রেন আসবার ভয় নেই। হাওয়ার তেজ আছে বেশ। পিচ্ছিল রেলের পাটির ওপর পা পা করে এগিয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝেই সেই হাওয়ার ঝাপটায় নড়বড়ে হয়ে যায় শরীর।

রেলব্রিজের অন্যধারটায় পৌঁছে গিয়েছিল প্রায় সমরেশ। সামনেই সেতুর সীমানা দেখানো সিমেন্টের খুঁটি দুখানা লাইনের দু'পাশে। ডাকটা শুনে থেমে গিয়ে একটা খুঁটি ধরে ব্যালান্স রেখে ঘুরে তাকাল সে।

দৃশ্যটা খানিক কমিক, খানিক ভয়ের। চুয়া নামের মেয়েটা কখন যেন পিছু পিছু এসে, সম্ভবত তাকে সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে সাহস পেয়ে নিজেও পা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এবার তার মাঝখানে এসে, নীচে ছুটন্ত জল, পিছল লাইন আর হাওয়ার ধাক্কা মিলে নার্ভাস হয়েছে খানিক। হাতে ধরে রাখা ছাতাটা উলটে গেছে তার। নিরুপায় হয়ে লাইনের ওপরেই বসে পড়ে উলটোনো ছাতাটা প্রাণপণে সামলাবার চেষ্টা করতে করতেই ডাকটা দিয়েছে সে।

পায়ের কোলাপুরি চপ্পলদুটো খুলে রাখল সমরেশ। তারপর খালিপায়ে ফের সেতু বেয়ে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার সামনে হাঁটু ভেঙে খানিক নীচু হয়ে বলল, "চটিদুটো খুলে আমার হাতে দিন।"

"চটি... মানে..."

দুপাশে হাতচল্লিশেক নীচে ছুটে যাওয়া জলের ধারাটার দিকে একনজর তাকিয়ে নিল সমরেশ। তারপর কেটে কেটে বলল, "ফ্ল্যাটসোলড, দু'স্ট্র্যাপের চপ্পল। ওই পায়ে রেখে এখান দিয়ে আপনাকে পার করাতে গেলে স্লিপ করে দুজনেই মরব। কথা না বাড়িয়ে সাবধানে খুলে দিন..."

মেয়েটার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সাবধানে চটিদুটো খুলে আনল সে। কাদামাখা পাতলা চপ্পলদুখানাকে কোমরে গুঁজে নিয়ে হাতদুটো তার দিকে বাড়িয়ে ধরল সমরেশ, "আস্তে আস্তে... আমার হাতে প্রেশার দিয়ে উঠে দাঁড়ান। ঝটকা দেবেন না। আর, আমরা একসঙ্গে সোজা হব। আগেপরে হলে ঝটকা লেগে..."

***

"ছাতাটা... ধুৎ!"

"আমায় দিন দেখি..." হাত বাড়িয়ে একটু হাসল সমরেশ। তারপর তার উলটে

যাওয়া অবিন্যস্ত কাঠিগুলোকে সোজা করতে করতে বলল, "অ্যাডভেঞ্চারের শখ হয়েছিল? অচেনা একটা জায়গায় এভাবে..."

"না মানে প্ল্যাটফর্মে বোর হয়ে যাচ্ছিলাম খুব। তার ওপর ওই নিউ বঙ্গাইগাঁও বুড়ো এসে এমন আলাপ জুড়ল... হি হি... বলে..."

সমরেশও হেসে ফেলল। মেয়েটা সহজ হয়ে এসেছে। ছোটোখাটো ক্রাইসিস মানুষকে অনেক সহজ করে দেয়। "থাক। বলতে হবে না। আমি বুঝতে পারছি। আপনাকে প্ল্যাটফর্মে দেখে যে-রকম বাক্যহারা হয়ে তাকাচ্ছিল তখনই বুঝেছি। তা তাঁর হাত থেকে পার পেতে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে রেললাইন ধরে হাঁটা দিলেন সে ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে একা একা খোলা রেলব্রিজ বেয়ে রওনা হবেন?"

"আসলে আপনি আগে আগে যাচ্ছিলেন। দেখে মনে হল অসুবিধে হবে না। কিন্তু..."

"অতএব আপনিও হাঁটা দিলেন। হাওয়া দিচ্ছে খেয়াল হল না? শাড়ি, স্লিপার, খোলা ছাতা নিয়ে কেউ এভাবে ওরকম জায়গায় ওঠে? নিন। হয়ে গেছে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। একটু দাঁড়ান প্লিজ। এটাকে..."

বলতে বলতে কাঁধে ঝোলানো ছোটো পাটের ব্যাগটা থেকে একটা প্লাস্টিক বের করে এনেছে সে। ভেজা ছাতাটা তাতে জড়িয়ে নিয়ে ব্যাগে ভরতে ভরতেই সমরেশের শার্টের পেছন দিকটার দিকে চোখ যেতে ফের একটু লজ্জা পেয়ে গেল মেয়েটা, "আপনার শার্টটা চপ্পলের কাদায়..."

সমরেশেরও রাগ হচ্ছিল একটু। লন্ডনে স্বামীর কাছে পাকাপাকি শিফট করে যাবার আগে অ্যালিগরি ডিজিট্যালের মালিক শ্রীপর্ণা সেন শার্টটা উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন তাকে। পার্টিং গিফ্‌ট্‌। ভদ্রমহিলার বোধ হয় একটু টান হয়ে গিয়েছিল তার ওপরে। তাদের প্রফেশনাল দুনিয়ায় এইসব পার্সোনাল ফিলিংস বিপজ্জনক হলেও দু-একটা ক্ষেত্রে সম্পর্কগুলোকে স্বীকার করতে হয়। বিশেষ করে ভালো ক্লায়েন্ট হলে।

মুখে অবশ্য সে-সব কিছু বলল না সমরেশ। শুধু বলল, "স্টেশনে ফিরবেন তো এবারে? তাহলে বরং আসুন আপনি। আমি..."

"আ-আপনি ফিরবেন না?"

"উঁহু। এক্ষুনি নয়। মানে স্টেশনে থাকলে তো শুকিয়ে মরতে হবে সারাটা দিন। আমি ওতে নেই। একটা চান্স নিয়ে দেখব ভাবছি। যদি খাবার-দাবার কিছু জোটে। ওদিকটায় কোনো গ্রাম আছে বোধহয়।" বলতে বলতেই দিগন্তের প্রায় গা ঘেঁষে গজিয়ে ওঠা কিছু ঝোপঝাড়, গাছপালার দিকে ইশারায় দেখাল সমরেশ।

উঁচু সেতু পেরিয়ে রেলের লাইন কখন যেন ফের সমতলের কাছাকাছি নেমে এসেছে। দুপাশে নীচু ধানজমির বুক চিরে বৃষ্টিভেজা ঈষৎ উঁচু রেলের পাটি এগিয়ে

গেছে দিগন্তের দিকে।

মেয়েটা পেছন ঘুরে খানিক দূরে ছেড়ে আসা সেতুটার দিকে দেখল একঝলক। তারপর নীচুগলায় বলল, "একা একা আমি ওখানটা দিয়ে ফের ফিরতে ঠিক..."

"হুম। তাহলে চলুন আমার সঙ্গে।"

একটা সিগন্যাল পোস্টের কাছে এসে পৌঁছেছে তখন তারা। কথাগুলো বলতে বলতেই সমরেশ রেললাইনের পাশের ঢালু জমি বেয়ে নীচে ছড়িয়ে থাকা ধানজমির দিকে নেমে গিয়েছিল। এবার সেখান থেকেই উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার দিকে মুখ তুলে সে ইশারায় তাকে ডাকল।

কাদাভরা খাড়াই ঢালটার দিকে বিপন্নমুখে একনজর তাকিয়ে দেখল সে, তারপর বলল, "একটু হেল্প লাগবে..."

***

জমির ফাঁকে ফাঁকে আল। এখানকার চাষিরা অধিকাংশই প্রান্তিক কৃষক। অজস্র ছোটো ছোটো টুকরোয় ভাঙা জমিদের সীমানা নির্দেশক আলগুলো এলোমেলো জালের মতোই ছেয়ে রয়েছে গোটা কৃষিক্ষেত্রটাকে। আলবাঁধা জমিদের ভেতরে জমে ওঠা বর্ষার জলের বুকে সদ্যারোপিত ধানের চারাদের মাথাগুলো দেখা যায় কেবল।

পায়ের সামনে, দুপাশের জল থেকে ইঞ্চিখানেক উঁচু হয়ে থাকা একটা আলের ওপর পা দিয়ে একটু পরখ করে নিল সমরেশ। নরম। পা দেবে যায়। এখান দিয়ে একে নিয়ে...

"নিন চলুন। ডিসট্যান্স যা মনে হচ্ছে, কিলোমিটার খানেক হবে। গিয়েই দেখা যাক। অ্যাডভেঞ্চার হবে একটা..."

গলার শব্দটা পেয়ে একটু অবাক হয়েই ঘুরে দেখল সমরেশ। হঠাৎ করেই একটু বদলে গেছে মেয়েটা। গলার আওয়াজে খানিক আগের জড়তাটুকু উধাও। শাড়িটাকে গাছকোমর করে নিয়েছে। কাঁধের পাটের ব্যাগের অনিঃশেষ ভাঁড়ার থেকে আর একখানা প্লাস্টিক বের করে এনে চটি দু'খানা তাতে ভরে ব্যাগের ভেতর চালান করে দিয়ে সে খালি পায়ে পুরোদস্তুর তৈরি।

"ভেবে দেখুন। অনেকটা যেতে হবে। একবারও ব্যালেন্স হারালে..."

"হয়ে যাবে," আপনি উঠে যান আগে... আমি পেছনে আছি। ব্রিজে উঠে হঠাৎ একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। এখন আর সমস্যা নেই।"

তার পায়ের দিকে একনজর তাকিয়ে জুতোদুটো খুলে হাতে নিল সমরেশ।

***

"আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয়নি।"

যেন একটা সবুজ সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে অনন্ত রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছিল তারা। দূরের ঝোপঝাড়গুলো এইবার খানিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি বাড়ির আভাস চোখে পড়ে। দু'পাশের খেতগুলোতে জলে আধডোবা সদ্যরোপিত ধানের চারারা মাথা দোলায়। বীজতলা থেকে খেতে রোপনের কাজ শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। মাঝেমধ্যে এখনও কাছে দূরে দু-একটা ক্ষেতে টোকা মাথায় মানুষের দেখা মেলে। নারীপুরুষ দুই-ই। জলে হাঁটু অবধি ডুবে উবু হয়ে দাঁড়িয়ে নিপুণ আঙুলে গুঁজে দিচ্ছে বীজতলা থেকে তুলে আনা ধানশিশুদের। তাদের ঘিরে আদিগন্ত সবুজ আর ইস্পাতনীল মৌসুমী মেঘের বসত।

এমন বাদুলে দিনে আলপথ বেয়ে চলা দুই ভিনদেশি আগন্তুক মাঝে মাঝে তাদের কারও কারও চোখ টেনে ধরে। ভেজা, ভারী বাতাসে এক টুকরো হাসি, প্রাকৃত ভাষার দু'একটি শব্দও ভেসে আসে... কেউ একজন সামনে কোনোখান থেকে চিৎকার করে কাউকে কিছু বলল দু-একবার... তারপর ফের সব কিছু নিঝুম।

"ইয়ে... শুনছেন? আপনার নামটা..."

সমরেশ মাথা নাড়ল, "সরি, একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি চন্দন সেন। তবে... আপনার নামটা কিন্তু আমি জানি।"

"আপনি আমার বিষয়ে..."

মেয়েটার গলায় একটা আচমকা উৎকণ্ঠা চাপা থাকছিল না।

সমরেশ হাসল, "আরে না না। কাল আপনার বাবা... বাবাই তো! তিনি আপনাকে চুয়া বলে ডাকছিলেন। সেইটাই শুনে ফেলেছিলাম..."

"ওহো! এই ব্যাপার!" খানিক আগের উৎকণ্ঠা মুহূর্তে গায়েব চুয়ার গলা থেকে। সেখানে এখন পরিহাস-তরল টুংটাং, "আমি তো দেখলাম একদম মাথা ঝুঁকিয়ে অনিতা দেশাইতে মজে আছেন। কোনোদিকে নজর নেই। কানটা যে এদিকে খাড়া ছিল..."

সমরেশ হাসল, "নেহাতই অটোমেটিক রি-অ্যাকশান। মানে একজন অ্যাট্রাকটিভ মহিলা উঠে এসে সামনে বসেছেন, চোখ-কানগুলো তখন নিজে নিজেই একটু চৌকশ হয়ে যায়। তা ছাড়া সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, আপনি তো আমার বইয়ের নামটা অবধি... আরে... এই রে!"

"কী হল?" কথাটা বলতে বলতেই চুয়ারও নজর গেছে সামনের দিকে। সেখানে হঠাৎ করেই পায়ের নীচে খানিক সামনে আলের একটা টুকরো উধাও। হাতদুয়েক জায়গা জুড়ে কাটা আলের ফাঁক দিয়ে কলকল করে জল বয়ে চলেছে ওপাশের খেত থেকে এপাশে।

ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল চুয়া। দূরের রেলব্রিজটা চোখে পড়ে না আর। ঘন বৃষ্টির একটা পশলা সফেদ চাদরের মতো তাকে আড়াল করেছে। সেদিক থেকে উড়ে আসা জোলো হাওয়া বুঝিয়ে দিচ্ছিল ক্রমশ এদিকেই এগিয়ে আসছে বৃষ্টির পর্দা।

জলের ধাক্কায় তাদের পায়ের সামনেই কাটা আলের নরম দেয়াল থেকে ছোটোবড়ো কাদার ড্যালা ঝপঝপ করে খসে পড়ছিল খুদে স্রোতটার বুকে।

"কী করা যায় এবারে? এখান দিয়ে জলে নামতে গেলে... আ... আমি..."

ছুটন্ত নালাটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখছিল সমরেশ। ফুটতিনেক চওড়া। নিজে হয়তো সে লাফিয়ে পেরোতে পারবে। কিন্তু এই শ্রীমতী...

নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিল তার। কী দরকার ছিল একে সঙ্গে করে নিয়ে আসবার!

তবে ভেবে লাভ নেই। যা করবার তা করতেই হবে এখন। প্যান্টের পা হাঁটু অবধি গুটিয়ে নিয়ে তৈরি হল সমরেশ। তারপর সাবধানে পাশের খেতের জলের মধ্যে নেমে এল। থকথকে কাদায় পায়ের ডিম অবধি জড়িয়ে ধরেছে তার। এবারে হাতটা বাড়িয়ে ধরে সে বলল, "বসে পড়ুন। তারপর সাবধানে মাঝখানের জলে নেমে আসুন। আমি ধরে আছি..."

"আরে আরে, করেন কী দাদাবাবু! বউঠানের এমন বাসন্তী কাপড়, কাদায় মাখলে শেষে গঞ্জনার শেষ রাখবে? ছি ছি... সরেন! সরেন দেখি আপনি... শহরের বুদ্ধিতে হয় নাকি এসব? আপনি দাঁড়ায়ে থাকেন গো বউদি।"

এহেন চিলচিৎকার করতে করতে খেতের মধ্যে থেকে যে মূর্তিটি হঠাৎ সমরেশের পাশে এসে উদয় হয়েছে, তাকে রাতবিরেতে নজরে পড়লে ভয় পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। বাঁশের চাঁচড়ি দিয়ে বোনা টোকার নীচে পীতাভ কাদায় মাখামাখি শরীর। পরনের কৌপিনটি পর্যন্ত সেই রঙে রেঙে উঠে শরীরের সঙ্গে মিশে গেছে যেন একেবারে। হাতে একটি লম্বা পাকা বাঁশ।

কথাগুলো তার শেষ হবার আগেই জলের ওপর জেগে ওঠা চড়বড় শব্দ বুঝিয়ে দিল উত্তর থেকে ধেয়ে আসা বৃষ্টি এইবার অভিযাত্রীদের নাগাল ধরে ফেলেছে। তীব্র হাওয়ার ঝাপটা সেই বৃষ্টিধারাকে একটা অস্বচ্ছ চাদরের মতোই ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের ওপর দিয়ে।

চুয়া ব্যাগ থেকে ছাতাটা বের করে খোলবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে ফের সেটা ব্যাগেই ঢুকিয়ে দিয়ে হতাশ গলায় বলল, "এই হাওয়ায়..."

কাদামাখা ছোকরার প্রায় অদৃশ্য ঠোঁটদুটির আড়াল থেকে এইবার ঝকঝকে দাঁতের পাটি বেরিয়ে এল, "গাঁ-গঞ্জের ঝড়জল আপনাদের ওই শহরের ছাতায় বাগ

মানে নাকি, হাঁগো বউদিমণি? এই নাও। এইটে মাথায় দাও দিকি। সুতুলি দিয়ে থুতনির সঙ্গে বেঁধে দিলে হাওয়া-বাতাসের সাধ্যি কী..."

বলতে বলতে মাথার টোকাটি খুলে এনে সে চুয়ার মাথায় সেটি বসিয়ে দিয়ে ঠিকঠাক করে দিতে দিতেই ফের গজগজায়, "সবে আলটুক কেটিছি, তা দূর থেকে দেখি জোড়ে মিলে কাটা আলের দিকেই আসে। কত চেল্লালাম, বললাম, বাঁয়ে ঘুরে প্রকাশের আল দিয়ে পার হও, তা শুনতেই পেল না। শেষে খেতের মধ্যি এই বাঁশ পড়েছিল সেই খুঁজে নিয়ে জল ভেঙে ধেয়ে আসি। এখন দাঁড়াও। পার করার বন্দুবস্ত করি বউদিমণিরে..."

বলতে বলতেই হাতের বাঁশটিকে সে কাটা আলের এপার-ওপার আড়াআড়ি বিছিয়ে দিয়ে বলে, "এই তো দিব্যি বিরিজ হয়ে গেল। এখন লাও গো দা'বাবু, বউদিমণির হাতখান ধরো দেখি এপাশ থিকে। আমি ওপাশ থিকে ধরছি। ভয় নাই গো। পায়ে পায়ে পাড় হয়ে যাও। আমরা দুই জোয়ান তো রইলাম দুদিক বাগে।"

***

"তা নিজের খেতের আল নিজেই কেটে দিলা কেন হে সুবল।"

পথচলতি প্রশ্ন সমরেশের। চুয়াকে খাল পাড় করিয়ে দেবার পর তাদের এহেন অভিযানের কারণটা শুনে ছেলেটাও নিজের কাজকর্ম ফেলে এবার সঙ্গ ধরেছে তাদের। অতিথ মানুষ পথেঘাটে বেঘোরে পড়ে দুটি খাবারের খোঁজে তার গ্রামে আসবে আর সে তাদের রাস্তায় ছেড়ে দেবে সে কী হয়!

জিজ্ঞাসা করতে হয়নি। ইতিমধ্যে নিজে থেকেই সে নিজের নামটি জানিয়ে দিয়েছে তাদের। নাম, ধাম, ঘরে তিনমাসের পোয়াতি নতুন বউ... খবর দেবার বিরতি নেই তার। তাদের দুজনের নামদুটিও আদায় করে নিয়েছে সে এরই মধ্যে। চুয়া আর চন্দন নাম শুনে বলে, "আহা হা রাজযোটক। সাক্ষাত ভগমান আগে থিকেই জুটি বেঁধে দিয়েছিল গো। নইলে নামে এমন জুড়ি কী আর এমনি হয়!"

চুয়া এবং সমরেশ দুজনেই বেশ কয়েকবার তার ভুলটা ভাঙাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে-সব কথা তাদের সুবলের যুক্তির তোড়ে অসম্পূর্ণই থেকে গিয়েছে। নিতান্ত গাঁওয়ার সে নয়। আলিপুরদুয়ার টাউনে যাতায়াত আছে তার। অতএব শহরের বউ-ঝিরা হরবখতই যে সিঁথায় সিন্দুর পরে না আজকাল তা তার জানা এবং সোয়ামী-ইস্তিরি না হলে কেউ একত্তর টেরেনে চেপে ঘুরতে যায় না, কিংবা মাঠেদিগরে এমন হাত ধরাধরি করে যে বের হতে পারে না এ-বিশ্বাস তার অত্যন্ত দৃঢ়।

ভুলটা ভাঙাবার খানিক চেষ্টা করে অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়েছে তারা দুজনেই।

একটা দিনের মামলা। যা খুশি হয় ভাবুক গে। একে বোঝানো তাদের কর্ম নয়। তা ছাড়া গ্রামগঞ্জের ব্যাপার। ওসব নিয়ে বেশি নাড়াঘাঁটা করতে গেলে শেষে অন্য বিপদও হতে পারে।

"সে কী আর এমনি এমনি কেটিছি? ভগবানের দয়ায় আপনাদের এই সুবলের মাথায় জজিয়তি বুদ্ধি যে..." বলতে বলতে নিজের বুদ্ধির গর্বে একটু হেসে নিল সুবল। তারপর পশ্চিমে বয়ে চলা নদীর স্রোতটির দিকে ইঙ্গিত করে বলে "ওই যে দেখেন শিমুলটাপু নদী, পাশের নন্দর খেত ওর গা ঘেঁষে গেছে তো! কাল রাতের বিষ্টিতে শিমুলটাপুর জল এসে ঢুকেছে ওর জমিতে। সোঁতা জলে এখন মাছের ডিম ছাড়বার টাইম। জলও ঢুকেছে, ডিমও ঢুকেছে। এ জমি নাবাল বিলের জমি। জল টিকবে অনেকদিন। তাইতে ডিম ফুটে মাছ খেলবে। তারপর আশ্বিনে জলে টান ধরলে ওপরে পাকা ধান, নীচে খলবলে মাছ। তাই ফাঁকায় ফাঁকায় এসে খাল করে দে গেলাম। ঘুমাক আরও বেটা মেনামুখা বউয়ের আঁচল ধরে ভরদুপ্পুরে। ওর ডিমভরা জল আমার খেতে ঢুকুক এসে..."

কথাগুলো শুনে হাজার বিরক্তির মধ্যেও কুলকুল করে হেসে উঠেছিল চুয়া। সুবল অমনি দাঁত বের করে বলে, "তবেই বলো বউদিদি, সোবলা ঘটে কেমন বুদ্ধি ধরে। আর শৈলী পোড়ারমুখী বলে কিনা..."

কথায় কথায় রাস্তা শেষ হয়ে এসেছিল। খেতের আলপথ এবারে গ্রামের কর্দমাক্ত চওড়া পথে এসে মিশেছে। খানিক আগের বৃষ্টিও থেমে গেছে। সেখানে উঠে এসে সুবল বলে, "আর ভয় নাই। এবার আস্তেব্যস্তে আস তোমরা। আমি বাড়ি গিয়ে শৈলীকে খবর দি। এই পথ ধরে সিধে এগিয়ে কবন্ধের মাঠ পাবা। তার ডাইনে শিমুলটাপুর গায়ে দেখবা ঘোড়ানিমের গাছ। ওর পাশে আমার বাড়ি। এ-গাঁয়েরও ওই নদীর নামেই নাম। শিমুলটাপু। আমি আগাই গো..."

বলতে বলতেই বড়ো বড়ো পায়ে সুবল এগিয়ে গিয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্কভাবে সমরেশ বলল, "চমৎকার আছে কিন্তু। কোনো প্যারাফার্নেলিয়া নেই। খাটো, খাও, ঘর বসাও, ছেলেপিলে..."

"চন্দনবাবু?"

ডাকটা দ্বিতীয়বার কানে আসতে সচেতন হল সমরেশ, "কিছু বলছেন?"

"হ্যাঁ। এবারে হাতটা ছেড়ে দিলে হয় না?"

চুয়ার নরম গলার ভেতরে কোথাও সামান্য তীক্ষ্ণতা ও কৌতুকের মিশেল ছিল। সমরেশ তাড়াতাড়ি তার বাহুমূল থেকে নিজের মুঠোটা সরিয়ে নিল, "সরি। খেয়াল ছিল না।"

"আরে না না ইটস অলরাইট। ধরে ধরে এতটা রিস্কি রাস্তা পার করে নিয়ে এলেন..."

সমরেশ কোনো জবাব দিল না। আগে আগে চলেছে সে। পেছন পেছন চুয়া। ন্যাচারাল অর্ডার! হাঃ। দীর্ঘকালের লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক কন্ডিশনিং। সামনে পুরুষ, তার আড়ালে নারী।

চন্দন... চন্দন... নিজের নামটাকে বেশ কয়েকবার মুখের ভেতর নাড়িয়েচাড়িয়ে দেখে নিল সে। চুয়া-চন্দন। চুয়ার কাছে আলটপকা নিজের নাম বানিয়ে বলতে গিয়ে ওইজন্যই কি এই চন্দন শব্দটা মাথায় এসে গিয়েছিল তার! কথাটা মনে হতে একটুকরো হাসি ফুটল তার মুখে। যেন কোনো দুষ্টু কিশোরের ফুরফুরে বজ্জাতির সাক্ষী হয়েছে এই রুক্ষ পুরুষ।

চন্দন সমরেশ নয়। হয়তো স্বল্পজীবী। কিন্তু ভারহীন। সমরেশের প্রফেশনাল জীবনের ক্লিনিক্যাল পেশাদারিত্বের দায় নেই তার।

তার হৃদয়টাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা কর্কশ, বিষাক্ত সুতোগুলো কোথাও যেন আলগা হয়ে চলেছিল সমরেশের ভেতরে। হয়তো ক্ষণস্থায়ী। তবু, এই জাদুবাস্তবের দুপুরে শিমুলটাপুর গহনে সমরেশের বদলে, চন্দনই না-হয় জেগে থাক চুয়ার কাছে। মেয়েটা বড়ো নিষ্পাপ।

***

"আকাশের মাথা গেছে গো দিদি, হি হি। কখন কাঁদে কখন হাসে ঠিক নাই।"

ফের মুখে আঁচল উঠেছে তার। শৈলমণির দিকে তাকিয়ে চুয়ার মুখেও হাসি ফুটে উঠল একচিলতে। এ-মেয়ের কাছে এসে মুখ গোমড়া করে থাকা দায়। কথার ফুলঝুরি একটি। নতুন স্বামী, নতুন সংসার এবং শরীরে নতুন অতিথি, সবমিলিয়ে যেন সে সব পেয়েছির দেশটির ঠিকানা পেয়ে গেছে নগরসভ্যতার এই সুদূর পশ্চাৎভূমিতে বসে।

কবন্ধের মাঠের মাঝামাঝি আসতে আসতেই বৃষ্টি উধাও হয়েছিল। এখন মেঘ সরে গেছে পশ্চিমে বেশ অনেকখানি দূরে। তার নীলাভ সাদা গায়ে জলে ধোয়া সূর্যের আলো ঠিকরোয়। আবছা রামধনু উঠেছে সেখানে। হাতের কাজ সারতে সারতে সেইদিকে চোখ তুলে দেখতে দেখতেই এহেন মন্তব্য তার।

পুরুষরা বাড়ি নেই এই মুহূর্তে। অতএব শৈল গায়ের কাপড়ে খানিক ঢিলেঢালা হয়ে স্বস্তিতে। তবে করিতকর্মা মেয়ে সে। অতিথরা বাড়িতে পা দিয়ে উঁচু দাওয়ায় শীতলপাটির দুটি আসন পেয়েছিল। তারপর ঘটিতে জল আর রেকাবিতে করে পানসুপুরি। ঘরে মিষ্টি কিছু নেই। কাজেই দু'ড্যালা করে এখো গুড়ও ওমনি দিয়েছিল। মাথায় খানিক লম্বা ঘোমটাটি তার তখনও টানা।

অতিথদের জলপান দিয়ে বসিয়ে সুবলের ডাক পড়েছিল ঘরে। সেখানে স্বামী-স্ত্রীতে ভারি গোপন খানিক ফিসফিসের শেষে সুবল বেরিয়ে এসেছিল ছোটো একটি

হাতজাল নিয়ে। অতিথি সৎকারের আয়োজন দেখতে তাকে যেতে হবে শিমুলটাপুতে।

অতএব সমরেশও তার সঙ্গ ধরেছে। ইতিমধ্যেই ভেজা কাদামাখা পোশাক ছেড়ে তার গায়ে উঠেছে সুবলের একটি খাটো ধুতি আর ফতুয়া।

তারা চলে যেতে একটি ব্যস্ত মৌমাছির মতোই তার সাম্রাজ্যের কোণে কোণে যেন উড়ে বেড়ায় শৈল নামের সেই যুবতি। বাড়ির এক ভিটেতে তাদের থাকবার দুটি ঘর আর দ্বিতীয় একটি ভিটেতে রান্নাশাল। নাকি বারান্দার একটি কোণে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেত সুবল। বউভাতের পরদিন সকালে সেই গর্ত-উনুন আর পোড়া, ভাঙাচোরা মেটে বাসন দেখবার স্মৃতিটি মনে করে কুলকুল করে হাসিতে ভেঙে পড়ে সে। অতএব এর পর তার হুকুমে, স্বামী তার নিজের হাতে এই রান্নাশাল গড়ে দিয়েছে তাকে। শোবার ঘরও একটির জায়গায় দুটি হয়েছে বেড়ে।

"করিয়ে নিতে জানলে ও মিনসে কাজ ভালোই করে বুঝলে? সব ব্যাটাছেলেই ওইরকম। শোনো বলি তোমায় বউদি, সমাজে দশজনের সামনে মাথা নীচু করে রইবে সে ঠিক, কিন্তু একলা পেলে একদম মিঠে কথা কইবে না এদের। একটু শক্ত হলেই দেখবে, পিছু পিছু ঘুরবে, সুরসুর করে যা কইবে সব করে দেবে..."

কথার সেই স্রোত যেন একটি বহতা নদীর ধারার মতোই চুয়াকে ঘিরে পাক খায়। একটি ডিস্টোপিক গ্রহের দৈত্যাকার এক শহরের গর্ভে তার বসবাস। পেশাসূত্রে তার নানান শহরে সে-গ্রহের নাগরিকদের সঙ্গে প্রেমহীন, অর্থহীন, অর্থকরী দেয়া-নেয়ার বেসাতি চলে তার অবিশ্রাম। তেমনই এক বেসাতি থেকে আর এক বেসাতির দিকে এগিয়ে যাবার মাঝখানে দৈব তাকে এই সমান্তরাল দুনিয়ায় এনে ফেলেছে। এখানকার প্রতিটি দৃশ্য, শব্দ ও চরিত্রকেই তার অপরিচিত ঠেকে। অপরিচিত, হাস্যকর... কাম্য অথচ অপ্রাপণীয়...

এরই মধ্যে ভেজা ও কাদামাখা পোশাকগুলো ধুয়ে উঠোনে বাঁধা নারকেলের দড়িতে মেলে দিয়েছে শৈল। তার পর রান্নাঘরের বাতা থেকে একবোঝা শুকনো কাঠকুটো বের করে এনে দা চালিয়ে তাদের টুকরো করে নিয়ে মেটে হাঁড়িতে চালে-জলে চাপিয়ে দিয়েছে। চাল, ডাল, খানিক নুনতেল, এর বাইরে বাজারের প্রয়োজন পড়ে না তার। বাকি সব কিছুই প্রকৃতি অঢেল দিয়েছেন তার বাড়িটিকে ঘিরে। লম্বা একটা লগা হাতে নিয়ে সে পেড়ে এনেছে দুটি কাঁচা পেঁপে। পেঁপের ঝোল হবে আজ। সেজন্য কৌটো থেকে বের হয়েছে সযত্নে রক্ষিত বড়ি। ঘরের পেছনের জঙ্গল থেকে ছিঁড়ে আনা ঢেঁকিশাক কুচোতে কুচোতে নিজের মনেই বিড়বিড় করে সে, "পাকা তেঁতুল ঘরে আছে। দুটি চুনোও যদি ওমনি মিনসের জালে ওঠে তো তেঁতুল দিয়ে টক বানাই। শেষপাতে খানিক অম্বল..."

কথাগুলো বলতে বলতেই কোনো অশ্রুত শব্দ শুনে মাথা তুলে বাইরের দিকে দেখল

সে। সেখানে বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে শিমুলটাপুর ঢাল থেকে দুটি মাথা দেখা দিয়েছে।

"এর মধ্যে এসে গেল যে। ও মা! কী লজ্জা, বলে অন্তর্বাসহীন শরীরে খাটো শাড়ির আঁচলটি টানতে টানতেই উঠে দাঁড়াল শৈল, "দিদি তুমি ভাতের হাঁড়িটার দিকে চোখ রাখো একটুখানি। আমি ঘরে ঢুকে ভেতরে একখানা ম্যাক্সি চরিয়েই বেরিয়ে আসচি। মরণ! এই পচা ভ্যাদভেদে গরমে এখন সর্বক্ষণ ওই বস্তা গায়ে পরে... কেন যে দুনিয়ায় পুরুষমানুষের জম্মো দিল ভগবান..."

***

"ভালো মাছ পেইছি রে শৈলী এই দ্যাখ্। খলসে, ভ্যাদা, বাতাসি... দাদা আমার পয়মন্ত মানুষ। দো-তিন খ্যাপেই..." বলতে বলতে রান্নাশালের দিকে এগিয়ে মাছটা নামিয়ে রাখতে গিয়েই একটু থতোমতো খেয়ে গেল সুবল। উনুনের পাশে বসে থাকা মানুষটি ঘুরে তাকিয়েছে তার দিকে।

"ওমা। এ যে বউদিদি গো। লালপেড়ে কোরা শাড়ি পরে উনোনের ধারে বসে ভাতে কাটি দিচ্ছে আর আমি ভাবলাম বুঝি..." বলতে বলতেই ভাতের উথলে ওঠা হাঁড়িটির দিকে চোখ পড়তে, পুরুষটি হাঁউমাউ করে ওঠে, "শৈলী... তুই বউদির হাতে কাটি ধরিয়ে... দেখো দিকি কাণ্ড! শহুর বাজারের মানুষ। গেসের উনোনে পেশারে রান্নাবাড়া, তাকে দিয়েছে ধুমধুমে কাঠের উনুনে ভাত রান্নার কাজ। ফ্যান উথলে যদি গায়েপায়ে... দেখি দেখি বউঠান, সরে আসেন... সরে আসেন। আমি দেখছি। এই শৈলী..."

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাশের শোয়ার ঘরের ভিটে থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে শৈল। দুপ দুপ করে হেঁটে আসতে আসতেই মুখে যেন তুবড়ি ফুটছিল তার, "গেলে তুমি ওখান থেকে? আঁশ হাতে আমার হেঁশেল ধরতে এসেছ, বলি গেরস্তবাড়ির কিছুই ধম্মোকম্মো শেখায়নি নাকি ছোটোবেলা, অ্যাঁ? জলে হাঁস আর হেঁশেলে মেয়েমানুষ। ও কাউকে শেখাতে হয়? সরো সরো... যাও নীচে গিয়ে দাদাকে নিয়ে সুস্থির হয়ে বোসো। তামাক খাবে তো কড়ি থেকে হুঁকো নামিয়ে আনোগে আমি আগুন দিচ্ছি।"

বলতে বলতেই বালকহেন পুরুষটিকে কঠোরে কোমলে নিরস্ত করে চুয়ার পাশে এসে বসেছে শৈল। তারপর গরম হাঁড়িটির কানায় তার হাত ছোঁয়াবার ব্যর্থ চেষ্টা দেখে খানিক হাসি চেপে বলে, "ছাড়ো বউদিদি। কলম ধরা হাত..."

মুখটা ঘুরিয়ে চন্দনের দিকে একনজর দেখল চুয়া। আগুনের তাতে লাল হয়ে ওঠা মুখটি লালপাড় কোরা শাড়ির বেষ্টনীতে মানিয়েছে ভালো। চন্দনের চোখে একটা চাপা বিস্ময়ের ছোঁয়া ছিল। সম্ভবত এ-মেয়েকে এই চেহারায় সে আশা করেনি এ-মুহূর্তে।

উঠে উনুনের ধার ছেড়ে আসতে আসতেই সেদিকে নজর পড়তে একটু লজ্জা পেয়ে গেল যেন চুয়া। মাথা নেড়ে বলে, শাড়িটা একেবারে ভিজে গিয়েছিল...”

দাওয়া ছেড়ে উঠনে নেমে যেতে যেতেই সুবল মাথা নাড়ল, “এখন তামাক নিয়ে বসব না আর। হাতে খানিক ত্যাল দে তো বউ। দাদারেও দিস। নদী দেখে দাদার নাইবার শখ গেছে।”

কথাটা শুনে সামনের দিকে চোখ চলে গিয়েছিল চুয়ার। বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে খানিক দূরে দাঁড়ানো ঘোড়ানিম গাছটার পাতায় ভেজা হাওয়ায় শনশন শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছে। আকাশে মেঘ ঢলে এসেছে ফের খানিক। মেঘধোয়া ঈষৎ অনুজ্জ্বল আলোয় হাওয়ার ধাক্কায় ঢেউ তুলে বইতে থাকা নদীটিকে বড়ো মোহময় লাগে তার চোখে। দাওয়ার নীচে চন্দন তার পিরান খুলে ফেলেছে। হেঁটো ধুতিটি এখন কাছাবন্দি। তার বলিষ্ঠ পেশল শরীরের দিকে অজান্তেই চোখ চলে যেতে লজ্জা পেয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিল চুয়া...

তেল ঢেলে দিচ্ছিল শৈল দুজনের হাতেই। ঢেলে দেয় আর বলে, “গায়েও খানিক দিয়ে যাও দুজনে। প্রথম বর্ষার কাঁচা জল। শেষে জার না ধরে।” বলতে বলতেই চুয়ার দিকে চোখ পড়তে মুচকি হেসে বলে, “তা তুমিও তোমার ওনার সঙ্গে যাও না কেন দিদি। সাঁতার না জানলেও হয়। শিমুলটাপু আমাদের বড়ো ভালো নদী। দেখতেই অমন খেপি। আসলে কোমরের বেশি জল ওঠে না।”

“তুমি?”

“আমি? সে দিন কী আর আছে? আগে যেতাম। তোমার এই দেওরের সঙ্গে। এখন কী আর সে জো আছে? এই শত্তুর এসে...”

বলতে বলতেই সদ্য গর্ভলক্ষণ ফুটে উঠতে শুরু করা পেটের ওপর বড়ো মায়ায় হাত বুলিয়ে নিল সে একবার, “শিমুলটাপুতে নাইতে যেতে চাইলে এখন মিনসে মারতে ওঠে।”

“নয়তো কী সোহাগ করব?” সুবলও চিড়বিড় করে উঠেছে কথাটা শুনে, “এই অবস্থায় মেয়েমানষের শরীরের কী দশা হয় সে আমি জানি না ভেবেছিস? ধিঙ্গিপনা করে নদীতে ঝাঁপাই করতে গিয়ে তারপর কিছুমিছু যদি...”

তার কথাটি শেষ করতে না দিয়েই খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ে তার সঙ্গিনী, “ও মা গো! সাতবার গব্‌ভো ধরা পুরুষমানুষ তুমি সে দশাও জানো? হি হি হি...”

সংক্রামক হাসিটা চুয়ার মুখেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করল সে। মানুষদুটির মধ্যেকার এই ভালোবাসার খুনশুটিতে তার মতো বহিরাগতের কোনো অধিকার নেই।

সুবল অবশ্য তার কর্তব্যে অটল। শৈলর এহেন আক্রমণেও বিচলিত না হয়ে সে

চন্দনের দিকে ঘুরে বলে, "তা হ্যাঁ দাদা, বউদিদির তো কোনো..."

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চুয়ার লাল হয়ে ওঠা মুখটার দিকে একনজর তাকিয়ে শৈলর গলা থেকে একটা চিলচিৎকার বেরিয়ে এল, "মুখপোড়া অনামুখো কোথাকার, থামলে তুমি? ছি ছি ছি ছি কী লজ্জার কথা! সক্কলের সামনে..."

চুয়া তাড়াতাড়ি বারান্দার দড়িতে ঝোলানো গামছাটা টেনে এনে মাথায় জড়িয়ে নিয়ে উঠোনে নেমে বাড়ির সীমানার দিকে এগিয়ে গেল। পেছন থেকে শৈলর চাপা গলার কথা ভেসে আসছিল, "কী যে বোকার মতো ফস করে কথা বলে ফেল তুমি! দিদি লজ্জা পেল শুদুমুদু..."

পেটের গভীরে কোথাও একটা হালকা যন্ত্রণার শিরশিরে আভাস টের পাচ্ছিল চুয়া। লজ্জা নয়, একটা মিশ্রিত অনুভূতি তার চোখদুটোতে শুকনো একটা জ্বালা ছড়িয়ে দিচ্ছে এই মুহূর্তে। গার্ডেন নার্সিং হোমের চারতলার ওটি... উজ্জ্বল আলোর বৃত্তের বাইরে থেকে একট শান্ত আওয়াজ... "ডান ম্যাম। ইটস আউট। ওন্ট ট্রাব্‌ল্ ইউ ফার্দার..."

ট্রাব্‌ল্! প্রথমবার চুয়া কেঁদেছিল। তার পর থেকে গা সয়ে গেছে। অথচ আজ, এই মুহূর্তে এখানে ওই মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে...

শৈল খানিক আগেই তাকে বলেছিল, এত তাড়াতাড়ি সে শিশু চায়নি। আর কয়েকটা মাস একটু হালকা থেকে...

...রাইট টু উম্ব! গর্ভের অধিকার! শিমুলটাপুর শৈল হোক, কিংবা মহানগরীর মির্জা গালিব স্ট্রিটের সোমদত্তা, দুয়ের কাছেই সে বৌদ্ধিক দাবি কেবলই অবাস্তব একটা শব্দবন্ধ।

***

এবং নদীটি এঁকেবেঁকে বহে যায়। পাহাড়ের মাটি ধুয়ে আনা তার ঘোলা জল বড়ো ঠান্ডা। পাকে পাকে তা জড়িয়ে ধরে তার বুকে খেলতে আসা দেহগুলোকে। সব দুশ্চিন্তা, সব কালিমাকে ধুয়ে নিয়ে যায়...

সুবলের অবশ্য স্নান নিয়ে মাতামাতি নেই বিশেষ। এ-নদী তার নিত্যদিনের সঙ্গী। তার স্পর্শে সুবলের আলাদা উত্তেজনা নেই তাই কোনো। জলে নেমে পরপর কয়েকটি ডুব দিয়ে, চুয়া ও চন্দনকে সেখানে রেখে সে পাড়ে উঠে বসেছে। তার পর কোমরে গামছা জড়িয়ে ঘোড়ানিম গাছটার গোড়ায় বসে আরামে বিড়ি ধরিয়েছে একখানা।

জলের বুকে, হঠাৎ করেই যেন কৈশোরে ফিরে যাওয়া মানুষদুটির তৃপ্তির অবগাহন, কখনো-বা ভারসাম্য হারিয়ে চন্দনের সবল হাত ধরে সুস্থির হওয়া চুয়ার মুখের অপ্রস্তুত হাসিটি দেখতে দেখতে আধবোজা চোখে সে বড়ো সহানুভূতির সঙ্গে ভাবে, "আহা শহরের বাক্সে মাপা টাইমের জলে পাখির মতো স্নান করে বেচারারা।

আজ এমন একখান নদী পেয়ে...”

***

তাদের মাথার ওপরে হালকা মেঘের দল বৃষ্টিবিন্দুর লাজবর্ষণ করছিল। ছুটন্ত গৈরিক জলধারা তাদের শরীরের অস্থিসন্ধিতে শীতল আঙুল বুলিয়ে দিয়ে যায়। তার পেলব ছোঁয়া তাদের সব বাঁধনকে আলগা করে দিয়ে যায় ক্রমশ।

খোলা আকাশ আর তীব্র হরিৎ পৃথিবীর মাঝখানে এই অলৌকিক জলধারা সামান্য কিছুক্ষণের জন্য তাদের অপরিচয়ের দূরত্বকে ধুয়েমুছে দিয়ে গেছে। এই জাদুজগৎ তাদের পরিচিত দুনিয়ার বাইরে কোনো অন্য, সমান্তরাল দুনিয়া। ব্যক্তিগত অন্ধকার, আলো ও ইতিহাসের যে শেকলগুলো তাদের চেনা পৃথিবীতে তাদের নিজস্ব অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে, এখানে এই মায়ানদীর বুকে সেই শেকলেরা একেবারেই অদৃশ্য হয়েছে।

ক্ষণকালের জন্য সেই শেকলের ভারমুক্ত হয়ে, অতীত ও ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ ভুলেছে তারা এইবার। জেগে আছে শুধু বে-হিসাব বর্তমানের নির্ভার যাপনটুকু। আর তাই, কখনো ঢেউয়ের ধাক্কায় বেপথু যুবতি যুবকটির বাহুতে আশ্রয় নিয়ে নিজের পতনকে রোধ করে। কখনো বা আবার, নিজের অজান্তেই, বড়ো আশ্লেষে তাকে দুহাতে জড়িয়ে নিয়ে ছুটন্ত জলের বুকে নিজেকে ছেড়ে দেয় খুশিয়াল যুবকটি এবং তাদের ঘিরে, তাদের অজান্তেই বহে যায় মহার্ঘ মুহূর্তগুলো।

সে-মুহূর্তদের সাক্ষী থাকে কেবল একলা নদীটিই। কারণ তার কূল ছেড়ে সুবল কখন উঠে বাড়িতে ফিরে গেছে। শৈলর জন্য তার বড়ো চিন্তা। আহা বেচারা পোয়াতি দশায় একলা একলা রেঁধেবেড়ে শেষে শরীরটরীর না খারাপ করে বসে। ওরা চান সেরে আসতে আসতে এদিকে যদি হাতে হাতে খানিক কাজ এগিয়ে দেয়া যায়।

একটি সন্ধ্যা ও রাত্রি

সমরেশ ভেবে রেখেছিল দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর খানিক বিশ্রাম নিয়ে বিকেলের দিকে বেরিয়ে স্টেশনে ফিরে যাবে। চুয়া তার যাত্রাপথের সম্বল পাটের কাঁধব্যাগটা সঙ্গে করে নিয়ে এলেও, সে তার ব্যাগ গাড়িতেই রেখে এসেছিল। সে নিয়ে সামান্য চিন্তাও ছিল তার। অবশ্য টাকাপয়সা, ফোন, কার্ড-টার্ড তার পকেটেই আছে, কিন্তু তবু, ব্যাগের জামাকাপড়গুলো তো আর ফেলনা নয়!

দুপুরে বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়ার পর সুবলের সঙ্গে তাকে একটি ঘরে রেখে শৈল চুয়াকে নিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে দোর দিয়েছিল। কথা ছিল সাড়ে তিনটে নাগাদ

তারাই এসে ডেকে তুলে দেবে সমরেশদের।

দুজনে সেখানে কী বাক্যালাপ হয়েছিল সে-খবর সমরেশ পায়নি। ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। বড়ো আরামের ঘুম। সে ঘুম ভাঙল চালের ওপর ঘন বৃষ্টির শব্দে। ধড়মড় করে উঠে বসেছিল সমরেশ। হাতের ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা।

"ঘুম ভাঙল?" চুয়া কখন এসে চৌকির ধার ধরে দাঁড়িয়েছে। সমরেশ তার দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা কী হল?"

"কী আবার হবে! শৈল বলল রাতে গান হবে। থেকে যাও রাতটা। ট্রেন তো কাল দুপুরে। জানো তো, কী ভীষণ জেদি! একটু খ্যাপা আছে। তবে গানের গলাটা যাকে বলে সোনা বাঁধানো। একটা নতুন টাইপের ফোক শোনাল। ভাওয়াইয়া। প্রচণ্ড অ্যাপিলিং সুর। ডায়ালেক্টটা ভালো বোঝা না গেলেও অ্যাপিলটা টের পাওয়া যায়।"

"আর তুমিও তাই শুনে..."

"চন্দন প্লিজ," হঠাৎ করেই তার কাছে ঘন হয়ে এসেছে চুয়া, "জাস্ট একটাই তো দিন। কাল সকালের বদলে আজকে স্টেশনে ফিরে গেলে কী লাভ হত আমাদের বলো?"

হঠাৎ বড়ো শান্ত হয়ে এল সমরেশ। চুয়া তাকে জানিয়েছে, বিদেশে নয়, ব্যাঙ্গালোরে একজনের কাছে যাবার কথা তার কলকাতা হয়ে। সেখানে রোজগারের একটা বন্দোবস্ত হবে তার। কলকাতা পৌঁছে ফোনেই নতুন টিকিট সে করিয়ে নিতে পারবে। সমস্যা হবে না। সমরেশ চুয়াকে জানিয়েছে হসপিটালিটি বিজনেসে তার কেরিয়ারের খবর। এর বাইরে, অলিখিত কোনো চুক্তি মেনেই যেন-বা, একে অন্যের আর কোনো পারিবারিক খবরে আগ্রহ দেখায়নি তারা কোনো। পরিচিত দুনিয়া থেকে দৈবের বশে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা দু'খণ্ড স্রোতের শ্যাওলা যেন। ফের যার যার পথে ভেসে যাবে খানিক পরে। অতীত ও ভবিষ্যতের সংস্পর্শহীন এই বর্তমানটুকুর মোহে মজেছে তারা দুজন। নিজেদের অজান্তেই। শেকড়ের খোঁজে তাদের কাজ কী?

"গ্রেট," চন্দন হাসল একটু, "তা গান কি শৈলই গাইবে? নাকি তুমিও..."

"ধ্যাৎ। আমার জঁর-এর গান এখানে চলবে না," চুয়া হাসল, "সুবল গেছে গ্রামে। আর একটা কী যেন ফোক মিউজিকের কথা বলল, গৌরী... হ্যাঁ গৌরীপুরিয়া। এ-গ্রামে নাকি তার শিল্পী আছে একঘর। রাতে গান হবে বলে শৈল এসে বলতেই বৃষ্টি মাথায় করে বেরিয়ে গেল একছুটে তাদের ধরে আনতে। আর শৈল গিয়ে ঢুকেছে রান্নাঘরে। গাইয়েরাও নাকি রাতে খেয়ে যাবে একেবারে। তার জোগাড়যন্ত্র চলছে।"

***

ঘন বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। এ-বৃষ্টিতে সকালের সেই ঝোড়ো হাওয়ার উন্মাদনার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। সকালের কৈশোরকে ভুলে রাত্রের প্রগাঢ় যৌবনবতী

বর্ষা মন্থর বারিধারায় ঝরে পড়ে পৃথিবীর বুকে।

সন্ধে থেকেই গানের আসর বসেছে সুবল ও শৈলর শোবার ঘরটিতে। এ-ঘরে খাটপালঙ্কের বাহুল্য নেই। ঠনঠনে মাটির মেঝের ওপরে পেতে রাখা বিছানাটি গুটিয়ে ঘরের একপাশে তুলে রাখা হয়েছে যত্ন করে। গায়কের দলটি বসেছে ঘরের মাঝখান জুড়ে। স্বামী-স্ত্রী ও তিনজন সন্তান মিলে একটিই পরিবার। গাইয়ে বলে খানিক নামডাকও আছে তাঁদের এ-দিগরে। ছোটোখাটো আসরে ডাকও মেলে মাঝেমধ্যে।

পুরুষটি অবশ্য সুরজগতের মানুষ নন। সুবলের অসমবয়েসি এই কৃষক বন্ধুটি তাঁর গাইয়ে পরিবারের সঙ্গে আসরে আসরে চলেন সর্বদা। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

দেয়ালের ধার ঘেঁষে চুয়া, চন্দন, শৈল ও সুবলের সঙ্গে তাঁরও আসন হয়েছে। ব্যাবসায়িক গানের আসর এ নয়। আজ তাঁরা সকলেই চুয়ার অতিথি। গানবাজনার পর দুটি খেয়েদেয়ে তবে যাবেন।

চৌচালা বাড়িটির টিনের চালে মৃদু, প্রগাঢ় ও অবিরত বৃষ্টির শব্দের প্রেক্ষাপটে, তাদের সামনে বসে থাকা প্রৌঢ়াটির প্রায় ধাতব, তীক্ষ্ণ সুর খেলা করে যায় গৌরীপুরিয়া লোকগানের পঙক্তিগুলিকে নিয়ে,

গোলাপির এই পরার শাড়ি
গোলাপিকে দিব না
পাখাছানি দিয়া নাচে গোলাপি
গোলাপির এই সিথার সিন্দুর
গোলাপিকে দিব না...

প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের ভাঁজে ভাঁজে মিশে যায় বাজনদারদের ঠোঁটে ও হাতে ধরা বাঁশি, খঞ্জনি, ঘুঙুর বা মৃদঙ্গের বোল। হাসছে তারা সকলে। নিজেদের জীবনের সুখদুঃখ আলো কালো এই সব কিছু থেকে উদ্গাত সংগীতকে সুরময় শব্দজালে বেঁধে বাতাসে উড়িয়ে দিতে দিতে, যাপনের আনন্দে নিজেরাই বিভোর হয়ে আছে।

"আর না।"

গানটির শেষ পঙক্তটির সুর টেনে চূড়ায় তুলে তা ছেড়ে দিয়ে প্রৌঢ়াটি শৈলর দিকে ঘুরে বসলেন এবার।

"আর একটা গান মাসি," শৈল জবাব দেয়, "ওই যে সেই সাদের ভোমরা উড়িয়া পড়ে ঠাঁই ঠাঁই..." ওইটা... ওইটা।

প্রৌঢ়া কৃত্রিম কোপে তার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলেন, "সেই সাঁঝ থেকে গাইছি। বুড়ির গলায় ভাঙা কাঁসর কেবল শুনাবি নাকি অতিথদের? সে হবে নে। এইবার তোর পালা। আমি তোরে আজ ছাড়ছিনি শৈলী।"

বলতে বলতেই পাশে বসা বাজনদারদের দিকে ঘুরে তিনি ইশারা করলেন, "এই ধর দেখি, মই হইল অবলা নারী... মুখরা ধর... মুখরা ধর... এ বেটির গলায় সে গন্দ আহা হা রে..."

লাজুক মুখে মাথা নাড়ল শৈল। তারপর অপাঙ্গে স্বামীর দিকে কৃত্রিম কোপদৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে এক হাতে মুখের ধারটি ঢেকে তার তীক্ষ্ণ সুরটিকে ছড়িয়ে দিল ঘরের ভেজা বাতাসে। এই ভূমির তরুণী বধুর চিরন্তন ক্ষোভ ও তার পরিণতির কাহিনি

...মুই নাকি নাগিনী নারী
চলনটা মোর অসংসারী
ভাতারটারে পারং না মই
করিতে রে বশ
নিদয়া ভাতারটা মুর
নাইয় কোনোই রস
এলা মুই কী করং
নদিয়ায় ডুবি মরং
ঝারিয়া নডায় নডায় ছিছরিহ জল
ডুবারু ভাতারটা মোর করেছে বিফল...
মুই হইনু অবলা নারী ডিহির বান্ধা জ-ল

বাঁধের বাঁধনে বন্দি স্রোতহারা তটিনী সে... ননদিনীর মুখে নাগিনী সম্ভাষণ, নির্দয় স্বামী, তবু নদীতে ডুবে মরতে গেলে সেই স্বামীই আবার নদীর জল ছেঁচে তাকে উদ্ধার করে আনে। রাগে-অনুরাগে মিলমিশ করে সেই গানের তীক্ষ্ণ সুর মিশে যাচ্ছিল আকাশ ও পৃথিবীর মিলনের সেতুবন্ধ বৃষ্টির মৃদু ধ্বনির সঙ্গে...

***

রাত বেড়েছে। খাওয়া-দাওয়ার শেষে এ-ঘরে তাদের বিছানা পেতে দিয়ে শৈল একটা কুপি জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছে। যাবার আগে ঠোঁট টিপে হেসে বলে, "তেল দিইছি এক কড়া। না নিভোলে মধ্যিরাতে আপনি নিভে যাবে। মোতিমাসি যা বলে গেল মনে আছে তো?"

জবাবে চুয়া খানিক ছদ্ম কোপে হাত তুলে চড় দেখিয়েছিল তার দিকে।

শৈল চলে গেছে অনেকক্ষণ হল। বৃষ্টির ক্রমাগত আবছা শব্দ পেরিয়ে ওঘরে স্বামীস্ত্রীর কথাবার্তার হালকা আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার প্রৌঢ়া গায়িকাটি চলে যাবার আগে ওই দু'এক মিনিট সময়...

ছবিটা ফের একবার ফিরে আসছিল চুয়ার চোখের সামনে। খাওয়া-দাওয়ার পর বৃষ্টি মাথায় করেই বাড়ির দিকে রওনা হবার আগে শৈলর গর্ভের খবর নিয়েছিলেন তিনি তার কাছ থেকে। এ-গ্রামে এখনও সরকারি শিশুমঙ্গলের দাক্ষিণ্য কাগজ-কলম ভিন্ন বাস্তবে এসে পৌঁছোয়নি। এই মহিলাটিই এখানে ধাত্রীর কাজ করেন। অভিজ্ঞ চোখে শৈলকে খানিক জরিপ করে নিয়ে বলেছিলেন, "ছ্যানা তো ভালোই আছে গো মা। তবে শরীলের যা গতিক দেখি, তাতে এযাত্রা নারায়ণ নয়, মালক্ষ্মী আইসছেন তোমার ঘরে।"

আর তারপর হঠাৎ করেই চুয়ার দিকে ঘুরে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "তা তোমার ছেলেমেয়ে ক'টি গো মা?"

একটু থতোমতো খেয়ে চুয়া জবাব দিয়েছিল, "এখনও... মানে..."

শুনে কোনো জবাব দেননি পোড়খাওয়া ধাত্রীটি। শুধু অভিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণ চোখ মেলে ফের একবার জরিপ করে নিয়েছিলেন তাকে। ঘুরে দেখেছিলেন চন্দনের দিকেও। সে-দৃষ্টিতে গভীর অবিশ্বাস ছিল। তারপর বেরিয়ে যাবার আগে মাথা নেড়ে বলে গেলেন, "সে যা হইছে হইছে, তবে আর দেরি কোরো না মা। শরীলে বইবে না আর এর পর..."

সে-দৃষ্টির কথা মনে করে ফের একবার ভেতরে ভেতরে একটু কাঁপুনি দিয়ে উঠল চুয়ার। চন্দন...

খোলা দরজার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল সে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক দিলে বারান্দায় চন্দনের আবছায়া চেহারাটা চোখে পড়ে। শৈলরা ঘরে দোর দেবার পর থেকেই ওখানে গিয়ে বসে রয়েছে। পুরুষজাতিটার প্রতি খুব একটা সম্মানবোধ আর অবশিষ্ট নেই তার। চন্দনও আলাদা কিছু নয়। আজ সারাটা দিন ধরে খুব ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে আসবার প্রতিটা পদক্ষেপ সে নজর করেছে। ঘনিষ্ঠতাকে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তোলবার প্রতিটি পদক্ষেপ...

একটা হাসি উঠে আসছিল তার ভেতরে। বিষয়টা মজাদার। একটা সুস্থ স্বাভাবিক মধ্যবিত্ত মানুষ। হয়তো বিবাহিত, সংসারী। অথবা, হয়তো তার প্রেমিকা তার অপেক্ষায় আছে... অথচ সাক্ষীপ্রমাণহীন একটা অবসরের সুযোগ পেতেই প্রথম নাগালে পাওয়া মেয়েমানুষটাকে খানিক ভোগ করে নেবার...

গর্ব! এরকম একটা রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চার... পড়ে পাওয়া একটা ফুর্তি... ফিরে গিয়ে বন্ধুবৃত্তে সেই নিয়ে খানিকটা গর্ব...

অথচ দুপুরে শৈল যখন বলল, রাতে তাদের এই ঘরে শোবার বন্দোবস্ত হয়েছে, তখন সে তো তাকে সত্যিটা খুলে বলে...

সত্যিটা!!

শব্দটা হঠাৎ করেই একটা ধারালো খোঁচার মতো তার নিজের চেতনাতেই গিয়ে ঘা দিল যেন। কোন সত্যিটা! তার ও চন্দনের মধ্যে সম্পর্কের যে মিথ্যেটাকে এরা নিজেরাই ধ্রুব বলে ধরে নিয়েছে, তার বদলে কোন সত্যিটা সে ওকে জানাত? যে সত্যিটা সে চন্দনকে বলেছে? সে বাঙ্গালোরে চলেছে সেখানে একটা রোজগারের চেষ্টায়! অক্ষরে অক্ষরে সত্যি বলেছে চুয়া। অথচ সে-ও তো একটা মিথ্যে! সে ওই সরল মেয়েটার কাছে একটা দ্বিতীয় মিথ্যে দিয়ে প্রথম মিথ্যেটাকে ঢেকে কী লাভ হত তার?

আলোটা দপদপ করে উঠল একবার। তেল শেষ। ক্ষীণ হতে হতে আলোটা নিভে যেতেই অন্ধকার বাইরেটা যেন ঝাঁপিয়ে এল ঘরের ভেতর তাকে ঘিরে। আর ঠিক সেই মুহূর্তটাতেই একটা দ্বিতীয় দ্বিধা তার বুকে বাসা বাঁধল এসে। আজ দুপুরে... নদীর বুকে চন্দনের হাতের বাঁধনে... তাদের ঘিরে নদীর ঠান্ডা জল... মুখের বড়ো কাছে আর একটি মুখ... অপরিচিত... অথচ এক খণ্ডমুহূর্তের জন্য বড়ো কাছের বলে মনে হয়... সেটা... সেটাও কি আরও একটা সত্যি নয়?

তাহলে কোন মেয়েটা আসল? কোন পুরুষটি? কোন সম্পর্ক বা অ-সম্পর্কটাকে সে আসল সত্য বলে ধরে নেবে?

জীবন বলতে ভালোবাসা, শরীর, সন্তানসহ নিস্তরঙ্গ যে যাপনকে ধ্রুব বলে ধরে নিয়েছে এই পশ্চাতভূমির এক অশিক্ষিত দম্পতি... আজ সারাটা দিন মনে মনে তাকে একটা অলীক কল্পনা হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের সঙ্গে সেই খেলায় মেতে থেকেছে সে। মেতে থেকেছে এইটি জেনে নিয়েই যে আগামীকাল আর এই স্বপ্নটার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না তার জীবনে, তার পৃথিবীতে। অথচ, এই মুহূর্তে বারান্দার অন্ধকারে বসে থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়ে কেন হঠাৎ সেই অলীক কল্পনাটাকেই গূঢ় কোনো কাম্য সত্যি বলে মনে হচ্ছে তার? আজ দুপুরে নদীর বহতা জলের বুকে যে অজানা উষ্ণতার সন্ধান তাকে দিয়েছিল ওই যুবক, এতক্ষণ তাকে তো সে একজন বুদ্ধিমান সুযোগসন্ধানীর অতি স্বাভাবিক ছল বলেই চিহ্নিত করে রেখেছিল। অথচ এখন... এই যৌথ উপস্থিতির এই শেষ প্রহরটিতে এসে পৌঁছে, গভীর অন্ধকারে, একেবারে একা একা নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সেই মুহূর্তটাকেই আরও প্রলম্বিত, হয়তো-বা চিরস্থায়ী করে তোলবার এই কামনা কেন তাকে...

বেপথু যুবতিটি নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়ায়। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় বাইরে বসে থাকা মানুষটির কাছে।

বিদ্যুতের একটি ঝলকে তার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল যুবকটি। নিতান্তই অর্থমূল্যহীন এই একটি দিনের সঙ্গকে সে নিজের কাজের দুনিয়ার বাইরে খানিক

বিশ্রামের সময় হিসেবেই চিহ্নিত করেছিল। বিশ্রাম। উদ্দেশ্যহীন, অতীত বা ভবিষ্যৎবিহীন একটুকরো আনন্দই কেবল। তবে চুয়ার কোনো ক্ষতি সে করতে চায়নি। বড়ো নিষ্পাপ সুন্দর মেয়েটি। বাইরের দুনিয়ায় যে জগতে তার বসবাস, সে জগতের নাগালের বাইরের মানুষ এ। নিজের আলোকিত জীবনের পথে এগিয়ে চলেছে বাপের আশ্রয় ছেড়ে। সমরেশ দুষ্কৃতকারী নয়। মিথ্যাবাদীও নয়। চুয়াকে সে নিজের যে নামটি বলেছে, তার ধোঁয়াশা শৈশবের কোনো একটি ঘরে একজন প্রিয় মানুষ এ নামে তাকে ডাকতেনও। সে মানুষটির প্রিয় স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই প্রিয় নামটি দিয়ে মেয়েটির কাছে নিজের পরিচয় দিতে কোনো দ্বিধা হয়নি তার তাই। ভালো লেগেছিল বরং। চুয়া... চন্দন... অতীতের এক প্রেমকাহিনির দুই নায়ক-নায়িকা। কাহিনি! সাহিত্যিকের কল্পনা। বাস্তব নয়। অথচ সত্য।

তার স্থির ও নৈর্ব্যক্তিক চোখ আজ মেয়েটির প্রাথমিক প্রতিরোধ, তারপর ধাপে ধাপে তার আত্মসমর্পণের ছবিটিকে দেখেছে। অথচ তাকে বাধা দিতে পারেনি। মুহূর্তগুলোকে ভেঙে দেবার মতো মানসিক জোর পায়নি সে। আর অবশেষে, আজ রাতে, ঘরের ওই শয্যাটির ওপরে বসে যখন সে তার দিকে ঘুরে তাকাল, তখন তার অভিজ্ঞ চোখ টের পেয়েছিল, আর সামান্য একটু ইঙ্গিত, একটি অভিব্যক্তি, এগিয়ে গিয়ে একটু স্পর্শ শুধু... তাতেই ও মেয়ের শেষ বাঁধটুকু ভেঙে যাবে। একটা আসুরিক শক্তিতে নিজেকে সংযত করে ঘর ছেড়ে বের হয়ে এসেছিল সে। তার কাছে হয়তো নেহাতই একটু বিশ্রাম, একটু নির্দোষ খেলা। কিন্তু এর কাছে তা মর্মান্তিক একটা ক্ষত হয়ে উঠবে। যা হবার নয়, ক্ষণিকের জন্য তার স্পর্শ পেয়ে হয়তো এর পর এর গোটা জীবনটাই...

চুয়া বাইরে এসেছে। অন্ধকারের আড়ালে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তার কাছটি ঘেঁষে বসেছে নিঃশব্দে।

প্রায় নিজের অজান্তেই সমরেশের একটা হাত উঠে যুবতিটির পিঠকে বেড় দিয়ে নিল।

"চন্দন..."

"বোলো না চুয়া। বোসো। বেশিক্ষণ নেই তো আর। যে কয়েকটা ঘণ্টা বাকি আছে..."

হঠাৎ যেন একটা ছায়াছবির মতোই গোটা দিনটার বিভিন্ন ফ্রেমগুলো যুবতিটির চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল। সুবল, শৈল... সম্পর্কের বহিরঙ্গের ঝাঁজ, অন্তরঙ্গের সুমিষ্ট ফল্গুটি... নারীটির গর্ভস্থ ভ্রূণের জন্য তার জনকের আকুতি, তার অহংকার, তার না-বলা ভালোবাসার সেবাটুকু... পুরুষটির প্রতি সম্ভাষণে নারীটির স্বামীসোহাগ, বন্ধুপ্রীতি ও অপত্যস্নেহের পঞ্চরসের স্বর্গীয় মিশ্রণ সেইসব... সব...

যুক্তি ও বাস্তবের অনপনেয় গণিতকে ভুলে গিয়ে যুবতিটি নিজেকেই বলতে শোনে, "কেন বেশিক্ষণ নেই চন্দন? আমরা চাইলে তো..."

"হয়তো চুয়া... হয়তো..."

তারপর সব কথা শেষ হয়ে যায়। প্রকৃতির কোনো আশ্চর্য জাদুতে, রাত্রির অবশিষ্ট সামান্য সময়টুকু প্রলম্বিত হয়। এক অনন্ত সময়ধারায় বদলে গিয়ে তা অন্তহীন যৌথ জীবনের মায়ায় জড়িয়ে থাকে তাদের। রূঢ় সত্যকে কিছুক্ষণের জন্য বন্দি রেখে নিজেদের ঐকান্তিক কামনাটুকুকেই সত্য বলে ধরে নিয়ে দুটি মানুষ স্বপ্ন দেখে চলে। সে স্বপ্নে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে, দীর্ঘ পথ একত্র পাড়ি দিয়ে সুপরিণত হয় ও অবশেষে বড়ো তৃপ্তিতে, সন্ততিকে নিজের জায়গায় স্থাপন করে নিজেরা বিলীন হয়, যেমন হয়ে থাকে এই অলীক গ্রামটির প্রতিটি মানুষ-মানুষীর জীবনে...

***

"ওমা! কখন উঠলে তোমরা অ্যাঁ?"

পেছন থেকে সদ্য জাগ্রত শৈলর বিস্মিত গলাটি শুনে চমক ভেঙে তাড়াতাড়ি একটু সরে বসল তারা।

"আহা বোসো না একত্তরে আর একটু। চোখ ভরে দেখি। যেমন দ্যাবা তেমন দেবী। যেন সাক্ষাৎ উমা-মহেশ্বর নেবে এয়েছেন গো..."

বলতে বলতে শৈল ঠোঁট টিপে একটুখান হেসে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত রাত্রির বর্ষণের পর ক্লান্ত আকাশ বিশ্রাম নিচ্ছে অবশেষে। প্রাক্ প্রভাতের ম্লান আলোয় বাড়িটির চারপাশে ছড়িয়ে থাকা অজস্র বৃক্ষলতায় জলের বিন্দুগুলি টুপটাপ ঝড়ে। বাতাসে আর্দ্রতার সঙ্গে হালকা শিরশিরে ঠান্ডার ছোঁয়া।

চুয়া হাসল, "এত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠো নাকি তোমরা শৈল?"

"আট্টু বেলা হয়," শৈল গায়ে আঁচলটি জড়িয়ে নিল ভালো করে, "তোমার দেওরের তো এখনও মাঝরাত্তির। ষাঁড়ের মতো নাক ডাকাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ না?"

"তা তুমি এত তাড়াতাড়ি আজ..."

"ও মা। পুরুষমানুষ নয় বেখেয়ালে ঘুমোবে, তাই বলে আমি পোড়ারমুখীও ভুলে থাকব? সক্কাল সক্কাল বেরোবে যে তোমরা। দুটি ভাতে-ভাত মুখে না দিয়ে ছেড়ে দিলে গেরস্তের অকল্যাণ হবে যে! আমি যাই। চুলোয় আগুন দিই গে। তোমরা বরং মাঠকাজ-টাজ যা সারবার এই ফাঁকে..."

মুচকি হেসে সমরেশ চুয়ার দিকে ঘুরে দেখল একবার, "যাবে নাকি? মাঠকাজে?"

"মাঠকাজ? মানে খেতের..."

সমরেশ ও শৈলর যৌথ হাসিতে তার বাকি কথাটুকু চাপা পড়ে গেল এর পর।

উপসংহার

"তাহলে চলি?"

"এসো। আমি ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে কন্ট্যাক্ট করব, কেমন?" চুয়ার ফোনে উবেরের গাড়ির দপদপে ছবিটা ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছিল।

চন্দন গাড়ি বলেনি। স্ট্যান্ড থেকে দক্ষিণ কলকাতার এসি বাস ধরে নেবে চুয়াকে তুলে দেবার পর।

আগের দিন শিমুলটাপু থেকে স্টেশানে ফিরে আসবার পর ঘটনাবিহীন যাত্রাটায় তাদের কথাবার্তা হয়নি বেশি। চন্দন তার বইতেই মজে ছিল। চুয়া মজে ছিল ইয়ারফোনে গানের সুরে। শিমুলটাপুর গানের সন্ধেটার রেকর্ডিং তার সঙ্গে চলেছে। কেবল মাঝে মাঝে পুরুষটি নীরবে উঠে তার খাবার, জল এই সব কিছুর জোগান দিয়ে গিয়েছে দায়িত্ববান সঙ্গীর মতোই। নিজের প্রাপ্য হিসেবেই তা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছে চুয়া। তার অর্থমূল্য চুকিয়ে দেবার কথা উচ্চারণ করেনি। কখনো-কখনো প্রায় জোর করেই পুরুষটির মনোযোগ তার বই থেকে সরিয়ে এনে ইয়ারফোন খুলে ফেলা ফোন থেকে ভেসে আসা গানটি তাকে শুনিয়ে চোখে আলো জ্বেলে বলে উঠেছে, "এই গানটা মনে আছে? 'ও তোর হেপ্পি কাটা চুল বাবরি ছাঁটা চুল মনটাক নিলেক মোর হরিয়া...' এই গান গেয়ে শৈলী সুবলকে বশ করেছিল বলে বুড়ির সে কী হাসি..."

এবং সেই হাসির স্মৃতি ও বৃদ্ধার এহেন দুষ্টুমিতে শৈল ও সুবলের সে-মুহূর্তের লজ্জারুণ মুখদুটি মনে করে তারা দুজন একসঙ্গে হেসে উঠেছে কতবারই। আবার কখনো বা, কেন সুবল অস্বীকার করলেও জোর করে টাকাক'টি চন্দন তাদের হাতে গুঁজে দিয়ে আসেনি ফিরে আসবার আগে, সে নিয়ে অনুযোগও শুনিয়েছে সে পুরুষটিকে। বিড়ম্বিত মুখে পুরুষটির 'আমি কী করব' এই জবাবটি সুখী করতে পারেনি তাকে।

ট্যাক্সি এসে গিয়েছিল। তার দরজাটা খুলে ধরে সমরেশ বলল, আমার ফোন নম্বরটা এনট্রি করে নিয়েছ তো?"

"হ্যাঁ। তুমি?"

"এই নিই..." বলতে বলতেই নিজের ফোনে চাবি টিপছিল সমরেশ... চুয়া... কী? না থাক। শুধু চুয়াই যথেষ্ট। ওকে... দেখা হবে। "

"শিওর। ভালো থেকো। আমি না-ফেরা পর্যন্ত..."

***

হাজারো গাড়ির ভিড়ে মিশে হারিয়ে যাওয়া গাড়িটাকে একবার শেষবারের মতো খুঁজে দেখবার চেষ্টা করল সমরেশ। নাঃ। লালনীল সাদা হাজারো গাড়ির মিছিলে

মিশে ভেসে গেছে চুয়ার গাড়ি।

একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল সে। লম্বা লাইন পড়েছে গড়িয়াহাটগামী এসি বাসের শেড-এর সামনে।

সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতেই কোম্পানির দেয়া টেম্পোরারি সিমটাকে ডি-অ্যাক্টিভেট করে, পাউচ থেকে পার্মানেন্ট সিমটা বের করে ফোনে ঢুকিয়ে নিল সে। এসকর্ট সার্ভিসের পেশাটা বিপজ্জনক। শারীরিক সুখ কেনাবেচাটা প্রায়শই এক বা দুটি দিন বা রাতের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় না। বহু সময়েই ক্লায়েন্টের তরফ থেকে রোমান্টিক কমপালশান গড়ে ওঠে। কখনো-কখনো অন্য বিপদও আসে। পেশাদার এসকর্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে তাই পুরুষ বা মহিলা এসকর্টদের এই জোড়া সিম-এর কনসেপ্টটা আজকাল চালু। অ্যাসাইনমেন্টের সময় যে সিমটা চালু থাকে, অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হলে সেটা অফ করে দেওয়া, ব্যস। সেইসঙ্গে প্রত্যেক মাসে এই টেম্পোরারি সিমগুলো কোম্পানি রিডিসট্রিবিউট করে দেয়। এই সিমটাও সমরেশ আজ জমা দিয়ে একটা অন্য টেম্পোরারি সিম নিয়ে নেবে...

চুয়া আঘাত পাবে। অনেক আশায় তার ফোন নম্বরে ডায়াল করে, জবাব না পেয়ে কিংবা ভুল মানুষের জবাব পেয়ে একসময় থেমে যাবে। হয়তো তার বিষয়ে...

ভাবুক। অন্তত এই আসল পরিচয়টা তো আর...

বাস এসে গিয়েছে। উঠে জানালার ধারের আসনে বসে হাওড়া ব্রিজের দিকে ঘুরে দেখল একবার সমরেশ। বিরাট জ্যাম ওখানে। ওখানেই কোথাও চুয়ার গাড়িটা রয়েছে। হয়তো এখনও নেমে গিয়ে খুঁজলে...

পরমুহূর্তে নিজের ছেলেমানুষিতে একটু হেসে উঠে মাথা নাড়ল সে। পার্মানেন্ট সিম-এর হোয়াটস অ্যাপ-এ একটা অ্যাড্রেস ভাসছে। কোম্পানির ওঝাজির মেসেজ। মিসেস অনুজা শ্যামল। সিঙ্গল। ডিভোর্সি। আজকের পুরো রাতটার জন্য বুক করতে চান। ডিনার ও ড্রিঙ্কস কমপ্লিমেন্টারি। রেমুনারেশান টেন থাউজ্যান্ড ফ্ল্যাট। খুশি করতে পারলে ভালো টিপ্‌স্। আকর্ষণীয় অ্যামাউন্ট।

সমরেশ একটুক্ষণ মেসেজটার দিকে তাকিয়ে দেখে নিল। তারপর একটা রিগ্রেট মেসেজ পাঠিয়ে দিল ওঝাজির কাছে। অন্তত আজকের দিনটা সে একগামী পুরুষ। অন্তত আজকের দিনটা... চুয়া কলকাতা ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত...

***

তখন, জ্যামবিধ্বস্ত হাওড়া ব্রিজের ওপরে একটি গাড়িতে বসে সোমদত্তা নামের একটি তরুণী তার মোবাইল ফোনের অস্থায়ী সিমটির সঙ্গে জোড়া 'চুয়া' নামটিকে মুছে দিয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছিল। প্রায় কুড়িটি মেসেজ ও গুটিদশেক মিস্‌ড্ কল

এসে পড়ে আছে সেখানে। একটিই নম্বর থেকে। গুয়াহাটির কাছে পবিতরা অঞ্চলের চা বাগানের মালিক ওই নখদন্তহীন বৃদ্ধের মেসেজ। তাঁর অবিরত প্রেমনিবেদন। ট্রেনে তাকে সি অফ করে যাবার পর থেকেই বিরহবেদনায় বড়ো দুঃখে আছেন তিনি। যে-কোনো পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে চুয়াকে তিনি স্থায়ী সঙ্গিনী হিসেবে চান এবারে।

চা-বাগানের গভীরে মানুষটার নিঃসঙ্গ, সুসজ্জিত বাংলোয় কাটিয়ে আসা তিনটে দিনের স্মৃতি মনে ফিরে এসে গা গুলিয়ে উঠছিল চুয়ার। ঘরজোড়া আয়না সাজানো তাঁর রতিগৃহে। সেখানে তার নগ্ন শরীরের ওপর বেঢপ শরীরের এক বৃদ্ধের বিকৃত যৌনক্রীড়ার অক্ষম প্রয়াসের চলমান প্রতিবিম্ব... দন্তহীন মাড়ির অবিরত কামড় তার মুখে, স্তনে, যোনিতে...

এক-এক করে মেসেজগুলো মুছে দিয়ে নম্বরটিকে নিষ্ক্রিয় করে তার পার্মানেন্ট সিমটাকে এবার চালু করে দিল সে। সেখানে সক্রিয় হয়ে ওঠা হোয়াট্‌স্ অ্যাপ তাকে নতুন একটি মেসেজ দেখাচ্ছিল তখন, 'অ্যানাদার অ্যাসাইনমেন্ট ফর ইউ। ব্যাঙ্গালোর এগেইন। থ্রি নাইট কর্পোরেট পার্টি অ্যাট উজরগাম কফি প্ল্যান্টেশান ফ্রম টুমরো। বোর্ড অ্যান্ড লজিং কমপ্লিমেন্টারি। ফুল অ্যাডভান্স পেমেন্ট। লেট মি নো ইফ ইউ আর অ্যাভেইলেবল।'

মেসেজটার দিকে একনজর তাকিয়ে দেখে নিল সোমদত্তা। ইচ্ছে করছে না তার। অন্তত আজকে দিনটা...

"নট ফিলিং ওয়েল টু ডে। সরি। কুড উই পোস্টপোন ফর আ ডে?"

মেসেজটা কোম্পানিতে পাঠিয়ে দিয়ে একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল সে। সে কারও বাঁধা কর্মচারী নয়। এসকর্ট সার্ভিস অনেকটা উবেরের মতোই। শহরের বুকে কর্মরত অজস্র পেশাদার ও অ্যামেচার দেহব্যসায়ী নারীপুরুষের অ্যাগ্রিগেটরের কাজ করে। তাদের সার্ভিস প্রভাইডার লিস্টে তার মতো অ্যাট্রাকটিভ কাঁচামালের অভাব নেই। অ্যাসাইনমেন্টটা তার জন্য বসে থাকবে না। আর কাউকে দিয়ে দেয়া হবে। হোক। আজ সে সারাটা দিন একলা থাকবে এবং আসা সম্ভব নয় জেনেও নিজের অজান্তেই মাঝে মাঝে তার নতুন সিম-এর ফোনটিতে একটা মেসেজ আসবার আশায় তার পর্দায় চোখ রাখবে—

"পৌঁছোলে? অল ওকে?"

জ্যাম ছেড়ে গিয়েছে। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "ট্রিপটা ক্যানসেল করছি ভাই। যদি ফেয়ারটার সঙ্গে আরও ফাইভ হান্ড্রেড দিই তাহলে আপনি কি উবের অ্যাপ থেকে লগ অফ করে আমাকে মির্জা গালিব স্ট্রিটে পৌঁছে দিতে পারবেন একটু? বাড়ি ফিরে যেতে হবে। জরুরি..."



ডানা

সৌমেনের দুটো ডানা আছে। জন্মের সময় ছিল না। ও যখন ক্লাস নাইনে পড়ে তখন প্রথম ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করেছিল। পিঠের মাঝ বরাবর ভীষণ চুলকোত মাঝে মাঝে। ক্লাসে লাস্ট বেঞ্চে দুলদুলি ওর পাশে বসত আর মাঝে মাঝেই এ-ওর গায়ে একটুখানি হাত দিত। বেশি কিছু না, ওই একটু ছুঁয়ে দেখা আর কী। সেই দুলদুলিই একদিন নরেশবাবুর ক্লাসে লাস্ট বেঞ্চে বসে অঙ্ক টুকতে টুকতে বাঁহাতটা ওর শার্টের মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে পিঠটা ছুঁতে ছুঁতে ফিশফিশ করে বলল, "তোর পিঠে কী রে? কেমন যেন খসখসে হয়ে আছে!"

"পিঠে আবার কী থাকবে? পিঠ। ভীষণ চুলকোচ্ছে। একটু চুলকে দে না!"

"সে কী রে? আমারও পিঠের মাঝখানটায় একটু একটু চুলকোয় তো! দাঁড়া, আগে তোরটা চুলকে দি— তারপর-"

দুলদুলি তার পিঠটা খানিক চুলকে দেবার পর সৌমেনের পালা। সবে সে দুলদুলির জামার ভেতর দিয়ে পিঠের ওপর বা হাঁতটা বাড়িয়েছে তখন হঠাৎ হিমাদ্রি বলল, "ও স্যার, দেখুন, সৌমেন আর দুলদুলি না—"

হিমাদ্রি নরেশবাবুর পেটোয়া ছাত্র। ভালো ছেলে বলে সুনাম থাকায় মেয়েদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করাটাও ওর আর হয়ে ওঠে না। সৌমেনের ওপরে তাই তার রাগ থাকাটা স্বাভাবিক। তাকে সৌমেন দোষ দেয় না।

তারপর তো বেজায় গণ্ডগোল বেধে গেল। নরেশবাবু বেশ প্রাচীনপন্থী লোক। বিয়েথাওয়া করেননি। অঙ্ক খান, অঙ্ক ঘুমোন। বাথরুমে গিয়েও নির্জনে অঙ্কই কষেন। দুলদুলির গার্জিয়ান কল হল এবং তাকে ইশকুল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হল। সৌমেনের অবশ্য গার্জিয়ান কলের রাস্তা ছিল না। ওর তখন সতেরো বছর বয়েস। এক হাতুড়ে

হোমিওপ্যাথিকের বাড়িতে কাজ করে খায়। রাতে তাঁর ডিসপেনসারি পাহারা দেয়। আর দুপুরবেলা নিতান্ত অনিচ্ছায় ইশকুলে যায় ডাক্তারের তাড়নায়। ডাক্তারটি বেশ আধুনিক মনের মানুষ। তাঁর ধারণা সবাইকেই নাকি পড়াশোনা করতে হয়। কাজেই ইচ্ছে না থাকলেও আর বারতিনেক ফেল করা সত্ত্বেও সৌমেনকে ইশকুলে যেতেই হচ্ছিল।

ঘটনাটার পরে তার দশাও ওই দুলদুলির মতোই হল, তবে কপালে বেশ খানিক ফাউ মারধরও জুটে গেল। মারধর খেলেও সৌমেনের এতে শাপে বরই হল। ইশকুলের জ্বালা ঘুচে গেল তার একেবারে। সে ল্যাঠা চুকতে ডাক্তার বেশ পরিষ্কার বিবেকসহ তাকে আরও একচোট মারধর করে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ডিসপেনসারিতেই বহাল করে দিলেন। সৌমেন ছেলেটা সৎ। পয়সারও খাঁই নেই বেশি। খোরাকিও বেশ কম। এমন ছেলে, মেয়েদের গায়ে একটু-আধটু হাত দিলেই তাকে কাজ ছাড়িয়ে দিতে হবে সেটা কোনো কাজের কথা নয়। ডাক্তারের বউ এই নিয়ে নিভৃত শলাপরামর্শের সময় ডাক্তারকে চোখ মেরে বলেছিলেন, "ও বয়সে তুমি কেমন ছিলে সে আমার থেকে বেশি কে জানে?" তাঁরা দু-জন পাশাপাশি পাড়ার ছেলেমেয়ে। একসাথেই বড়ো হয়েছেন।

দুলদুলিরও ভালোই হয়েছিল এতে। তার বাবা মাসদুয়েকের মধ্যে তার বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন মুম্বাইতে। শোনা গেছে ছেলে সেখানে স্যাকরার কাজ করে। ভালো রোজগার। সম্বন্ধটা এনেছিল যে পিলুমাসি সে-ই তথ্যগুলো দিয়েছিল। পিলুমাসি কলকাতায় থাকে। তার কথায় সন্দেহ করবে এমন জ্ঞানগম্যি দুলদুলির বাবার ছিল না।

যাবার সময় দুলদুলির হাসি আর ধরে না। তার বয়েস তখন চোদ্দো পেরিয়ে পনেরো। এহেন উঠতি বয়সে অঙ্ক, ভূগোলের থেকে শারীরশিক্ষা আর গার্হস্থ্যবিদ্যার পাঠ নেবার ইচ্ছেটা তার তখন প্রবল হয়ে উঠেছিল।

গা-হাতপায়ের ব্যথাটা মরলে পরে একদিন রাতে ডিসপেনসারির ভেতরে ঘুমোবার আয়োজন করতে করতে পিঠের চুলকুনিটা আবার উঠল সৌমেনের। তখন দুলদুলির কথাটা ফের একবার মনে পড়ে গেল তার। ডিসপেনসারিতে একখানা বড়োসড়ো আয়না ছিল। ডাক্তারের মাঝেমধ্যেই নিজের রূপ দেখবার শখ যায়। তাই আয়না এনে রেখেছেন। জামাপ্যান্ট খুলে ন্যাংটো হয়ে সৌমেন মাঝেমাঝেই রাত্রিবেলা তার সামনে দাঁড়িয়ে নানান কসরত দেখায় নিজেকে। সেদিন সবকটা আলো জ্বেলে জামাকাপড় খুলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সৌমেন দেখে তার পিঠে খানিক জায়গা জুড়ে কেমন ফ্যাকাশে মতন মেরে রয়েছে। জোরে জোরে তার ওপর চুলকোতে খানিক মরা চামড়া উঠে আসতে লাগল। সৌমেন অবাক হয়ে দেখল, তার নীচে কুঁচকে জড়োসড়ো হয়ে থাকা একজোড়া ডানা।

দেখে সৌমেনের ভয়টয় লাগল না। শুধু একটু অবাক লাগল। খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে সাবধানে ডানাদুটোকে একটু একটু নাড়াতে চেষ্টা করল। দেখা গেল, তারা তার ইচ্ছেতে সাড়া দিচ্ছে। দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে দেখা গেল আড়ে আট আট ষোল ফুট । এর ফলে সেই ছোটো ঘরে আর কোনো জায়গা বাকি ছিল না। আয়নায় নিজেকে ভালো করে দেখে নিয়ে সৌমেন ডানাটানা ভাঁজ করে সে রাত্রের মতন ঘুমিয়ে পড়ল।

এর পর থেকে ভোরবেলাটা সৌমেন অন্য কাজে লাগাতে শুরু করল। সকালে উঠেই মুখটুখ ধুয়ে নিয়ে সে চলে যেত রেলইয়ার্ডের দিকে। সেখানে লোকজন বিশেষ থাকে না। রেলইয়ার্ড পেরোলেই একলপ্তে অনেকটা ফাঁকা জমি আছে। সৌমেন সেইখানে গিয়ে সকাল দশটা অবধি ওড়া প্র্যাকটিস করে এসে ডিসপেনসারির তালাটালা খুলত। কাজটা বেশ কঠিন। ডানা ঝাপটালে আকাশে উঠে পড়া যায় বটে কিন্তু তার পর তাল সামলানোটা জটিল কাজ। পাখিদের বা বাদুড়দের একটা সুবিধে আছে, তারা অন্য পাখি বা বাদুড়দের দেখে কসরতগুলো শিখে ফেলতে পারে। তা ছাড়া তাদের ওড়বার সময় ভারসাম্য রাখবার জন্য আরও নানা যন্ত্রপাতি আছে। শরীরগুলোও পাখির মত হালকা। কিন্তু সোমেনের এইসব সুবিধে না থাকবার দরুণ তাদের মতন করে ওড়ার কায়দা শিখে ফেলবার উপায় ছিল না।

তবে চেষ্টায় কী না হয়। মাসখানেকের মধ্যে সৌমেন দেখা গেল বেশ ভালোই ওড়াউড়ি করতে পারছে। ততদিনে শহরের লোকজনও ব্যাপারটা জেনেছে। খবরের কাগজে ছবিটবি ছেপে দু-একদিন হল্লা হবার পর দুটো নতুন ধর্ষণ বাজারে আসতে সৌমেনের খবরটা চাপাও পড়ে গেছে। আজকাল চারপাশে এত আশ্চর্য সব ঘটনা রোজ ঘটে যে লোকজন আর কোনো কিছুতেই বেশিদিন আশ্চর্য থাকতে পারে না।

কিন্তু তবুও তার প্র্যাকটিসের সময় মাঠে স্থানীয় লোকজনের ভালো ভিড় হচ্ছিল রোজ। তাতেও সমস্যা হত না, কিন্তু যখন দেখা গেল, দোকানের খদ্দেররা ওষুধের চেয়ে তার ডানা নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ছে তখন ডাক্তার সৌমেনকে একদিন ডেকে বললেন যে ডানা ধুয়ে জল খেলে তাঁর দিন চলবে না। ওসব ফক্কিকারি অনেক হয়েছে। সৌমেন এবার ডানাদুটো কেটে ফেলার বন্দোবস্ত করুক। হিঙ্গলগঞ্জে চেনা এক ডাক্তার আছে তাঁর। ফোঁড়াটোঁড়া কাটায় পাকা হাত। সে-ই বাড়িতে এসে অপারেশন করে দিয়ে যাবে। খরচখরচা ডাক্তারের। সৌমেন সেটা পরে গতরে খেটে উশুল দেবে। যদ্দিন উশুল না হয় তদ্দিন মাইনে পাবে না, তবে খাওয়াদাওয়া ফ্রি।

প্রস্তাবটা যে খারাপ তা ডাক্তারের অতিবড়ো শত্রুও বলবে না। সৌমেন রাজিও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার পরদিন সকালবেলা রেল ইয়ার্ড থেকে আকাশে উড়ে একটা স্পিড লিংকের মালগাড়ির সঙ্গে রেস দিতে দিতে হঠাৎ তার মনটা ঘুরে গেল।

ডিসপেনসারি খুলতে সে ডাক্তারকে গিয়ে বলল, সে প্রস্তাবে রাজি নয়। ডাক্তার অতএব তাকে বাকি মাইনেটুকু বুঝিয়ে দিয়ে জবাব দিলেন।

কাজ চলে যেতে সৌমেনের এ শহরটা থেকে মন উঠে গেল। এমনিতেই এখানকার লোকজন তাকে একটা কিম্ভূত জন্তু বলেই ভাবে। সেই যে মেলাটেলায় মাকড়সামানব-টানব এনে দেখায়, ভাবে সেইরকম একটা কিছু হবে। পথে বেরোলে ছেলেপুলের দল চলে তার পেছনপেছন। কাজটা যদ্দিন ছিল তদ্দিন তবুও সেসব সয়ে গেছে। কিন্তু এখন খালি পেটে আর সেসব উৎপাত তার সয় না। শেষমেশ তিতিবিরক্ত হয়ে সৌমেন ঠিক করল এ জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে সে অন্য কোথাও একটা চলে যাবে। সেখানে তাকে কেউ অত চিনবে না। ডানাদুটো পিঠে ভাঁজ করে রেখে ওপরে একটু ঢোলা জামা পরে সাধারণ কোনো কাজকর্ম ধরে নেবে।

সেদিন রাতে তৈরি হয়ে নিয়ে সৌমেন আকাশে উড়ে গেল। অন্যান্যদিন যেমন নীচে নীচে ওড়ে, সেদিন আর সেরকম নয়। আকাশে উঠে ডানা ঝাপটে সৌমেন সোজা চলল ওপরের দিকে। আকাশে বর্ষার মেঘ ছিল। মেঘ ছাড়িয়ে উঠতে পায়ের নীচে পৃথিবীটা একেবারে বদলে গেল তার। সেখানে তখন থালার মতো চাঁদ উঠেছে একটা। তার দুধসাদা আলোতে সৌমেনের নীচে দ্রুত সরে যেতে থাকা মেঘের স্তর সমুদ্রের মতো ছড়িয়ে ছিল।

। ২ ।

ইছামতি পেরিয়ে আরও খানিকদূর গিয়ে বাণীপুর নামে একটা গঞ্জ মতন আছে কালিন্দীর ধারে। বছর চল্লিশেক আগেও এখান অবধি বাঘ আসত নাকি। এখন অবশ্য পাকা রাস্তা হয়েছে। বাঘের মতন ডাক ছেড়ে লরিটরি যায়। জমজমাট বাজার বসে গেছে। মোবাইল ফোনের টাওয়ারও আছে। লোকজনের ভিড়ভাট্টা মন্দ নয়। সৌমেন এইখানে এসে ঠাঁই নিল। ডানাদুটো পিঠের সঙ্গে বেঁধে রাখে সবসময়। লোকসমক্ষে গায়ের জামা কখনো খোলে না। উঁচু হয়ে থাকা পিঠটা একটু ঝুঁকিয়ে লটরপটর করে হাঁটেচলে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে জন্ম থেকেই পিঠটা তার বাঁকা।

অবশ্য এসব এলাকায় সেই নিয়ে কারও বিশেষ মাথাব্যথা নেই। গঞ্জ এলাকা। হাজার কিসিমের লোকের ভিড়। কে আর কার অত খবর রাখে! ওদিকে, দেখতে কুঁজো হলে কী হয়, সৌমেন কাজের ছেলে। চুরিটুরি করে না। একটু-আধটু লেখাপড়াও জানে। ফলে কাজ তার একটা জুটেই গেল একটা ভাতের হোটেলে। হোটেল চলে সকাল থেকে রাত দশটা অবধি। সৌমেন কাউন্টারে বসে হিসেব রাখে। তার শ্যেনচক্ষুকে এড়িয়ে কারও একদলা ভাতও বেশি খেয়ে যাবার জো নেই নগদ না দিয়ে। মালিক বেজায় খুশি তার ওপর।

তবে মাঝে মাঝে সৌমেনের পিঠে ব্যথা হতো বড়ো। ঘাড় গুঁজে ক্যাশবাক্সের হিসেব মেলাতে মেলাতে হঠাৎ হঠাৎ সে টের পেত, পিঠের ওপর ডানাদুটো তিরতির করে কাঁপছে, ঠিক যেমন চোখ নাচে তেমনি। কয়েকবারের অভিজ্ঞতা থেকে সৌমেন বুঝে ফেলত এইবারে একটু ডানা না ছড়ালে তার ব্যথা উঠবে। সে বড়ো মারাত্মক ব্যথা। পিঠের থেকে শুরু হয়ে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দিয়ে যেন একটা লোহাকাটা করাত চালাতে থাকে কেউ। একবার উঠলে রাতভর তাকে জ্বালিয়ে একেবারে কাহিল করে দেয়। সৌমেনের তখন আর না উড়ে নিস্তার নেই। সেইসব দিনগুলোতে রাত গভীর হলে সৌমেন একা একা বের হয়ে পড়ত। গঞ্জের পাশেই কালিন্দী নদী। তার ওপারে কয়েক মাইল ছিটে জঙ্গল। তার পরেই ঘন বন। অন্ধকারের মধ্যে ডানা মেলে সৌমেন উড়ে যেত সেই জঙ্গলের দিকে। ওদিকে কারও তাকে দেখে ফেলবার ভয় নেই। কখনো অন্ধকারের মধ্যে, কখনো দুধসাদা চাঁদের আলোয় সারা আকাশ জুড়ে বড়ো বড়ো ডানার ঝাপট মেরে উড়ে বেড়াত সে। মাঝে মাঝে কোনো গাছের উঁচু ডালের ওপর বসে একটু বিশ্রামও নিয়ে নিত। সে রাতগুলো তার বুকের ভেতরটা একেবারে ফুরফুরে হয়ে যেত। কেউ টের পেত না।

তবে কথায় বলে কি না, চাঁদসদাগরের লোহার ঘরেও একটা ফুটো ছিল। সেই পথে কালনাগিনী এসে লখিন্দরকে কামড়ে গেছিল। তা সৌমেনের সব সাবধানতার মধ্যেও একদিন একটা ফুটো পেয়ে যে এসে ঢুকে পড়ল সে কালনাগিনী-টাগিনী কিছু নয়, নিছক একজন মেয়েমানুষ। ব্যাপারটা সে সৌমেনের গোচরে আনল একদিন দুপুরবেলা। আড়াইটে মতন বাজে তখন। বাজারের লোকজনের খাওয়াদাওয়ার হল্লা কমে এসেছে। হোটেল মোটামুটি ফাঁকা। আগের রাতটা সৌমেন উড়তে গেছিল। ফিরতে ফিরতে ভোর হয়ে গেছে। ভিড়ভাট্টা না থাকায় সে তখন ক্যাশবাক্সের সামনে বসে একটু ঢুলে নিচ্ছে। এমন সময় কানের কাছে কে যেন ডেকে উঠল, "এই যে নাগর। রাতটা কার কুঞ্জবনে জেগে এলে গো?"

সৌমেন ধড়মড় করে মুখ তুলে দেখে করালী মণ্ডলের মেয়ে এসে ক্যাশবাক্সের কোনাটা ধরে দাঁড়িয়েছে। বয়েসে তারই কাছাকাছি হবে। ঢলোঢলো যৌবন। করালী তাকে বিশেষ খেতে-পরতে দিতে পারে না, তবু গতরের চকচকানি কম নয় মেয়ের। লোকে অবশ্য সে নিয়ে নানা কথা বলে থাকে। করালী বা তার মেয়ের তাতে বিশেষ হেলদোল নেই।

সৌমেন মুখটাকে বেঁকিয়ে বলল, "কাজের সময় কেন বাজে কথা কইতে এলি বল তো মালতী?"

সে মুখ নেড়ে বলল, "ও মা। একটু রসের কথা কইলে বাজে কথা হয়ে গেল বুঝি? আমি বলে এলুম দুটো মাছমাংস খেতে, তা উনি আবার—"

"ইশ! খাবার খুব শখ যে! চিকেন তো দূরে থাক, ফিশমিলের দাম জানিস?"

"সে আমার জেনে কী কাজ? খাওয়াবে তো তুমি।"

সৌমেন আকাশ থেকে পড়ল, "আ-আমি?"

"হ্যাঁ গো নাগর," এই বলে সৌমেনের মুখের কাছে মুখটা নিয়ে এসে সে বলল, "ঘাটের পাশে ঘর। ভোরবেলা বাগদার মীন ছাঁকতে কালিন্দীতে যাব বলে দোর খুলেছি তখনই দেখলাম গো। দেব পাঁচজনের সামনে হাঁড়ি ভেঙে?"

সৌমেনের বুকটা ধড়াস করে উঠল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "থাম থাম," তারপর টেবিলবয় মৃগেনকে ডেকে বলল, "একে একটা চারাপোনার ফিশমিল দিয়ে দে তো মৃগাঙ্ক। আমার নামে বিল করে দিস।"

সেদিন রাত্রিবেলা গাঁজার আসরের শেষে লোকজন চলে গেলে শুতে যাবার আগে পাশের খাট থেকে মৃগাঙ্ক তাকে বলল, "সৌমেনদা, তোমায় ভালো কথা বলি। ওই ছেনালের চক্করে যেন ভুলেও পোড়ো না তুমি। সাতঘাটের জল খাওয়া মেয়েমানুষ—"

সৌমেন কোনো উত্তর দিল না। মেয়েটা তাকে ভয় দেখিয়ে তার পয়সায় খেয়ে গেল আজকে। তাতে তার রাগ তো হবারই কথা। কিন্তু কী আশ্চর্য, সৌমেনের সব রাগ ছাপিয়ে মনের ভেতর একটা আনন্দ তিরতির করে কাঁপছিল। মেয়েটা তাকে উড়তে দেখেছে! তার পরেও তার সঙ্গে কেমন মিঠে হেসে হেসে নাগর বলে ডেকে কথা বলছে! মালতীর নাকে একটা ঝুটো সোনার নাকফুল আছে। সেদিন সৌমেন সেটা একেবারে নিজের মুখের কাছ থেকে দেখেছে। মালতীর মুখে ঘাম, মৌরিভাজা আর পাউডারের মেলামেশা গন্ধ ছিল। সে কথাটা মনে পড়তেই সৌমেনের শরীরটা একেবারে গরম হয়ে গেল।

এর পর থেকে মাঝে মাঝে মালতী এসে দাঁড়াত তার ক্যাশবাক্সের পাশে। সৌমেন কিছু না বলে ইশারায় ভেতরের টেবিলের দিকে দেখিয়ে দিত। বরাদ্দ ওই একই। চারাপোনার মিল। বিল জমা হত সৌমেনের খাতায়। মালতী শুকনো লঙ্কার বাটা দেওয়া ঝোল দিয়ে ভাত মেখে হুসহুস করে খেত আর তার দিকে চেয়ে দেখত।

গাঁগঞ্জের ব্যাপার। কোনোকিছুই কারও নজর এড়ায় না। কয়েকদিনের মধ্যেই বাজারে খবর হয়ে গেল, কুঁজো সৌমেন মালতীর নতুন নাগর হয়েছে। মালতী তার মাথায় হাত বুলিয়ে খুব খাওয়াদাওয়া করছে। তাতে অবশ্য লোকজন বিশেষ অবাক হল না। বাজারে মালতীর অনেক নাগর। ওই করেই তার ভাতকাপড়ের অভাব ঘোচে। মৃগাঙ্ক এখন মাঝে মাঝেই সৌমেনকে চোখ টিপে বলে, "তা এত যে খাওয়াদাওয়া করাচ্ছ, তার দাম উশুল করছ তো, না কী? না করতে ইচ্ছে যায় যদি তো বলো, আমিই না হয় তোমার হয়ে, হে হে—"

দিনকয়েক পরে আবার একদিন সৌমেনের ডানা তিরতির করতে শুরু

করল। অতএব রাত বারোটা নাগাদ মৃগাঙ্ক ঘুমুলে সে উঠে নিঃশব্দে বাইরে বের হয়ে কালিন্দীর দিকে চলল। পথে বের হয়েই খেয়াল হল, মালতী বলেছিল তার ঘর কালিন্দীর ঘাটের পাশে। মেয়েটার চোখ বড়ো সেয়ানা। কথাটা খেয়াল হতেই সৌমেন একটু থমকালো। অন্য রাস্তায় যাবে নাকি আজ! কিন্তু তারপর ফের কী ভেবে ঘাটের রাস্তাটাই ধরল আবার।

মালতীদের ঘরটা একেবারেই ঘাটের লাগোয়া। কালিঢালা অন্ধকারে গুটিকয়েক ঝোপমতো গাছপালার ফাঁকে একটেরেতে দাঁড়িয়ে। তার কাছাকাছি যেতে হঠাৎ সৌমেনের চোখের ওপর ভেসে উঠল, ঘরটার মধ্যে মালতী শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। গায়ে জামা নেই। শুধু ফেরতা দেওয়া কাপড়। বুকদুটো উঠছে নামছে। মুখে মৌরির গন্ধ—

পায়ে পায়ে কখন যে ঘরটার দিকেই এগিয়ে গেছে সৌমেন সে কথা তার নিজেরও খেয়াল ছিল না। যখন খেয়াল হল ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। তার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে একখানা ডানা চেপে ধরে মালতী ফিশফিশ করে বলছিল, "ঠিক জানতুম একদিন না একদিন ফের বেরোবে রাত্তিরে। সেই সেদিন থেকে তক্কে তক্কে আছি। তা আকাশে না উড়ে এখানে জানালায় উঁকি মারছ কী মতলবে? লোকজন ডাকব? উড়ে ভাগতে পাবে না নাগর। ডানা চেপে ধরে আছি। ডাকি?"

তবে সত্যি সত্যি লোকজন ডাকবার মতলব যে মালতীর ছিল না সেটা তার নীচু ফিসফিসে গলাতেই মালুম হচ্ছিল। মালতীর হাতের টান বেজায় আলগা। সৌমেন ইচ্ছে করলেই এক ঝটকায় তার হাত ছাড়িয়ে উড়ে পালাতে পারত। কিন্তু সে করতে তার মন সরল না। উলটে হঠাৎ এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে দুহাতে মালতীকে বুকের ভেতর সাপটে ধরে বলল, "এইবার? লোক ডাকবি না? ডাক দেখি? আসতে আসতেই তোকে নিয়ে—"

মালতী তার চোখের দিকে চোখ রাখল একবার। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না বটে, তবে সৌমেন টের পাচ্ছিল চোখদুটো তাকে ছুরির মতো বিঁধছে। হঠাৎ গোটা শরীরটা দিয়ে সাপের শঙ্খ লাগবার মতন তাকে পাকিয়ে ধরে মালতী চিৎকার করে উঠল, "ও বাবা গো, মেরে ফেলল গো— কে কোথা আছো—"

সৌমেন আর একমুহূর্ত দাঁড়াল না। মালতীকে বুকের কাছে ধরে রেখেই ডানাদুটো খুলে বড়ো বড়ো ঝাপটায় বাতাসে ভেসে উঠে সোজা পুবমুখো চলল কালিন্দীর ওপর দিয়ে।

কাটার খালের দোয়ানির মধ্যে নতুন চর উঠেছে একটা। আড়েদিঘে হাত তিরিশেক বড়োজোর। তার বালির নীচে নতুন পলির গর্ভসঞ্চার হয়েছে সবে। আধখাওয়া চাঁদের আলোয় ইতিউতি ঠেলে উঠতে থাকা ঝোপঝাড়ের অবয়ব চোখে পড়ে। শঙ্খলাগা মানুষদুটো সেই নতুন মাটিতে এসে নামল। মালতীর গোটা শরীরটা

তখন ভালো বাজিয়ের মতই আগুনে সুর তুলেছে অনভিজ্ঞ সৌমেনের তাজা শরীরে-

—ক্লান্ত, ঘুমন্ত মানুষটার শরীরে মরা আলো ছড়িয়ে দিয়ে চাঁদ অস্ত গেল একসময়। মালতী জেগে ছিল। অল্প দূরেই কোথাও কোনো বন্য জন্তু জল খেতে নেমেছে। শেষরাত্রের মৃদু হাওয়ায় তার শরীরের বুনো গন্ধ পাওয়া যায়। মালতীর ভয় লাগছিল না। কত দোপেয়ে বাঘই তো তার মাংস খেল সেই চোদ্দো বছর বয়স থেকে। এখন একটা চারপেয়ে এসে তার চেয়ে বেশি আর খাবে কী?

তলপেটে ব্যথা করে দিয়েছে একেবারে দামাল ছেলেটা। মালতী সেটাকে গ্রাহ্য করল না। অমন কতই হয়। তার অভ্যাস আছে। অন্যমনস্কভাবে পেটের ওপর একবার হাতটা বুলিয়ে নিল সে। ওখানে কেউ একটা আছে। মাসদেড় হয়ে গেল বোধ হয়। সুবলের? নাকি আর কারও? মাঝে একদিন তুলে নিয়ে গেল সুবল ক'দিনের জন্য। নেউপাড়ার দিকে ওর একটা ঘাঁটি আছে জঙ্গলের ভেতর। বড়ো কোনো দাঁও মারলে কী লাশটাশ ফেললে ওখানে গিয়ে লুকোয়। দিন সাত সঙ্গে করে রাখল। খাইয়েছে-দাইয়েছে ভালো। টাকাও দিয়েছে কিছু। বদলে চারজন মিলে গোটা হপ্তা ধরে খরচা উশুল করেছে। এ মাসে শরীর খারাপ হল না মালতীর। খালি বমি-বমি ভাব। গা ভারী ঠ্যাকে। লক্ষণগুলো তার অজানা নয়। হঠাৎ পাশ ফিরে সদ্য পুরুষ হয়ে ওঠা কিশোরটির সরল, ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে দেখল সে। ঠান্ডায় কুঁকড়ে আছে। নাঃ। পেট খসাবার দরকার হবে না আর। সব ঠিক আছে। পায়ের কাছ থেকে পরণের কাপড়টা তুলে এনে সৌমেনের গায়ের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে নিজের গায়েও ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ল মালতী। সৌমেন ঘুমের মধ্যেই বিড়বিড় করে কী যেন বলে হাসল একটু। দেয়ালা করছে।

***

করালী চোখ কুঁচকে সৌমেনের দিকে আপাদমস্তক দেখল একবার। তারপর মুখের খৈনিটা থু থু করে ফেলে দিয়ে বলল, "শালা কুঁজোর আবার নাগরালির শখ! আমার মেয়েটাকে ফুসলে নিয়ে গিয়ে সব্বোনাশ করলি, এবার তার ম্যাও সামলাবে কে? বেওয়ারিশ মাল ভেবেছিলিস নাকি শালা? আজ তোর একদিন কী আমার—"

"আহা অত উত্তেজিত হবার কী আছে করালী? মাথা ঠান্ডা করো। একে মারধর করে কি তোমার মেয়ের ঝামেলা ঘুচবে? তার চেয়ে বরং আমি বলি—" পঞ্চায়েত প্রধান মন্মথ সেন মাথা নাড়াচ্ছিলেন। তাঁর গলার স্বর শান্ত এবং আদেশ অমোঘ। তাঁর ঠাকুরদাদা বাণীপুরের জমিদার ছিলেন। তিনিও তাই আছেন। শুধু পদনামটা বদলেছে এই যা।

ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা মালতীর দিকে তাকিয়ে মন্মথ এবারে প্রশ্ন

করলেন, "তোর বাপ যা বলছে তা সত্যি?"

মৃদু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল মালতী। সৌমেন দেখতে পেল না। সে মাথা নীচু করে বসে ছিল এক কোণে। সেই রাতটার পর মাস দুয়েক কেটে গেছে। মালতী আর এদিকে পা বাড়ায়নি। আর তারপর আজ সকালবেলায় হঠাৎ একেবারে এতবড়ো পেট নিয়ে বাপের সঙ্গে এসে—

"তা, মৃগাঙ্ক যা বলল তাতে এ ছোঁড়া রাতে মধ্যে মধ্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেত। একেবারে রাত কাটিয়ে তারপর ফিরত। তুমিও তো বললে মেয়েও তোমার মাঝেমাঝেই বেরিয়ে যেত রাতে। এখন কেলেঙ্কারি যখন একটা হয়েই গেছে আর তোমার মেয়ে সে কথা স্বীকারও করেছে তখন সে নিয়ে আর জল ঘোলা না করে মেয়ের কপালে একথাবা সিঁদুর পরিয়ে দাও ছোকরাকে দিয়ে। ঝামেলা চুকুক। কিন্তু একটা কথা, এলাকার মধ্যে মারধর হুজ্জুতি চলবে না, আর তোমার মেয়ে বা এই ছোকরাকে কাল থেকে গ্রামের ত্রিসীমানায় যেন না দেখি। সেক্ষেত্রে জনগণ আইন নিজের হাতে তুলে নিলে আমায় দোষ দিয়ো না।"

রায় দান করে মন্মথবাবু উঠলেন। ব্যস্ত মানুষ। তাঁর বিস্তীর্ণ রাজত্বে আরও বহুতর সমস্যা তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

। ৩ ।

অতএব সৌমেন মালতীকে নিয়ে বাণীপুর ছেড়ে ফের রওনা হল। টাপুরে নৌকায় ভাটায় তিন জো চার ভাটির পথ। যাবে বাঁড়ুজ্জের বিল। বিয়ের পর করালীই খবরটা দিয়েছিল। বলে, "এ এলাকায় যা গন্ধ ছড়িয়েছ বাবাজি তাতে খানিক দূরে চলে যাওয়াতেই তোমাদের মঙ্গল।"

আসলে কুঁজোটাকে ঘরজামাই করে ধোঁকার টাটি সাজিয়ে মেয়েকে দিয়ে ব্যাবসাবাণিজ্য চালিয়ে যাবারই মতলব ছিল করালীর। কিন্তু ঘটনা হল, সিঁথেয় সিঁদুর পরে মালতীর সাময়িক মনোবিকলন ঘটেছিল হঠাৎ করে। করালীর প্রস্তাবটা শুনেই সে একেবারে ফোঁস করে উঠল। সে করালীর অনেক হাঁড়ির খবর রাখে। বাপ বলে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধাও করে বলে অতিবড়ো শত্রুতেও বলবে না। রেগে গেলে ফাঁসিয়ে দিতে কতক্ষণ। অতএব মানে মানে বিদেয় করাই ভালো।

সৌমেনেরও আর বাণীপুরে থাকবার ইচ্ছে ছিল না কোনো। বলেছিল মালতীকে নিয়ে উড়েই রওনা দেবে। কিন্তু মালতী তাতে রাজি নয়। বলে, "ওসব পাখিগিরি আমার সংসারে আর চলবে না তোমার এই বলে দিলাম। থাকতে হলে বউবাচ্চা নিয়ে আর দশটা মানুষের মতন করে থাকবে।" আর তার পরেই সৌমেনকে একেবারে

জড়িয়ে ধরে নিজের আদেশটাকে এমন সুস্বাদু করে তুলেছিল সে যে সৌমেনের কিছুই বলবার ছিল না।

বাঁকুড়ার বিল জায়গাটা খারাপ নয়। নতুন পত্তনি হয়েছে। রাস্তাঘাট এখনও কাঁচা। লোকজন জমেছে ভালই। এইখানে এসে সৌমেন কয়েকটা হোমিয়োপ্যাথিকের জল, গুলি আর একটা চটি বই জোগাড় করে নিয়ে ডাক্তার হয়ে বসল। জ্বরেসর্দিতে রাসটক্স, পেটখারাপে নাক্স ভমিকা আর পড়েটরে গেলে আর্নিকা। ধ্যাদ্ধেরে অজ আবাদ এলাকায় ওইটুকু পেয়েই লোক ধন্যি ধন্যি করে।

বিয়ের ছ'মাসের মাথায় মালতীর ছেলে হল। সৌমেনের সে নিয়ে হেলদোল হল না বিশেষ। দুনিয়াদারির জ্ঞান তার এমনিতেই কম, আর তার ওপরে সে তখন মালতী আর নতুন ডাক্তারির নেশা, এই দুয়ে মজে আছে একেবারে।

আর একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মালতীকে বিয়ে করবার পর থেকে তার পিঠের সেই তিরতিরে ব্যথাটা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। মালতী তাকে একটা ক্যাম্বিশের খোল খুব কায়দা করে সেলাই করে দিয়েছে। জামার মতন বুকেপিঠে পরে নিয়ে বোতাম এঁটে দিলে ডানাদুটো আঁটোসাঁটো হয়ে লেপটে থাকে পিঠের সঙ্গে। ওতে করে চলাফেরার অস্বস্তিটা অনেকটাই কমে গেছে। পিঠটাও আর অত বেঢপ লাগে না। কয়েকদিন যেতে না যেতেই খোলটায় তার এমন অভ্যাস হয়ে গেল যে দিনেরাতে সবসময়েই ওটা পরে থাকতে তার আর কোনো অস্বস্তিই হয় না।

বছরদুয়েক বাদে একদিন রাত্রে আদর খেতে খেতে মালতী হঠাৎ বোতাম খুলে ক্যাম্বিশের খোলটা সরিয়ে তার ডানাদুটোয় হাত দিয়ে খিলখিল করে হেসে বলে, "ওমা, কেমন শুকিয়ে এসেছে, দেখো, দেখো—"

সৌমেন তাড়াতাড়ি তার ওপর থেকে উঠে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পিঠ বেঁকিয়ে দেখে, সত্যি সত্যি ডানাদুটো কেমন কুঁকড়ে ছোটো হয়ে এসেছে। নাড়াতে গিয়ে দেখে তখনো নাড়াতে পাড়ছে বটে, কিন্তু তেমন জোর পাচ্ছে না আর। তারপর ফের বিছানায় ফিরে গিয়ে শুতে মালতী তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, "বাঁচলাম। এইবারে একদিন মাখনকে দিয়ে ওদুটো কাটিয়ে ফেলে দেব। শুকিয়ে গেছে তো! বেশি লাগবে না। নইলে শীতগ্রীষ্ম ওই মোটা খোলস পরে থাকা দিনরাত—"

মাখনের ওপর মালতীর এখন অগাধ ভরসা। ছোকরা সৌমেনের ডিসপেন্সারির অ্যাসিস্ট্যান্ট। কাজ শিখছে তার কাছে থেকে। চটপটে আছে বেশ। দরকারে রোগির নাড়িটাড়ি দেখে দেয়, ওষুধও বলে দেয় অনেকসময়। সৌমেন বাইরে বাইরেই ব্যস্ত থাকে বেশি। বাড়ির যাবতীয় কাজেকর্মে অতএব মাখনই এখন মালতীর ভরসা। দুনিয়াদারির জ্ঞানও তার প্রখর। সাজোয়ান ছেলে। অবরেসবরে মালতী তাকে তাই একটু-আধটু কৃপাও করে থাকে আজকাল। তাতে অবশ্য দোষ নেই। সামলেসুমলে চললেই হল।

সৌমেন অবশ্য মালতীর প্রস্তাবে রাজি হল না। ডানাদুটো শুকিয়ে গেছে যাক। কিন্তু তাই বলে সেদুটোকে কেটে বাদ দিতে তার মোটেই মন করছিল না। মৃদু হেসে সে বলল, "ছেঁড়াকাটা করে অঙ্গহানি আর নাই-বা করলাম মালতী। ও যেমন শুকিয়ে উঠেছে তাতে আর কদিন বাদে নিজেনিজেই ঝরে যাবে দেখো।"

***

ডানাদুটো কিন্তু ঝরল না। কুঁকড়েমুকড়ে লেপটে রইল পিঠের সঙ্গেই। এইভাবে আরো বছর পনেরো কাটতে সৌমেন মোটামুটি সে দুটোর অস্তিত্বই ভুলে গেল একরকম। সেটাই স্বাভাবিক অবশ্য। ছেলে বড়ো হচ্ছে। পশারও বাড়ছে। মাখনের বুদ্ধিতে নৌপট্টি আর ঢাকির দুটো বাজারে দুখানা চালাঘর নিয়েছে সে বিশ বিশ চল্লিশ হাজার সেলামি দিয়ে। হপ্তায় চারদিন কেটে যায় সেই দুই ডিসপেনসারিতে ঘুরে ঘুরে প্র্যাকটিশ করে। বাকি তিনদিনও বাড়িতে থাকে সে নামমাত্রই। বাঁড়ুজ্জের বিলের ডিসপেনসারি সেসময় তার দিনরাত ভিড়ে ভিড়াক্কার থাকে। অবশ্য বাড়ি নিয়ে মালতী তাকে বিশেষ জ্বালায়ও না। মাস গেলে ঝনাৎ করে হাজার কয়েক টাকা তার হাতে ফেলে দিলেই হল। বাকিটা মাখন সামলে নেয়। লোকে বলে, কুঁজো সৌমেনের বেস্পতি তুঙ্গে।

এই সময় একদিন হঠাৎ করে তার ডানাদুটোর কথা ফের মনে পড়ে গেল একটা অঘটন ঘটে। নৌপট্টি জায়গাটা ইদানীং বেশ জমজমাট গঞ্জ হয়ে উঠেছে। গঞ্জের একটেরেতে খোকা সামন্ত আট-দশটা ঘর নিয়ে একটা মাইফেলের আড্ডা বানিয়ে হইহই করে ব্যবসা চালু করে দিয়েছে। নৌপট্টিতে চেম্বার থাকলে সৌমেন মাঝে মাঝে এখানে এসে রাতটা একটু ফুর্তি করতে যেত খোকার আড্ডায়। বসবার জন্য কোন বাঁধা কেউ ছিল না অবশ্য তার। তবে খোকা তার পেশেন্ট। সৌমেন এলে তাকে খাতিরটাতির করে ভালো কোন ঘরে নিয়ে ঢুকিয়ে দিত এক রাতের জন্য। টাকাপয়সা নিয়েও বেশি বাড়াবাড়ি করত না।

এমনি একদিন খোকার আড্ডায় গিয়ে ঢুকতে সে বলে, "কী গো ডাক্তার, নতুন আমদানি ঘোড়া পরখ করে দেখবা নাকি?" তারপর চোখ টিপে বলল, "খাঁটি পক্ষীরাজ গো। একবার চাপলে পরে আর অন্যে মন উঠবে না দেখো।"

সৌমেন মাথা নেড়ে হেসে বলল, "তা, তুমি নিজে সুপারিশ করছ যখন খোকা তখন তো একটু দেখতেই হয়—"

মেয়েটা সত্যিই বেশ তেজি। মন ভালো হয়ে গেল সৌমেনের। ঘণ্টাখানেক কসরতের পর তার পাশে শুয়ে শুয়ে হাঁফাচ্ছে এমন সময় হাতপাখা নিয়ে তাকে বাতাস করতে করতে মেয়েটা বলে, "উঃ! এই গরমে গায়ে একটা ক্যাম্বিশের খোল

বেঁধে রেখেছ কেন গো? এসো খুলে দি। আরাম পাবে।"

বলতে বলতে মেয়েটা সৌমেনের ক্যাম্বিশের খোলের বোতামে হাত দিতে যাচ্ছিল। সৌমেন একটা ঝটকা মেরে তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, "খবরদার। ওতে হাত দিবি না একদম।"

মেয়েটা এইবার একটু চুপ করে থেকে তারপর বলল, "ওইখানে কী আছে আমি জানি।"

সৌমেন একটু সতর্ক গলায় বলল, "কী আছে?"

মেয়েটা উত্তর না দিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘরের আলোর সুইচটা টিপে দিল। তারপর তার কোল ছেড়ে উঠে বসে পেছন ঘুরে বলল, "আমার পিঠটা একবার দেখো।"

বালবের কর্কশ, হলদেটে আলোয় তার খোলা পিঠটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সৌমেনের বুকের ভেতর একটা কাঁপুনি ছড়িয়ে গেল। দুটো দীর্ঘ, গভীর ক্ষতচিহ্নের শুকনো দাগ মেরুদণ্ডের দুপাশ দিয়ে লম্বালম্বি ওপর থেকে নীচের দিকে নেমে এসেছে।

উলটো দিকে মুখ করে রেখেই মেয়েটা বলল, "আমার যা ছিল তোমার তা এখনও আছে, তাই না?"

এইবারে সৌমেন আয়নায় মেয়েটার ছায়ার দিকে ভালো করে ঘুরে দেখল। তারপর নীচু গলায় প্রায় ফিশফিশ করে বলল, "দুলদুলি— তুই— এখানে কী করে?"

"কী করে আবার? যা হয়। আমার বর আর পিলুমাসি মিলে দরদস্তুর আগেই ঠিক করে রেখেছিল। সিঁথেয় সিঁদুর দিয়ে বোম্বে নিয়ে গিয়ে দুদিন ফুর্তি-টুর্তি করে তারপর কামাথিপুরার একটা কোঠিতে তুলে দিয়ে এল দুজন মিলে।"

"অ। তার মানে এ লাইনে অনেকদিন আছিস? ভালো। কিন্তু তোর পিঠে—"

"বলছি। কামাথপুরাতে বছরদুয়েক থাকবার পর হায়দার বলে একজন আমায় বাঁধা করে নিয়েছিল। লোকটা গুন্ডামতো ছিল তবে আমায় খুব ভালোবাসত। বলেছিল কলমা পড়িয়ে ঘরে নিয়ে রাখবে। আমারও তখন তোমার মতন পিঠের চুলকুনি বেজায় বেড়ে উঠেছে। তা সে-ই একদিন ভালো করে চুলকে দিতে গিয়ে পিঠের মরা ছাল তুলে দিয়ে ডানাদুটো বের করে আনল। তারপর আমায় ঘুরে ঘুরে দেখে আর বলে, 'তু পরি হৈ। মুঝে ছোড়কে ভাগ যায়েগি।' এই বলে খুব আদরটাদর করে সে আমায় জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু পেটে পেটে যে তার অন্য মতলব ছিল সেটা তো আর বুঝিনি। মাঝরাতে হঠাৎ উঠে পড়ে আমায় কিছু বুঝতে না দিয়েই মুখটা বেঁধে উপুড় করে মাটিতে ফেলে দিয়ে পিঠের ওপর চেপে বসে একটা মাংসকাটা চপার দিয়ে ডানাদুটোর গোড়ায় কোপের পর কোপ মারতে শুরু করল।

"জ্ঞান ফিরতে দেখি হাসপাতালে পিঠে বিরাট ব্যান্ডেজ বেঁধে পড়ে আছি। পরে জেনেছিলাম, কাণ্ডটা নিয়ে খবরের কাগজে বেশ তোলপাড় হয়েছিল। হায়দারকে খুনের দায়ে পুলিশে ধরেছিলো। তার পরির গল্প কেউ বিশ্বাস করেনি। বলেছিল

মাথার গোল হয়েছে। তবে ঘরে অত পালক কী করে এল সেই নিয়ে খবরের কাগজে বিস্তর আলোচনা হয়েছিল। এর পর কামাথপুরাতে বেশ ক'বছর কাটিয়ে আর ভালো লাগল না, তাই দেশে ফিরে এসেছি। আচ্ছা আমায় একটা কথা বলো না, ও ডানা দিয়ে সত্যি সত্যি ওড়া যায়?"

হঠাৎ করে সৌমেনের কী যে হয়ে গেল, সে উঠে বসে এসে দুহাতে দুলদুলিকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে বুকের ভেতর মুখটা গুঁজে দিল। সে পেষণে কাম ছিল না, প্রেম ছিল না, শুধু একজন ডুবন্ত মানুষের হঠাৎ নাগালে আসা খড়কুটোকে চেপে ধরবার আবেগটুকু ছিল। অথবা রথের মেলায় পথ হারানো ছেলেটা যেমন করে পরিচিত মানুষটিকে ফিরে পেয়ে জাপটে ধরে সেইরকম একটা স্বস্তির গন্ধ ছিল। দুলদুলি বুঝতে পেরেছিল। এসব কথা মুখে না বললেও ঠিক বোঝা যায়। আস্তে আস্তে সৌমেনকে কোল থেকে সরিয়ে না দিয়েই সে তার ক্যাম্বিশের খোলটার বোতামগুলো খুলতে লাগল এক-এক করে। তারপর একসময় সেটাকে এক টান মেরে খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সৌমেনের কুঁকড়ে ছোটো হয়ে যাওয়া জীর্ণ ডানাদুটোকে বের করে আনল বাইরে। অসীম ভালোবাসায় তাদের গায়ে খড়খড়ে আঙুলগুলো বোলাতে বোলাতে বলল, "নাঃ, এতে ওড়া যায় না। জোরই নেই কোনো।"

হঠাৎ তাকে একটা ধাক্কায় ঘরের এক কোণে ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সৌমেন। মাথার দুপাশের শিরাদুটো দপদপ করছে তার। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, "কী বললি তুই মাগি? আমি পারি না? আমি পারি না?" তার ডানাদুটোর মধ্যে সেই পুরোনো তিরতিরানির স্মৃতিটা ফিরে আসছিল যেন একটু একটু। টের পাচ্ছিল, গরম রক্তের স্রোত ফের ধেয়ে যাচ্ছে পালকের নীচে লুকনো দুর্বল পেশিগুলোর শিরা-উপশিরা দিয়ে। হঠাৎ একটা প্রাণপণ চেষ্টায় কঙ্কালসার ডানাদুটোর একটা ঝাপটা মেরে মাটি থেকে লাফিয়ে বেশ খানিকটা উঠে গেল সৌমেন, আর তারপরেই সটান আছড়ে পড়ল নীচের শক্ত সিমেন্টের মেঝের ওপর। মুখটা ঘষটে গিয়েছিল তার।

দুলদুলি ছুটে এসে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে রক্তাক্ত গালদুটোকে মুছিয়ে দিতে দিতে বলছিল, "এমন করে না। তুমি উড়তে পারো। সত্যি বলছি। নিজে চোখে দেখলাম তো। তুমি—"

মেয়েরা মায়াবিনী তো হয়ই। আর যে মেয়ের ডানা ছিল এককালে সে তো আরও বেশি মায়াবিনী হবে। দুলদুলির গলার আওয়াজে আর তার হাতের ছোঁয়ায় জাদু ছিল কিছু। সৌমেনের সব রাগ, সব দুঃখ কেমন করে যেন মিলিয়ে গেল একেবারে। চোখদুটো বুজে ভীষণ আরামে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে সে শুধু জড়ানো গলায় বলল, "আমি পারি রে। কায়দাটায়দাগুলো শুধু ভুলে গেছি এই যা। সব মনে পড়ে যাবে আবার। তুই দেখিস—"

ঘুমন্ত মানুষটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখে ঠায় জেগে বসে রইল দুলদুলি। তার পিঠের কাটা দাগদুটোর ভেতরে পুরোনো ব্যথাটা ফের দপদপ করছিল অনেকদিন বাদে। বহুদূরে, অন্য একটা অন্ধকার বারান্দায় বসে বসে মাখন তখন মালতীকে শিখিয়ে দিচ্ছিল কেমন করে সৌমেনকে এইবারে বাড়িটা দোতলা করাবার জন্য রাজি করাতে হবে। এইবারে ছেলেটাকে হোস্টেল থেকে ফিরিয়ে এনে তার বিয়ে দেওয়া দরকার। তার জন্য সব কিছু আলাদা করে বানিয়ে রাখতে হবে আগেভাগেই।

মাখন বড়ো ভালো পুরুষ। মালতীর জন্য গোটা জীবনটাই উৎসর্গ করে রেখেছে সে। মালতীর প্রসাদের টুকরোটাকরার বেশি আর কোনো চাহিদাই তার নেই জীবনে। সৌমেনকেও সে ভালোই বাসে। একটু ন্যালাখ্যাপা মানুষ, কিন্তু মাথার জোরে কেমন রাজ্যপাট বানিয়ে ফেলল এ-দেশে এসে, সেটা সে অনেকের কাছেই গর্ব করে বলে থাকে আজকাল।

। ৪ ।

নৌকোটা ভেসে ভেসে যতক্ষণ চোখে আড়ালে না গেল ততক্ষণ তারা কেউ জায়গা ছেড়ে নড়েনি। জায়গাটার নাম বাঘমারীর চর। জিজ্ঞাসা করতে মাঝিই নামটা বলেছিল। দূর থেকে পাড়ে দু-তিনটে চালাঘর মতন দেখা যায় জলের ওপর থেকে। তারা দুজন যখন বলল এইখানেই তারা নামতে চায় তখন একটু অবাক হয়ে মাঝি বলেছিল, “সে কী? দেবীপুর তক যাবেন বলে নৌকা ভাড়া করলেন যে! এখন মাঝপথে এসে—” আসলে তার চিন্তা হয়েছিল মাঝপথে নেমে গিয়ে গোটা পথের ভাড়াটা আবার ফাঁকি না দেয় লোকটা।

সৌমেন মাথা নেড়ে বলেছিল, “সে কথা ছাড়ো। ভাড়া তুমি পুরাপুরিই পাবা। এখন নাও ভেড়াও তাড়াতাড়ি।” “চলেন তাহলে,” বলে জলের ভেতর লগি ডুবিয়ে পাড়ের দিকে ঠেলতে ঠেলতে মাঝি ফের একবার সতর্ক করে দিয়েছিল, “ওখেনে গ্রামট্রাম কিছু নাই কিন্তু। চালাঘরটর যা দেখতেছেন, ও হল গিয়া মউলেদের ঘাঁটি। মাঝেমধ্যে নৌকা নিয়া চাক ভাঙতে আসে, বা ধরেন গিয়া হোগলা বা গোলপাতা কাটতে এল কেউ। তখন চরে এক দু-রাত কাটায়। সেইজন্য চালা বেঁধে রেখেছে একদুইখান।”

ঘোমটার নীচে থেকে দুলদুলি ইশারায় ঘাড় নেড়েছিল একবার। সৌমেন আর কথা বাড়ায়নি। বলেছিল, “সে নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। ভাড়া পাবে পুরা। এখন লগি ঠেলো তাড়াতাড়ি।”

চালাঘরটায় অনেকদিন কারও পা পড়েনি। ভরা ভাদ্রমাস চলছে। মধুর সময় নয় এটা। আরো বেশ কয়েকমাস এই চরে তৃতীয় কোনো মানুষ আসবে বলে মনে হয় না। সঙ্গে করে আনা পুঁটুলিগুলো একটা চালার মধ্যে বসে খুলতে খুলতে দুলদুলি

ফিক করে হাসল। তারপর বলল, "বাঘ আসলে কী করবা?"

সৌমেনের মুখে জবাবটা এসে যাচ্ছিল, "তোকে বুকে ধরে নিয়ে উড়ে—"

একরকম ঠোঁট কামড়ে জবাবটাকে গিলে ফেলল সে। এখনও তার ডানায় সে জোর ফিরে আসেনি। ক্যাম্বিশের খোলাটা সে নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে এসেছে এখানে এসে ওঠবার আগেই। শুধু পিঠের ওপর নেতিয়ে থাকা ডানাদুটো দুপাশে ছড়িয়ে একটা জোর ঝাপটা দিল সে। তারপর কাঠকুটো জুটিয়ে একটা বড়োসড়ো ধুনি জ্বালাতে বসল। দুলদুলি বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল সে কী বলতে চায়। আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এসে তার ডানাদুটোর গায়ে চুমু খেল সে। ঠোঁটের মধ্যে টের পাচ্ছিল, বহুদিন পরে ভালোবাসার স্পর্শ পেয়ে একটা শিরশিরানি ছড়িয়ে যাচ্ছে দুর্বল ডানাদুটোতে। শিরশিরানিটা সংক্রামিত হচ্ছিল তার সমস্ত শরীর জুড়েও।

***

সঙ্গে করে আনা খাদ্য-পানীয়ের সঞ্চয়টুকু ফুরোতে তাদের বড়োজোর একটা সপ্তাহ কেটেছিল। নিয়মিত অভ্যাসে ততদিনে সৌমেনের ডানায় শক্তি ফিরে এলেও তখনও পুরোপুরি ওড়বার ক্ষমতা ফিরে আসেনি তার। দ্বীপটাতে খাবার যোগ্য কোনো শস্যবীজ বা ফলের গাছ নেই বিশেষ। অতএব সঙ্গের খাদ্য-পানীয় ফুরোতে কাঁকড়া, ক্যাওড়া, বেত ও গোলপাতার ফল এবং নদীর নোনতা জল খেয়ে তাদের দিন কাটতে শুরু করল এর পর। তবে তাতে একদিনের জন্যও সৌমেনের ওড়ার চর্চায় ছেদ পড়েনি। দুলদুলিরও একদিনের জন্য ছেদ পড়েনি তার ডানার যত্নআত্তিতে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত , যন্ত্রণাকাতর ডানাদুটোকে বড়ো আদরে সে পরিষ্কার করে দিত তাদের পরনের পোশাকগুলো থেকে তৈরি কাপড়ের খন্ডগুলো দিয়ে। তারপর সেই কাপড়ে জড়িয়ে তাদের সে উষ্ণতা দিত অনেক রাত পর্যন্ত। অন্ধকারের মধ্যে সে শুনতে পেত ঘুমন্ত সৌমেনের নিঃশ্বাসের শব্দ আর অলক্ষ্যে বন্যজন্তুদের চলাফেরার আওয়াজ। তার ভয় করত না। কেবল সামনে জ্বলন্ত আগুনের ধুনিতে কাঠ গুঁজে দিয়ে তাকে আরও সতেজ করে তুলত সে। আর তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে তার প্রিয় ডানাদের উষ্ণ পালকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ত। সেই যত্নে ও অভ্যাসে ক্রমশই পরিপুষ্ট হয়ে উঠছিল সৌমেনের ডানাদুটো।

এইভাবে প্রায় একমাস পার হবার পর একদিন গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসল সৌমেন। তার পিঠের ডানাগুলোতে সেই আগেকার দিনগুলোর মতো পুরোনো তিরতিরানিটা শুরু হয়ে গেছে ফের। ডানাদুটো তাকে ডাকছে যেন। তার মস্তিষ্কের মধ্যে ফের জেগে উঠছিল আকাশচারণের জন্য দরকারি পেশি সঞ্চালনের কৌশলগুলো। ওড়বার কায়দা এইবারে তার ফের মনে পড়ে গেছে।

দুলদুলি ঘুমিয়ে ছিল তার প্রসারিত ডানার ওপরে গুটিশুটি হয়ে। পালকের উষ্ণ আবরণ থেকে আস্তে আস্তে তাকে বের করে আনল সৌমেন। শেষরাত্রের ঠান্ডায় মেয়েটার খোলা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। ধুনির আগুনটা খুঁচিয়ে তাতে আরও কিছু কাঠ ছুড়ে দিয়ে তার পাশে দুলদুলিকে শুইয়ে দিল সে। তারপর সতেজ ও পুষ্ট ডানাদুটি দুপাশে ছড়িয়ে কোনো এক প্রাচীন, নগ্ন ঈশ্বরের মতন সোজা হয়ে দাঁড়াল সেই অগ্নিকুণ্ডকে সাক্ষী করে। তারপর শুয়ে থাকা মেয়েটি , যে কিনা একদিন নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত হয়েছিল ওড়বার আনন্দ থেকে, তাকে বড়ো আদরে বুকের কাছে ধরে নিয়ে শেষরাত্রের ঘনীভূত বাতাস কেটে উড়ে গেল পাশেই বহমান জলধারার ওপর দিয়ে গভীরতর দক্ষিণের দিকে। সেইখানে নদী ও সমুদ্রের ক্রমাগত মিলনে সৃষ্টি হয়ে চলেছে নতুন পলিমাটির উর্বর, কুমারী দ্বীপমালা। সে-ই তাদের প্রকৃত ঠিকানা হবে।



বর্ষা এল

নির্মলের সঙ্গে বর্ষার প্রথম মোলাকাতের মঞ্চটা আর যেমনই হোক, খুব একটা রোমান্টিক কিছু ছিল না আর আলাপটাও খুব সুবিধের রাস্তায় ঘটেনি।

মোলাকাত ঘটেছিল ঝাউতলার দিকে একটা ব্যস্ত রাস্তার ওপরে। নির্মলের অফিসের সামনে। একটা বাসের দরজার এপার-ওপারে।

ওর আগের দিন রাত্রে নির্মলের শুতে দেরি হয়েছিল। রোজই হয়। মাঝরাত্তিরেই বন্ধুবান্ধব জুটে মোবাইলে আড্ডা-গুলতানিগুলো চলে তো! অতএব পরদিন সকালে আটটা নাগাদ উঠে দাঁত মাজতে মাজতেই সে টের পেয়েছিল বাড়ির গাড়ি বেরিয়ে গেল। বউদি ইচ্ছে করেই হর্নটা জোরে জোরে বাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল যাবার আগে। নির্মল গাড়ি মিস করলে ওটা সে তাকে নিয়ে খিল্লি করবার জন্য করে থাকে। এইটাও প্রায়শই ঘটে থাকে নির্মলের ভাগ্যে।

পৌনে নটায় অফিসের কলটাইম। মালিক-চাকর এক রুল। অফিসের লোকজন আড়ালে বলে ভীমরুল। নির্মলও তাই বলে। কাজেই টেবিলে বউদির ঢাকা দিয়ে রেখে যাওয়া ব্রেকফাস্ট ঊর্ধশ্বাসে সাফ করে একটা ট্যাক্সি ধরা। হল আটটা ষোলো।

তাও সাড়ে ন'টার ভেতর পৌঁছে গিয়েছিল প্রায়। রাস্তার এ-ফুটে একটা চার্টার্ড বাসের গা ঘেঁষে ট্যাক্সিটা থামল যখন তখন সামনের লাল সিগন্যালে দেখাচ্ছে কুড়ি সেকেন্ড বাকি। তাড়াহুড়ো করে বাসটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়েই একেবারে ঘাড়ের কাছে একটা হালকা ধাক্কা, একঝলক কোকো মাদমোয়াজলের সুবাস। তারপরই চমকে উঠে সেদিকে ঘুরে দেখতে গিয়ে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল নির্মলের।

তা সরে যাওয়া মাটি পরক্ষণেই ফিরেও এল এবং বেশ সজোরেই এল। কোন অপোগণ্ডের ফেলে যাওয়ায় কলার খোসাটাও পায়ের তলা থেকে উড়ে এসে

ততক্ষণে তার শার্টের কাঁধে পড়েছে। তারপর তো এ-শহরের যা দস্তুর। চারপাশে রগড় দেখবার ভিড়। আহা-উহু আর জ্ঞানদানের বন্যা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে আর সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে নির্মলের কানে এল হাসির শব্দটা। অন্য সময় হলে নির্মল হয়তো বলত, কাচের চুড়ি ভেঙে যাবার মতো আওয়াজ। কিন্তু সেই মুহূর্তে সেটা তার কাছে, লোহার প্লেটের গায়ে ছুরিতে শান দেবার শব্দের মতো শোনাচ্ছিল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে নির্মল খেয়াল করল পাশে দাঁড়ানো চার্টার্ড বাসটার দরজায় দাঁড়িয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে মেয়েটা। চোখে সানগ্লাস। কালো-কোলো। কপালে একটা সাদা টিপ।

চোখাচোখি হতেই মেয়েটা মুখে রুমাল দিয়ে আর একচোট হাসি। নির্মলের মাথায় আগুন ধরে গেল। অবশ্য এমনটা হলে কোনো যুবকেরই মাথার ঠিক থাকবার কথা নয়। উঠে দাঁড়িয়ে সটান সেদিকে এগিয়ে গিয়ে সে বলল, "হাসছেন যে! এভাবে ধাক্কা দিয়ে..."

মেয়েটা জবাবে সানগ্লাসটা একটু নামিয়ে তার দিকে দেখল একবার। তারপর মুখখানা খুব গম্ভীর করে বলল, "ওভাবে গায়ের ওপর এসে নামলে ধাক্কা যে একটু খেতেই হবে মিস্টার। তা ছাড়া আমায় অত চোখ কপালে তুলে মাপবার চাইতে পায়ের নীচের কলার খোসাটার দিকে নজর দিলেই তো অঘটনটা ঘটত না।"

মেয়েটা ডেঞ্জারাস। চোখের সামনে দিন কে রাত করে দিয়ে নিজের দোষটা তার কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে কড়া একটা জবাব দিতে গিয়েছিল সে, কিন্তু ততক্ষণে সিগন্যাল খুলে গেছে। বাসটা নড়তে শুরু করতে মেয়েটা হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বলে, "কলার খোসা তো পা ছেড়ে কাঁধে চেপেছে। এবারে আমার থেকে চোখ ফিরিয়ে, কাঁধের সেটার দিকে নজর দিন প্লিজ..."

একটা হো হো হাসির শব্দ উঠল চারপাশ থেকে। বাসটা তার মুখে একরাশ নীল নীল ধোঁয়া ছড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে ক'টা চোখা গাল দিয়ে নিল নির্মল। এই প্রজাতিটিকে এমনি এমনি অপছন্দ করে না সে। অন্যায়টা করলও নিজে, আর তারপর কেস ঘুরিয়ে লোকের সামনে একেবারে হেনস্তাও করে দিয়ে গেল এক মিনিটের মধ্যে।

এদিকওদিক থেকে দু-একটা বিষাক্ত মন্তব্য ভেসে আসছিল। রুটিন আওয়াজ সব। সমাজ, সংস্কার, চরিত্র। নির্মলের কানদুটো ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। কোনো মেয়ের হাতে এইভাবে বেকুব সে আগে কখনো বনেনি। হাতের কবজিটা ফুলে উঠছে আস্তে আস্তে। সে-ব্যথার পরোয়া না করে এইবার সে গাড়িঘোড়া কাটিয়ে একদৌড়ে রাস্তাটা পেরিয়ে অফিসের দরজায় গিয়ে উঠল। অ্যাটেন্ডেন্স মেশিনে কার্ডটা যখন ঢোকাচ্ছে হাতে তখন নটা বত্তিরিশ।

২

সর্বাণী যখন তার চেম্বারে এসে উঁকি দিল ততক্ষণে সন্ধে সাতটা বাজে প্রায়।

"নির্মল, উঠবি না?"

"উঁহ। নো নাম ধরে ডাকাডাকি। আমরা এখন অফিসে আছি।"

"উফ্। ডেকোরাম হচ্ছে! কীসের অফিস? ছটা বেজে গেছে। ডিউটি আওয়ার্স শেষ। এখন আমি বউদি।"

নির্মল মনিটরে মুখ গুঁজে বসে ছিল। চোখ না তুলেই রাগী রাগী গলায় বলল, "তুমি যাও। আমি ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে যাব।"

"তবে রে ছেলে!" বলতে বলতে সর্বাণী এসে তার একটা হাতটা ধরে টান লাগাল, "শিগগির ওঠ, নইলে তোর দাদাকে ফোন লাগাচ্ছি। অ্যাডভোকেটের বাড়ি মিটিং-এ আছে। মাথা গরম রয়েছে। করি?"

"উঃ লাগে... লাগে... ছাড়ো বলছি!" বলতে বলতে নির্মল ডানহাতের কবজির ব্যথায় লাফিয়ে উঠল। হঠাৎ ব্যথার ঝাঁকুনিটা তার চোখে সকালবেলাটাকে ফের একবার ফিরিয়ে আনছিল। ট্যাক্সি থেকে নেমে আছাড় খাওয়া...মেয়েটার হাসি, বড়োবড়ো দুটো চোখ...

"কী হয়েছে রে? লাগল কেমন করে হাতে? কার কথা ভাবছিস অমন উদাস হয়ে?"

"ভাবছি? হাঃ! যত্তসব..."

***

সর্বাণী গাড়ি চালাচ্ছিল। পাশে নির্মল মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মতো করে বসে আছে। গত আধঘণ্টায় একটাও কথা বলেনি। সর্বাণীর একটু চিন্তা হচ্ছিল। বিয়ে হয়ে এসে ইস্তক চোখের সামনে বড়ো হতে দেখল এই দেওরটিকে। কখনো তাকে এতটা চুপচাপ দেখেনি সে। হল কী এর?

গড়িয়াহাট ক্রসিং-এর সিগন্যালে গাড়ি থামিয়ে তার দিকে ঘুরে তাকাল সে, "এই ছেলে, কী হয়েছে রে?"

"সকালে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলে কেন তুমি? একটু ওয়েট করলেই তো আমি চলে আসতাম। শেষে ট্যাক্সি নিয়ে..."

"ওমা। তাতে কী হল? এ-বাড়ির নিয়ম তো জানো ভাই। হয় টাইমে কাজ কর আর না-হয় নিজে ম্যাও সামলাও। আমিও কচিৎ কখনো লেট হলে ট্যাক্সিতেই যাই তো! গাড়ি ওয়েট করতে বলি? নির্মল শোন, এই কলেজমার্কা আনপাংকচুয়ালিটির

অভ্যেসগুলো যদ্দিন না পালটাবি তদ্দিন এইটে সইতে হবে তোকে এই বলে দিলাম। বড়ো হচ্ছিস। একটু প্রফেশনালিজম...”

“ধুস্! খালি বড়ো বড়ো কথা আর অন্যকে ছোটো করা। এ-বিষয়ে সব মেয়েরাই এক।”

হঠাৎ সর্বাণীর চোখে একটা ঝিলিক খেলে গেল, “হুম। মেয়েদের ব্যাপারে বেশ জ্ঞানগম্যি গজাতে শুরু করেছে দেখছি! তা, এই ‘সব মেয়ে’রা কারা কারা রে?”

“কারা আবার হবে? একটাকে দেখাই যথেষ্ট।”

“কাকে আবার দেখলি? আমাকে? সেতো রোজই দেখছিস। আজকে আবার হঠাৎ সেই নিয়ে এমন ব্রহ্মজ্ঞান গজালো কেন?”

“তুমি? ধুৎ!”

“গ্রেট। বউদি মেয়েটেয়ে নয়। তা এবার খুলে বল তো, ইনি, মানে এই ‘একটিই যথেষ্ট’টি কিনি? এমন হাত মচকানো আলাপটা কোথায় ঘটল?”

বউদির কাছে নির্মলের পেটে কিচ্ছু থাকে না। সেই ইশকুলবেলা থেকেই। অতএব এইবার সে সবটা ঘটনা সর্বাণীকে গড়গড় করে বলে গেল।

৩

“মেয়েটার নাম বর্ষা। লম্বা, শ্যামলা, দারুণ হ্যান্ডসাম। কমার্শিয়াল আর্টে মাস্টার্স করছে। অ্যানিমেশনে স্পেশালাইজেশন। ফাইনাল সেমেস্টার চলছে। ফ্যামিলিতে একেবারে ফিট করে যাবে। দেখবি নাকি একবার?”

চায়ে চুমুক দিতে দিতে সর্বাণী হঠাৎ বলে উঠল। রোববারের সকাল। নির্মল আর সর্বাণী টেবিলে এসে গেছে। অরবিন্দও তার চায়ের কাপটা হাতে করে এদিকেই আসছিল।

“আবার কনে দেখাবে নাকি?” কতবার বলেছি বউদি আমি এখন...” নির্মল রবিবাসরের পেছনে মুখ গুঁজে রেখে উত্তর দিল।

“ওরেব্বাস। আমি কি তাই পারি? নির্মলানন্দ ব্রহ্মচারী বলে কথা! সে-কথা বলিনি। আমি তো বলছিলাম আমাদের অফিসের ফ্যামিলিতে ফিট করে যাবে। তা ছাড়া নতুন পাশ করা কমার্শিয়াল আর্টিস্ট তো তুইও খুঁজছিস। এর বায়োডেটাটা একবার দেখে নে না।”

নির্মল তার গলার সঙ্গে ঝোলানো ব্যান্ডেজ করা কবজিটা সর্বাণীর মুখের সামনে নাড়িয়ে দিল একবার, “আমি এখন সাতদিনের সিক লিভে আছি। ওসব এখন দাদা সামলাবে। আমায় বিরক্ত কোরো না এই বলে দিলাম। আর, একটা রিকোয়েস্ট।

আমার টিমে কোনো চ্যাংড়া মেয়ে আমার চাই না এই আমি পরিষ্কার বলে দিলাম। একজনের পাল্লায় এক মিনিটের জন্য পড়ে তো এই দশা করেছে। উফ্ একবার যদি অ্যাঁদোড় মেয়েটাকে হাতে পাই না।"

সর্বাণী নির্মলের দিকে চোখ সরু করে চাইল একবার। তারপর মুখে একটা প্যাঁচালো হাসি দিয়ে বলল, "অফিসের কাজে নো জেন্ডার প্রেফারেন্স। আমি নিজে কিন্তু একজন মহিলা।"

"তুমি, আহা—" নির্মল একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসল, "তোমার কথা কে বলেছে? তুমি আলাদা। আমি বলছি, আমার টিমে কোনো চ্যাংড়া মেয়ে আমি—"

"নির্মল। কমপিটেন্সকে জেন্ডার দিয়ে বিচার করতে হঠাৎ কে শেখাল বল তো তোকে?"

সর্বাণীর এই গলাটা নির্মল চেনে। সেই ক্লাস নাইন থেকে। তাড়াতাড়ি উঠে পালাবার মতলবে ছিল সে এইবার। কিন্তু সর্বাণী তাকে দাঁড় করিয়ে দিল ফের, "পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট হেড করছি আমি। এ-বিষয়ে আমার ডিসিশান ফাইনাল হবে। তোর দাদাকে বলছি, সে দেখেশুনে নিক আগে। যদি রেকমেন্ড করে তাহলে একে আমি রিক্রুট করবই এই বলে দিলাম।"

বলতে বলতেই উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল সর্বাণী। সপ্তাহের এই একটা দিনই নিজে হাতে রান্নাটা করবার সুযোগ পায় সে। পেছন থেকে তার দিকে দেখে কেমন একটু সন্দেহ হচ্ছিল নির্মলের। শরীরটা কাঁপছে একটু। হাসছে, না খেপে গেছে? ধুত! মেয়েদের বোঝা খুব মুশকিল।

৪

এক সপ্তাহের জায়গায় প্রায় মাসখানেক লেগে গেল নির্মলের নিজের অফিসে ফিরতে। সিক লিভ শেষ হবার একদিন আগেই তাকে মুম্বই পাঠিয়ে দিয়েছিল অরবিন্দ। সেখানে কোম্পানির জোনাল অফিস তৈরি হচ্ছে। নাকি সিনিয়র কারও সেখানে থাকা দরকার।

নির্মল সফটওয়্যারের লোক। অফিস বসানো-টসানো তার কাজ নয়। প্রথমে সে খানিক গাঁইগুঁইও করেছিল ওই নিয়ে। তার অন্য কারণও আছে। 'মিস্টার ক্লিন'-এর নতুন একটা ডিটারজেন্ট প্রোডাক্টের রেঞ্জ ভারত জুড়ে উদ্বোধন হচ্ছে আঠারোই আগস্ট। গোটা অ্যাড ক্যাম্পেইনটার বরাত পেয়েছে কোম্পানি। বড়ো কাজ। সাতটা প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন হবে। অ্যানিমেশন আর হোর্ডিং। ডেডলাইন পেরোতে ঠিক তিনটে মাস বাকি আর। নির্মলের হাত একেবারে ভরতি।

তবে কথাটা বলতে যেতে সর্বাণী একেবারে আড় হয়ে পড়ল। বলে, "শনিবার বাড়ি থেকে সটান এয়ারপোর্টে যাবি তুই। ওদিকের কাজ না মিটিয়ে এ-অফিসে পা দিয়েছিস যদি তো ভালো হবে না এই বলে দিলাম। কাজ দেখাচ্ছে! ফিরে এসেও যথেষ্ট সময় হাতে থাকবে তোর। ভাবছিস আমি কাজ কিছু বুঝি না, না?"

একেবারে অযৌক্তিক জেদ। পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে বউদিকে আড়াল করে অরবিন্দকে সে-কথা বলতে সে আশা দিল, "দাঁড়া আমি আজ সর্বাণীর সঙ্গে কথা বলছি অফিসে।"

কিন্তু সন্ধেবেলা ফিরে দেখা গেল, বউদি কী জাদু করেছে কে জানে, দাদাও বউদিরই দলে গিয়ে ভিড়েছে। বলে, "কোম্পানির সবাইকে সব কাজ জানতে হয় রে। ধরে নে এটা তোর ট্রেনিং। তা ছাড়া, তুই জয়েন করবার আগে তোর বউদিই তো তোর ব্রাঞ্চটা দেখত, তাই না? আর্টিস্টদের দিয়ে বেশ কিছু কনসেপ্ট ড্রয়িং আর স্ক্রিপট আমি ওকে দিয়ে করিয়ে রেখে দেব। ফিরে এসে তার থেকে ফাইনালগুলো তুই বেছে নিস। মাইলস্টোন যা আছে তাতে সবগুলো কাজ তো আর একবারে দিতে হবে না! প্রায় মাসছয়েক জুড়ে একে একে দেয়া হবে। ও তোর টাইমলাইন মিট করতে কোনো সমস্যা হবে না দেখে নিস।"

কেন যে এভাবে এরা দু-জন মিলে তাকে এ-অফিস থেকে এভাবে নির্বাসনে পাঠাচ্ছে সেটা না বুঝতে পারলেও নির্মলের কিছু করবার ছিল না। এ-বাড়িতে দাদাই সুপ্রিম কোর্ট। তার রায়ের ওপরে আপিল চলে না।

***

কলকাতার অফিসে ফিরে এসে নির্মলের জন্য একটা চমক অপেক্ষা করছিল। বেশ বিশ্রী চমক। ডেস্কে রাখা কনসেপ্ট ড্রয়িং-এর গাদাগুচ্ছের ফোল্ডারের মধ্যে একটায় বউদির মার্কামারা নীল ফ্ল্যাগ দেওয়া ছিল। মানে ওইটে আগে দেখতে হবে।

ফোল্ডারটা টেনে নিতে গিয়ে নির্মলের নজরে পড়ল, ফ্ল্যাগের গায়ে একটা ছোটো স্মাইলি আঁকা। বউদি সাধারণত অফিসের কাজকর্মে এ-ধরনের মজা করে না। হঠাৎ কী হল সেই ভাবতেভাবতেই ফোল্ডারটা টেনে নিয়ে খুলে ধরেই তার মাথায় চড়াৎ করে রক্ত উঠে গেল।

ভেতরে একটা স্কেচ। কাজটা দুর্দান্ত সন্দেহ নেই। মোটা মোটা শক্তিশালী স্ট্রোক। নিখুঁত প্রোপোরশান। একটা লোক একটা ময়লার স্তূপে আছাড় খেয়ে পড়ে আছে, আর পাশ দিয়ে চলতি বাসের দরজায় দাঁড়ানো একটা মেয়ে হাসি-হাসি মুখে তাই দেখছে! ওপরে ক্যাপশান-

"এক মিনিটে দুর্দশার অবসান। নিয়ে আসুন মিস্টার ক্লিন ওয়াশিং জেল-এর

ম্যাজিক। এর শক্তিশালী মাইক্রো ডিটারজেন্ট দানার আদরে..."

নির্মল আর পরের লেখাগুলো পড়ছিল না। টেবিলের গায়ে আটকানো বেলটা তখন সে বারবার বাজিয়ে চলেছে।

মিনিটখানেক বাদে রতনদা দরজায় উঁকি মারতে নির্মল ঝাঁঝিয়ে উঠল, "বেল বাজছে কানে যায় না? সর্বাণী ম্যাডামকে গিয়ে বলো, আমি ডাকছি।"

রতনদা পুরোনো লোক। এ-অফিসে কারও মেজাজের ধার ধারে না। বলে, "মাথা গরম হয়েছে ছোটোখোকা? তো তার ঝাল আমার ওপর কেন, অ্যাঁ? ইন্টারকমে ডেকে নিলেই তো পারতে। তা নয়, কেবল লোকজনকে উৎপাত করা..." বলতে বলতে গজগজ করতে করতে সে চলে গেল।

খানিক বাদে দরজায় সর্বাণীর মুখটা উঁকি দিল এসে। নির্মল লে-আউটটা হাতে করে কিউবিকলের ভেতর বাঘের মতো পায়চারি করছিল। সর্বাণীকে দেখেই গরগর করে উঠল, "কার কাজ এটা? অ্যাঁ?"

সর্বাণী ধীরেসুস্থে ঘরের ভেতর ঢুকে এসে আর পাশে দাঁড়িয়ে কাগজটার গায়ে উঁকি দিল, "দারুণ কাজ, না? জানতাম তোর চোখ টানবেই।"

"দারুণ কাজের নিকুচি করেছে। কার কাজ এটা তুমি আগে তাই বলো।"

"আহা। শিল্পের চাইতে শিল্পিনীর দেখা পাবার জন্য বেশি উতলা মনে হচ্ছে?"

"ওহো! কাজটা তাহলে অপালা বা শিঞ্জিনীর, তাইতো? কোনজন সেটা জানতে পারি? এখান থেকে আজ তার..."

"অ্যানসার 'ডি' ডিয়ার ব্রাদার। 'নান অব দেম'," সর্বাণীর হাসিটা এইবার আরো চওড়া হল, "নতুন আর্টিস্ট। বর্ষা। সেই যে তোকে বলেছিলাম না সেদিন? যেমন দেখতে, তেমন হাতের কাজ। জয়েন করবার পর এই লে-আউটগুলো ওর ফার্স্ট অন দ্য জব ট্রায়াল। দেখে তোর দাদা অবধি এত ইমপ্রেসড যে জয়েনিং এর তিন হপ্তার মধ্যে পাঁচ বছরের কন্ট্র্যাক্ট অফার করে দিল। ভাব!"

"হুম। আর তুমি?"

"আমি? আরে আমিই তো খুঁজেপেতে আনলাম মেয়েটাকে। উফ্ সে যা খাটুনি গেছে ক'দিন! রতনদাকে লাগিয়ে ওখান দিয়ে যাওয়া সবকটা চার্টার্ড বা... বাদ দে সে'সব কথা..."

"তা এই নতুন রিক্রুটটিকে একবার দেখা যেতে পারে?" নির্মলের গলা একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে তখন।

"অসুবিধে কী? বেল বাজিয়ে রতনদাকে বল, ডেকে দেবে। দেখবি শুধু একবার! চোখ ফেরাতে পারবি না এই বলে দিলাম।"

বলতে বলতেই সর্বাণী হঠাৎ ছটফটিয়ে উঠল, "এই, আমি যাই এখন। টেবিলে

ফাইলের পাহাড় পড়ে আছে রে।"

"উঁহু। এখন তুমি কোথাও যাচ্ছ না," নির্মল কিউবিকলের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। তার চোখমুখ পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে।

"কেন? ব্রহ্মচারী স্বামী নির্মলানন্দ একটা চ্যাংড়া মেয়ের সঙ্গে একলা কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন নাকি? নে, ছাড় আমায়..." বলে হাসতে হাসতে তার হাতটা দরজা থেকে সরিয়ে সর্বাণী বেরিয়ে গেল।

নির্মল ঘণ্টাটায় ফের চাপ দিয়ে সিগারেট ধরাল একটা।

"আসব?"

"আসুন। এই লে-আউটটার আইডিয়া কি সর্বাণী ম্যাডাম আপনাকে..." বলতে বলতে মুখ তুলে তাকিয়েই একেবারে স্থির হয়ে গেল নির্মল, "তু— আপনি!"

"আ-আপনি! এ-এখানে..."

কয়েক মুহূর্তের হিরণ্ময় নীরবতা। খানিক বাদে মেয়েটাই সেটা ভাঙল, "আ-আমি জানতাম না। আমি দুঃখিত..."

"আমিও দুঃখিত," সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে দাবিয়ে দিতে দিতে নির্মল বলল।

"এ মা! না না, সেদিন যেমন বিহেভ করেছেন সেটা তো একটা ইনস্টিংকটিভ মেল রিঅ্যাকশান ছিল। সোশ্যাল কন্ডিশনিং। ও ঠিক আছে। আমরা মেয়েরা আজকাল ছেলেদের ও'রকম ওগলিং-এ অভ্যস্ত হয়ে গেছি।"

"উঁহু, আমি সে-জন্য মোটেই দুঃখিত নই," নির্মলের গলাটা মিছরির ছুরির মত হয়ে উঠেছে তখন। চেয়ারে বেশ হেলান দিয়ে বসে, ঠোঁটে সরু একটা হাসি ঝুলিয়ে মেয়েটার দিকে চোখ রেখেছে সে এবার। মেয়েটা সুন্দরী। তবে ওতে সে এই মুহূর্তে মোটেই ইমপ্রেসড নয়।

"সেদিন আমি আপনাকে যা যা বলেছি তার জন্য আমি একবিন্দু দুঃখিত নই। ইন ফ্যাক্ট ও'রকম হৃদয়হীন, অমার্জিত আচরণের জন্য ওর থেকেও কড়া কিছু কথাবার্তা সেদিন আপনার পাওনা ছিল। তবে মহিলাদের সঙ্গে সে-ভাবে কথা বলতে আমি শিখিনি, তাই বেঁচে গিয়েছিলেন। আমি দুঃখিত অন্য কারণে। আমি আপনার চাকরিটা টার্মিনেট করছি। এই মুহূর্তে।"

"টার্মিনেট করছেন? আপনি?"

"হ্যাঁ, আমি। আমি এই ব্রাঞ্চের হেড সেটা জানেন আশা করি। ক্যাশে বলে দিচ্ছি। পাওনাগণ্ডা যা বোঝবার বুঝে নিয়ে..."

"ওহো! বেশ।" সামনে ছড়িয়ে থাকা ফোল্ডারটার ছবিটবি আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিতে নিতে বর্ষা ঠান্ডা গলায় বলল, "আমি আপনাকে একটা শেষ সুযোগ দিচ্ছি। সিদ্ধান্তটা নিয়ে আর একবার ভাববেন?"

"ফুঃ! আমায় সুযোগ দিচ্ছেন উনি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। চাইলে সুযোগটা নিন। নয়তো..."

"দরজাটা খুঁজে নেবেন, না উঠে গিয়ে দেখিয়ে দেব?"

"থ্যাংক ইউ। দরকার হবে না। আমি দরজাটা চিনি। তবে আজ আমাকে দরজা দেখালে খুব শিগগিরই লোকজন অন্য কিছু দেখবে। এই যে... এইটা..."

বলতে বলতে ফোল্ডার থেকে লে-আউটটা বের করে নির্মলের নাকের সামনে তুলে ধরেছে মেয়েটা, "এইটা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ফ্রি-ল্যান্সিং করি। দু-তিনটে খবরের কাগজে কার্টুন বেচেছি এর আগে। ট্যাগলাইনটা বদলে পলিটিক্যাল কিছু একটা জঞ্জাল করে দেব, আর আছাড় খাওয়া লোকটার মুখটা বদলে দেব একটুখানি। চোয়ালটা একটু বাঁদিকে বাঁকাব, নাকটা একটু ছাঁটব, একটা গোঁফ দেব আর চোখদুটো কুতকুতে করে দেব, বাস। কারও চিনতে ভুল হবে না। বিখ্যাত দৈনিকের ফ্রন্ট পেজ-এ আসতে কেমন লাগবে? উঁহু... টেনে নেবার কোনো চেষ্টা করবেন না। আর নিলেও লাভ নেই। কমপিউটারে আঁকা। ক্লাউডে সেভ করে রেখেছি। সেকেন্ড টাইম বের করে নিতে প্রবলেম হবে না।"

"এই..."

"আজ্ঞে। এবার ভেবে দেখুন স্যার। বিখ্যাত হয়ে যাবেন। গ্যারান্টি দিচ্ছি।" ফোল্ডার থেকে দু-নম্বর লে-আউটটা এইবার টেনে বের করেছে বর্ষা। সেখানে মেয়েটার ডান হাতে ছেলেটার একটা ঠ্যাং ধরা। খানিক দূরে একটা ওয়াশিং মেশিন। এক কোণে ট্যাগলাইন, "ফের একবার মিস্টার ক্লিন হয়ে উঠুন। এক নিমেষেই ফর্সা..."

"এ তো ব্ল্যাকমেল! আমি— আমি তোমাকে—"

"ফুঃ!"

ছবিগুলো ফোল্ডারে ঢোকাতে ঢোকাতে কিউবিকল থেকে বের হয়ে যেতে গিয়ে বাধা পেল বর্ষা। তার দরজা ঠেলে তখন অরবিন্দ হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকছে। হাতে একটা প্রিন্ট-আউট।

"আর বর্ষা। তোমাদের ওয়ার্ক ফ্লোরে গিয়েছিলাম, তা বলল তুমি এখানে। এসো, দেখো কী মেল এসেছে।"

"সরি স্যার। এইমাত্র আমার চাকরি গেছে। আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

"চাকরি... গেছে? মানে?"

"মিস্টার স্যান্যাল আমাকে পিংক স্লিপ দিয়েছেন। পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে যাচ্ছি তাই।"

"আমি? আমি তোমায় পিংক স্লিপ দিয়েছি? নেভার!"

"আপনি নন স্যার। মিস্টার নির্মল স্যান্যাল স্যার।"

অরবিন্দ হঠাৎ চুপ করে গেল। তারপর নির্মলের দিকে ফিরে বলল, "তা

মেয়েটার অপরাধটা কী জানতে পাই?"

নির্মল ফের একবার ফেটে পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে সে-সুযোগ না দিয়ে মেয়েটা তার করা লে-আউটদুটো ততক্ষণে অরবিন্দর সামনে তুলে ধরেছে, "অ্যানিমেশনের এই কনসেপ্ট লে-আউটদুটো করবার অপরাধে স্যার।"

"কিন্তু... কনসেপ্টটা তো ফ্যানটাসটিক! আমি চোখের সামনে অ্যানিমেশনটা দেখতে পাচ্ছি তো! যা ইমপ্যাক্ট হবে, ভাবা যায় না..." অরবিন্দর ঠোঁটের কোণে একটা হাসির প্রায় অদৃশ্য ছোঁয়া লেগে ছিল, "এত ভালো কাজটা মিস্টার ক্লিন প্রোজেক্টের জন্য নির্মলের পছন্দ না হলে বয়ে গেল, বুঝলে? ম্যাকলিন নতুন ইন্সিওরেন্স স্কিম নিয়ে ভারতের বাজারে আসছে। 'অর্থ-সহচরী'। ওর বিজ্ঞাপনের লে-আউটে এটা দিব্যি কাজে লেগে যাবে তো! ট্যাগলাইনটাও মাথায় এসে গেল, বুঝলে বর্ষা, 'আপনার বিমাকে জঞ্জালমুক্ত করতে এসে গেল আপনার একান্ত নিজস্ব অর্থ-সহচরী..' সুপার্ব, সুপার্ব..."

বলতে বলতেই হাতের প্রিন্ট আউটটার দিকে ফের নজর গেছে অরবিন্দের। সেটা তুলে ধরে বলে, "আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম, ধুস। তোমাকে দিয়ে ম্যাকলিনের জন্য একটা অ্যাডের লে-আউট করিয়েছিলাম মনে আছে? এই মেলটা দেখ। কাজটা আমরা পাচ্ছি। অল ক্রেডিট গোজ টু ইওর ক্রিয়েটিভ ট্যালেন্ট! কাজ দেখে ফিদা হয়ে গেছে ওরা।"

"কিন্তু স্যার, আমার চাকরি তো..."

"ফরগেট ইট। জুনিয়র স্যান্যাল ওভার-রুলড। এখন অনেক খাটতে হবে তোমায়। বোর্ড রুমে এসো লাঞ্চের পরে। নির্মল, তুই মিস্টার ক্লিনের পর এই প্রোজেক্টটা ধরবি। ক্রিয়েটিভ সাইড বর্ষা দেখবে। ফেব্রুয়ারিতে লঞ্চ হচ্ছে। হাতে সময় আছে খানিকটা। ধীরেসুস্থে সব ছকে ফেলতে হবে।"

বলতে বলতেই তাদের দুজনের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল অরবিন্দ। ঠোঁটের কোনায় একটুকরো হাসি খেলে যাচ্ছিল তার। খানিক বাদে বলে, "বিজনেস ইজ বিজনেস ব্রাদার! ওসব পার্সোনাল ঝগড়াঝাঁটি কিছুদিনের জন্য ভুলে যাও দেখি। আর বর্ষা, তোমার বউদি... সরি, তোমার সর্বাণী ম্যাডাম তোমায় নিয়ে একবার চেম্বারে যেতে বলেছেন আমায়। চলো।"

"চলুন স্যার," অরবিন্দর পেছন পেছন কিউবিকল থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বর্ষা নির্মলের দিকে একটা গা জ্বালানো দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে গেল।

৫

"মেয়েটা কেমন রে?"

"কোন দিক থেকে?"

"মানে অফিসের কাজকর্মের দিক থেকে আর কী।"

"ভালো।"

"দেখতে কিন্তু ফাটাফাটি, সে তুই যা-ই বলিস। লাস্ট তিন মাসে শুধু এই অফিস থেকেই তিন তিনটে প্রোপোজাল। বেশ ভালো প্লেয়ার কিন্তু।"

"ভালো।"

"হ্যাঁ রে নির্মল, তোর বাংলা ডিকশনারিতে ওই একটা শব্দই আছে নাকি শুধু?"

"আর কী শুনতে চাও?"

"শুনতে চাই, ওকে তোর কেমন লাগে।"

"নোংরা। ইগোটিস্ট। ফাজিল। টং শার্ট, ফালতু।"

সর্বাণী একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, "একটা কথা বলব?"

"কী?"

"তুই একটা মহা বোকা ছেলে। শোন, একদিন ওর কম্পিউটারে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আয় কী করছে, তাহলে হয়তো বুঝবি আশা করি। আমি রিমোটলি অ্যাক্সেস করে দেখেছি। ও জানে না।"

"অফিসের মেশিনে পার্সোনাল কাজ করছে?"

"নিজে গিয়ে একবার দেখেই আয় না বোকারাম।"

"বউদি, এটা অফিস। ওসব অ্যাডজেকটিভগুলো বাড়িতে ইউজ করলে ভালো হয় না?"

"তোর অফিসের নিকুচি করেছে," বলে গজগজ করতে করতে সর্বাণী নির্মলের কিউবিকল থেকে বের হয়ে গেল।

***

নির্মল কখন যে পেছন থেকে এসে তার মনিটরে উঁকি দিয়েছে বর্ষা সেটা খেয়াল করেনি। নিজের কাজটা নিয়ে একেবারে ডুবে ছিল সে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে পর্দার দিকে একনজর তাকিয়ে দেখল নির্মল। তারপর মাথায় যেন একটা বোমা ফাটল তার।

পর্দায় পেস্টবোর্ডে বর্ষা সেই কুরুচিকর কার্টুনটার ফ্রেমের পরে ফ্রেম জুড়ে চলেছে। জিনিসটাকে অ্যানিমেট করছে ও।"

হঠাৎ বর্ষা পেছনদিকে ঘুরে তাকাল।

"আরে! কতক্ষণ?"

"এইমাত্র। তোমার হাতের কাজটা দেখতে এলাম।"

"দারুণ, না? মোটামুটি হয়ে গেছে। স্যার আর ম্যাডাম দুজনেই ডেমো দেখে খুব খুশি।" হঠাৎ উচ্ছল হয়ে উঠেছে বর্ষা, "দু-একটা জায়গা পয়েন্ট আউট করেছেন,

সেই ফ্রেমগুলো পালটে দিচ্ছি শুধু। দু'সেকেন্ডের কাজ। একবার গোটা ডেমোটা চালিয়ে দেখাই?"

"দাদা-বউদির ভালো লেগেছে তো? তাতেই হবে। তবে, পার্সোনালি আমার মনে হয় আমার এটা খুব একটা ভালো লাগবে না," নির্মল মাথা নাড়ল।

মেয়েটা, প্রকাশ্য রাস্তায় তার একটা অপমানকে ক্যাশ করে এভাবে তার নিজের লোকজনকেও নিজের দিকে টেনে নিল। দাদা না হয় কিছু জানে না। কিন্তু বউদি? সে তো সব শুনেছে! সে তো জানত! একটা গভীর দুঃখ উঠে আসছিল তার বুকের ভেতর থেকে।

"ভালো লাগবে না? কেন?"

"তুমি জান না?"

"আ-আমি জানি। আয়াম সো সরি। কিন্তু, তুমি ভুল বুঝছ। প্লিজ একবার পুরো ডেমোটা দেখ তুমি। দেখলে, আমি শিওর তোমারও..."

"ওহো! তাহলে তুমি চাও, তোমার হাতে আমার অপমানটা আমি নিজে চোখে দেখব, আর তারপর তোমার পিঠ চাপড়ে হাততালিও দেব, তাইতো? একটা সুস্থ মানুষের কাছ থেকে এতটা মেরুদণ্ডহীনতা আশা করাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি বর্ষা?"

হঠাৎ মুখে একরাশ রক্ত ছুটে এল মেয়েটার, "না নির্মল... একদম তা নয়...তুমি একটিবার এটা..."

"মিষ্টি-মিষ্টি কথাবার্তাগুলো দাদা-বউদির জন্য তুলে রাখলেই ভালো হয়। ও-পথেই তো এ-কোম্পানিতে নিজের কাজটা ধরে রেখেছ। নইলে কবে..."

প্রাণপণে কিছু একটা বলতে চাইছিল বর্ষা। শুধু সঠিক শব্দগুলো যেন খুঁজে পাচ্ছে না সে। তার বড়োবড়ো চোখদুটো নির্মলের মুখের দিকে তুলে ধরা। অলাজ।

সেদিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে নির্মল ফের বলল, "বউদিকে বশ করেছ সেটা তাও বুঝি। সহজ-সরল মেয়ে। সবাইকে প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে। অত প্যাঁচালো বুদ্ধিটুদ্ধি তার নেই। কিন্তু দাদার মত কড়া একটা বিজনেসম্যানকে তুমি ঠিক কোন ট্যাকটিকে বশে রেখেছ বলো তো? তোমার কথা উঠলেই দেখি একেবারে চোখ উলটে দিচ্ছে আজকাল। তা টেকনিকটা কী?"

"তুমি কী বলতে চাইছ সেটা..." হঠাৎ কেমন যেন শুকিয়ে উঠেছে মেয়েটার গলাটা। সেখান থেকে প্রাণের সমস্ত স্পর্শ উধাও।

"সেটা কি আরও স্পষ্ট করে বলতে হবে?"

"ও!" হঠাৎ বড়োবড়ো চোখদুটোতে তার শ্রাবণের মেঘ ঘনিয়ে এল যেন, "বেশ। এর পর তাহলে আর আমি তোমাদের কাউকে বিরক্ত করতে চাই না।

তোমাদের পরিবার অটুট থাক। দাদাবউদির ভালোবাসা অটুট থাক তোমার ওপরে। আমি এ অফিস ছেড়ে দিচ্ছি। আমি নিজেও ভদ্র পরিবারের মেয়ে নির্মল। কেন এসব কথা শুনে তার পরেও..."

মেয়েটার চোখে, তার গলার স্বরে কিছু একটা ছিল। হঠাৎ বুকের ভেতর কোথাও একটা শক্ত ঘা এসে লাগল নির্মলের। হঠাৎ করেই রাগের মাথায় মুখে এসে যাওয়া কথাগুলোর হিংস্র আঘাতটাকে যেন সেই চোখ আর গলার স্বর, একটা তীব্র অনুতাপে বদলে দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছিল তার নিজের বুকেও। রাগের মাথায় বড়ো অন্যায় করে ফেলেছে সে।

উঠে দাঁড়ানো মেয়েটার একটা হাত ধরে সে বলল, "সরি বর্ষা। তুমি যা ভাবছ তা একদম নয়। আমি তেমন কিছু মিন করিনি। শুধু রাগের মাথায়...

"তুমি তো জানো! তিনমাস ধরে তো দেখছ আমায়। অত নীচু কথা আমি মন থেকে কখনো বলতে পারি? এগেইন, আয়াম রিয়েলি সরি। মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া একটা কথাকে সত্যি ধরে নিয়ে তুমি এভাবে চলে যেতে পারো না।"

হঠাৎ একটা ঝটকা দিয়ে তার হাতটা ছাড়িয়ে নিল মেয়েটা। তার চোখের টলটলে দু-ফোঁটা জলের সঙ্গে ফের আগুন এসে মিশেছে, "হ্যাঁ, আমি পারি। আর সেটা আমি করবও। আমাকে আটকাবার তুমি কে?"

একটাও কথা বলল না সে আর। কমপিউটারটাকে বন্ধ করে, নির্মলের দৃষ্টিকে সযত্নে এড়িয়ে মাথা নীচু করে ড্রয়ার থেকে নিজের পার্সটা বের করে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বের হয়ে গেল ঘরটা ছেড়ে।

৬

মুম্বই-এর আবহাওয়া খুব আর্দ্র। আর তেমন গরম। অফিসঘরের সমুদ্রমুখী জানালাটাকে হাট করে খুলে দিল নির্মল। মাসখানেক হল মুম্বই অফিসের দায়িত্ব নিয়ে এখানে চলে এসেছে সে। বাড়িটা নতুন। এখনও সেন্ট্রাল এসি কাজ শুরু করেনি। আওহাওয়া অফিস আশা দিচ্ছে রোজ, এইবার বর্ষা আসবে। তবে তার কোনো লক্ষণ নেই এখনও। শুধু দূরে, সমুদ্রের বুকে নীলচে একটা মেঘের বাষ্পপিণ্ড জমা হয়ে আছে।

জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ির কথা খুব মনে পড়ছিল নির্মলের। ক'দিন আগে যখন সে দাদাকে গিয়ে বলল, কলকাতা ছেড়ে মুম্বই-এর এই অফিসটায় শিফট করতে চায়, দাদা বাধা দেয়নি। উলটে বলেছিল, "রাইট ডিসিশান। একটু একা থেকে নিজে নিজে দাঁড়াতে শেখাটা তোর পক্ষে ভালোই হবে।"

বউদিও কোনো আপত্তি করেনি। উৎসাহই দিয়েছিল। মুখে বর্ষার ব্যাপারটা

নিয়ে কিছুই বলেনি তাকে তারা, একবার জিজ্ঞাসাও করেনি ঠিক কী হয়েছিল সেদিন। তবু, ঘটনাটার পর দুজনেই হয়তো চাইছিল সে সরে যাক কলকাতা থেকে। নির্মলও তাই চাইছিল। ও-অফিসটা তার কাছে একটা অস্বস্তির উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা ওভাবে চলে যাবার পর।

তার ঠিক সাতদিনের মাথায় মুম্বই অফিসে শিফট করে আসে সে। কলকাতা অফিসের প্রোজেক্টগুলোর থেকেও একেবারে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে নির্মল। মুম্বইয়ের বাজারটা অন্যরকম। অনেক বড়ো। অনেক সম্ভাবনা এখানে। নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করবার অনেক সুযোগ।

পকেটে মোবাইলটা কেঁপে উঠল একবার। দোয়েলের ডাক। বউদির রিংটোন।

"নির্মল, ওয়াই ফাই লেগে গেছে অফিসে?" অন্যপাশে বউদির গলা। অনেকদিন পর।

"উঁহু। নেক্সট উইক।"

"ওকে। ফোনে এমনি ইনটারনেট পাবি তো?"

"সে পাব। কেন?"

"নেট-এ ঢোক। মিস্টার ক্লিন-এর কর্পোরেট ওয়েবসাইটে যা। অ্যাড্রেস জানিস তো?"

"জানি। কিন্তু হঠাৎ করে..."

এক্ষুনি ওরা মেল করল। আমাদের তৈরি মিস্টার ক্লিন-এর একটা অ্যানিমেশন ওরা ওদের গ্লোবাল কর্পোরেট সাইটে লঞ্চ করেছে। গ্লোবাল সাইট নির্মল! শুধু ভারত নয়। একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তাদের একটা ছোটো মার্কেটের জন্য তৈরি অ্যাড গোটা দুনিয়াকে দেখাবার জন্য বেছে নিয়েছে। এটা একটা ল্যান্ডমার্ক অ্যাচিভমেন্ট।"

লাইনটা কেটে দিয়ে ডেটা সার্ভিস চালু করছিল নির্মল, তখন বউদি ফের ফোন করল, "আর শোন। বোকার মতো শুরুটা দেখে বন্ধ করে দিবি না। গোটা অ্যাডটা দেখ। জি আই এফ অ্যানিমেশান। জাস্ট সিক্স সেকেন্ডস। ফর ওয়ান্স, তোকে আমি মাথার দিব্যি দিয়ে বলছি, মাঝপথে বন্ধ করে দিবি না।"

***

সাইটটা পর্দায় নামছে আস্তে আস্তে। একেবারে মাথায় ছোট্ট একটা উইন্ডো খুলে গেছে। তার নীচে গোটা পাতাটা লোড হতে হতেই উইন্ডোটাতে বিজ্ঞাপনটা নড়তে শুরু করেছিল।

"ত্যাঁদোড় মেয়ে," সেখানে মাটিতে আছড়ে পড়া যুবকটির দিকে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসতে থাকা কার্টুনযুবতীর দিকে একনজর দেখে নির্মল একটু হেসে

ফেলল। আগের সেই রাগটা আর কেন যেন টের পাচ্ছে না সে বুকের ভেতর। তবে, এর পরের দৃশ্যটা তার জানা। ফলে, কোনো আগ্রহ আর তৈরি হচ্ছিল না তার মধ্যে সে নিয়ে। সেই একই..."

পাতাটা বন্ধ করবার বোতামটার দিকে আঙুল বাড়িয়েছে নির্মল, ঠিক তখনই ব্যাপারটা ঘটল। কার্টুন মেয়ের একটা হাত এসে ছুঁয়ে দিয়েছে কার্টুন যুবকের শরীরকে। তারপর হঠাৎ যুবতির শরীর থেকে রামধনুর উজ্জ্বল রঙের একটা স্রোত বেরিয়ে এসে ঢেলে ফেলল ছেলেটার শরীরকে। সেই আলোর ঝিকিমিকির মধ্যে বড়ো আদরে পতিত পুরুষটিকে দুহাতে জড়িয়ে তুলে আনছিল উজ্জ্বল, নির্মল যুবতি। তাদের ঘিরে তখন বয়ে চলেছে ডিটারজেন্টের বিজ্ঞাপনের ট্যাগলাইন, "লেটস ফরগেট অল দ্যাট মেস। লাভ ইউ মিস্টার ক্লিন... কাম টু মি..."

***

...চোখের সামনে বারংবার অভিনীত হতে থাকা ক্লিপটার দিকে চোখ আটকে রেখেই পকেট থেকে দ্বিতীয় ফোনটা বের করে এনে সর্বাণীর নম্বরটা মেলাল নির্মল ।

"বউদি..."

"হ্যাঁ বল।"

"অ্যানিমেশনটা শেষ করল কে?"

"কে আর করবে? বর্ষাই করেছে। দেখে কি সেটাও বুঝলে না হে মিস্টার ক্লিন নির্মল স্যান্যাল?"

"কিন্তু সে তো আমার সঙ্গে সেদিন..."

"আমি জানি আর যথারীতি তোর চাইতে খানিক বেশি জানি," ফোনের অন্যদিকে বউদির গলায় হালকা একটু হাসির ছোঁয়া ছিল, "শোন। ওর সঙ্গে তোর প্রথম দেখা হবার গল্পটা আমায় বলেছিলি, মনে আছে? শুনে মেয়েটার স্পিরিটটা আমার দারুণ লেগেছিল। নিজে মেয়ে বলেই হয়তো। ওর চার্টার্ড বাসটাকে খুঁজে বের করাটা বিশেষ ঝামেলার কাজ ছিল না। রতনদাকে দিনদুয়েক ঝাউতলা রোডে পাঠিয়েই পেয়ে গেলাম। ও-সময়টা একটাই চার্টার্ড বাস ওখান দিয়ে পাস করে। সুযশ অ্যানিমেশন অ্যাকাডেমির বাস। একেবারে আমাদের লাইনের ট্রেনিং দেয় ওখানে।

"তোর দাদাকে সব কথা খুলে বললাম। তারপর সুযশ-এ যোগাযোগ করে, মেয়েটাকে লোকেট করে, প্লেসমেন্ট অফার দিয়ে টেনে আনতে সমস্যা হল না কোনো। তোকে মুম্বই পাঠিয়ে দেবার পরদিনই ধরে এনেছিলাম ওকে। ভেবেছিলাম, তোর অ্যাবসেন্সে একটু শান্তিতে ওকে সেটল করিয়ে দিয়ে তারপর ফিরে এলে ঝগড়াটগড়া মিটিয়ে দেব। সে তো হলই না, উলটে দু'জন দু'দিকে চলে গেলি ঝগড়া করে।

"তারপর এ-যাত্রা তোকে মুম্বাই বিদায় করে পরদিনই ওর বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। মেয়ের সে কী রাগ। কিছুতেই আসবে না। শেষে আমি আর তোর দাদা মিলে তোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি গালটাল পেড়ে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে ফের ফিরিয়ে আনি। তোর জন্য আমায় যে কত কিছু করতে হল এ-জীবনে!"

"বউদি..."

"শুনছি। বল।"

"বর্ষা অফিসে আছে?"

"না। লণ্ডনে। একটা টিমকে অফিস থেকে ট্রেনিং-এ পাঠিয়েছে তোর দাদা। ওর মোবাইল নাম্বার তোকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিয়েছি খুলে দ্যাখ। এখন ওখানে সকাল আটটা।"

"নাম্বার...মানে... আমি ওকে ঠিক কী..."

"নিজের ম্যাও। নিজে সামলাও ভাই।"

লাইনটা কেটে দিল নির্মল। তারপর হোয়াটস-অ্যাপ খুলে বউদির মেসেজটা দেখে নিয়ে কি প্যাডে অন্য একটা নম্বর ডায়াল করতে শুরু করল। সাগর পেরিয়ে দীর্ঘ দূরত্বের কল। হয়তো দীর্ঘ অপেক্ষার কলও বটে।

গায়ে বৃষ্টির ছিটে এসে লাগছিল। কখন যেন আকাশ কালো হয়ে এসেছে। সমুদ্র থেকে উঠে আসছিল ভেজা হাওয়ার স্রোত। অবশেষে বর্ষা।

জানালা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে বৃষ্টির আদরটুকু মুখে মেখে নিতে নিতেই বারবার বাজতে থাকা রিংটা শুনতে শুনতে নির্মল কথাগুলো গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। ধুত্তোর। ঠিকঠাক মাথাতেই আসছে না যে কিছু! না আসুক। একেবারে সরাসরি, কম কথায়...

"বর্ষা, আমি...আই মিন আমি তোমায়..."

সমস্ত অস্তিত্বে কাঁপন ধরানো সুস্বাদু শব্দবন্ধগুলো নিয়ে বারবার জিভে নাড়াচাড়া করে চলেছিল সে তখন।

ফোনটা এখনও তুলছে না কেন ও?



ফুলকরবী

টিকেএম-এর জোড়া ক্লাস ছিল আজ শুরুতেই। অতএব আজ আরুণির দিনটা খারাপ যাবে সেটা বলাই বাহুল্য। এর তিনটে কারণ। এক, ভদ্রলোক আরুণিকে প্রচণ্ড অপছন্দ করেন। দুই, ওঁর পড়ানো শুনলে নায়গ্রারা জলপ্রপাত স্বয়ং ঘুমিয়ে পড়ে। আর তিন, এটাই আসল, যদিও আরুণি ভাগ্যটাগ্য বিশ্বাস করে না, করাটা উচিতও নয়, তবু কথাটা সত্যি, সেটা হল ভদ্রলোক প্রচণ্ড অপয়া।

অতএব আর পাঁচটা বৃহস্পতিবারের মতই আরুণি মানসিকভাবে তৈরি হয়েই এসেছিল। ঘটলও তাই। টাইম সিরিজের তথাকথিত 'সিম্পল'(মানে টিকেএম-এর ভাষায়)একটা অঙ্ক নিয়ে বেছেগুছে আরুণিকেই ক্লাসের শেষ আধঘণ্টা নাকানি-চোবানি খাওয়ানো হল, আরুণি বেঞ্চের নীচে মোবাইল ধরে অঙ্কটার একটা উত্তর খুঁজছিল বলে তাকে রীতিমতো অপমান করে বোর্ডে ডেকে নিয়ে বৃথাই দাঁড় করানো হল, আর তারপর ভদ্রলোক ওঁর হুলোবেড়াল মার্কা হাসিটা দিয়ে করবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "নাও, তুমিই করে দাও তাহলে। এর দ্বারা তো..."

বিশ্বাসঘাতক করবীটাও ওমনি বোর্ডে এসে টুকটুক করে ব্যাপারটা সল্‌ভ্ করে আরুণির দিকে অপাঙ্গে একখানা বিষাক্ত চাউনি ছুড়ে দিয়ে সিটে গিয়ে বসে পড়ল।

এহেন একটা মানসিক টর্চার একশো মিনিট ধরে সইবার পর পরের পিরিয়ডটা আর করা সম্ভব নয়। এবারে এমআর-এর পরপর দুটো প্রোবাবিলিটির ক্লাস। তারপর ব্রেক। ব্রেকের পর দুটো ক্লাস ফাঁকা।

ইউনিয়ানের সেক্রেটারি গিরিশদার কড়া হুকুম, ক্লাস কেটে ইউনিয়ন রুমে ঢোকা যাবে না। অতএব, প্রায় গোটা দিনটা এবারে কীভাবে খরচ করা যায় এই নিয়ে ভাবতে-ভাবতেই কমনরুমের সামনের ধাপিতে বসে আরুণি খানিক ইনস্টা ঘাঁটবার

চেষ্টা করল। কিন্তু সেখানেও প্রথমেই করবীর পোস্ট। আজ একটা নীল রঙের শাড়ি পরে ইউনিভার্সিটি এসেছে। টিকেএম-এর ক্লাস শেষ হতেই নিজের হাতের লেখা বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে হেবি পোজ দিয়ে ছবি তুলে পোস্ট করে দিয়েছে।সঙ্গে ট্যাগলাইন-"গার্ল পাওয়ার। টুডে অ্যাট ক্লাস।" কঠিন অঙ্ক আর সুন্দরী মেয়ে... লিথাল কম্বিনেশান। লাইক পড়েছে দশ মিনিটে সাড়ে তিনশ।

মুখটা খানিক বিকৃত করে আরুণি ইনস্টা বন্ধ করে দিল। মেয়েটা অমানুষ। কতটা সেলফিশ আর অহংকারী হলে মানুষ এরকম করতে পারে। তোর সামনে তোর ক্লাসমেট এভাবে নাকানিচোবানি খেল আর তুই...

অথচ এই করবীই, কত অন্যরকম ছিল। মনে পড়তে নিজের মনেই একটু হাসল আরুণি।ওদের পাড়ায় ভাড়া থাকত যখন... মাকে রানিমাসি-রানিমাসি করত। আরুণির বোর্ড গেম, লেগো, পাজ্‌ল গেম নিয়ে ছুটির দুপুরগুলো... ঘণ্টার পর ঘণ্টা...

একটু বোকাসোকা টাইপ মেয়ে ছিল। আরুণি তাই ওকে ফুলকরবী বলে ডাকত। আর মেয়েটা এত বোকা যে ফুল মানে যে বোকা সেটাও বুঝতে পারত না।

তারপর ওরা কলকাতা চলে গেল। মেয়েটাকে এর পর ভুলেই গিয়েছিল আরুণি। এবারে আবার ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশানের সময় দেখা। নিজেই এগিয়ে এসে হেসে-হেসে বলে, "কী রে, এত দেরি করে এলি যে।"

আরুণি একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল প্রথমে। কে না কে একটা মেয়ে! একটু উত্তেজনাও হচ্ছিল অবশ্য।একটা অচেনা মেয়ে এসে ভাব করতে চাইছে! তা তারপর তাতে জল ঢেলে দিয়ে করবী বলে, "রানিমাসি মা'কে হোয়াটস অ্যাপে সেদিন বলছিল তো তুইও একই জায়গায় চান্স পেয়েছিস। আজই অ্যাডমিশান নিতে আসবি। আমি সেই কখন থেকে ভাবছি গেল কোথায়?"

এইবার আরুণির অবাক হবার পালা। করবীর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলে, "তার মানে তুই সেই ফুলকরবী, তাই তো?"

শুনে করবী একটু থমকে গিয়েছিল প্রথমে। তারপর বলে, "অ। ফুলকরবী, না? অ্যাডমিশান টেস্টে আমার র‍্যাঙ্ক কতো জানিস? টু। তা খোকা, তোর তো ওয়েট লিস্ট ছিল। পেয়ে গেছিস শুনেই তো রানিমাসি খুশি হয়ে মা'কে মেসেজ করল পরশু।"

মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল আরুণির। চারপাশের লোকজন ওদের দেখছিল। রি-অ্যাক্ট করলে পাবলিক ব্যাপক খোরাক পাবে। কাজেই কথাগুলো চুপচাপ হজম করে নিয়ে কেটে পড়তে যাবে তখন ফের পেছন থেকে ডেকে বলে, "এই শোন শোন, মা'কে রানিমাসি বলে দিয়েছে, জমা দেবার আগে মাসির 'খোকা'র সার্টিফিকেটগুলো আমি যেন একবার চেক করে নিই। নইলে নাকি..."

চারপাশে জমায়েত পাবলিকের ভেতর থেকে ততক্ষণে আওয়াজ উঠে গেছে,

"খোকা... খোকা..."

সেদিন মেয়েটার ওপরে আরুণির যত না রাগ হয়েছিল, তার চতুর্গুণ রাগ হয়েছিল মায়ের ওপরে। চেনা নেই জানা নেই কোথাকার কে, তার ওপর নিজের ছেলের চেয়ে বেশি ভরসা করে যে মা...

***

"এই যে, পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে..."

কানের কাছে হঠাৎ ফেটে পড়া গর্জনে আরুণির চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে গেল। অয়ন, শান্তনু, করবী থেকে শুরু করে গোটা ক্লাসটা ক্যান্টিনের দেয়ালের ওপাশ থেকে ক্যালব্যাল করতে করতে কমনরুমের দিকে আসছিল। দলটার দিকে একনজর তাকিয়ে দেখল আরুণি। দুই গুগাবাবা, মানে গুডগার্ল আর বাধ্যবালক সুজন আর ইন্দিরা বাদে বাকি সবাই আছে।

তাকে দেখতে পেয়ে অয়ন এগিয়ে এসে একপাক নেচে নিয়ে বলে, "ওরে আজ কার মুখ দেখে ঘুম থিকে উঠেছিলাম রে!"

"কেন? কী হল?" আরুণি মুখটাকে প্যাঁচার মতো রেখেই উলটে জিজ্ঞাসা করল।

"এম-আর কা হো-অ্যাপ আয়া হ্যায়।"

"হো-অ্যাপ মানে?"

"মদন। তাও বোজো না? আজ ক্লাস হবে না। মেসেজ করেছে নাকি দুপুরবেলা বাড়িতে কী জরুরি কাজ পড়ে গেছে। তাই..."

বলতে বলতে অয়ন একবার মিচকে হেসে চোখ টিপল। গোটা দলটায় হাসির হররা উঠল একটা। মঞ্জুনাথ রায় বিয়ে করেছেন ক'মাস আগে। অতএব তাঁর সহসা এহেন মধ্যাহ্নকালীন ব্যস্ততার পেছনে তারা ভারি আকর্ষণীয় কোনো গন্ধ পেয়েছে।

"নে নে ওঠ। সঙ্গমে একটায় শো।"

এইবার ব্যাপারটা খোলসা হল আরুণির কাছে। সঙ্গমের ম্যানেজার ওর বাবার বন্ধুমানুষ। হলের সবাই ওকে চেনেও। কাজেই আরুণি সঙ্গে গেলে সামনের রোয়ের সস্তা টিকিট কেটেও ড্রেস-সার্কেলে গিয়ে বসা যায়। এই কারণে ডিপার্টমেন্টে আরুণির বেশ কদর আছে।

"হুম। ইউনিভার্সিটি কেটে সিনেমার প্ল্যান হচ্ছে মনে হচ্ছে?" ক্যান্টিনের দিক থেকে আর একটা চেনা গলা ভেসে আসতে সেদিকে তাকিয়ে দলটা ফের একবার গা-টেপাটেপি করে হাসল। থার্ড ইয়ারের নীলাদ্রিদা। ক্যান্টিনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ওদের গলা পেয়ে। হাসির কারণ হল, কথাটা দলটার উদ্দেশে বললেও, তার চোখদুটো করবীর দিকে ধরা।

করবীর মুখটা বেশ গম্ভীর হয়ে উঠল। ফ্রেশার্সের দিন ও একটা অতুলপ্রসাদী গেয়েছিল। ভালোই গায়। সবাই হাততালি-টালি দিল, কিন্তু দেখা গেল নীলাদ্রিদা কেবল হাততালি দিয়ে ক্ষান্ত নয়। এগিয়ে এসে আবেগভরে করবীর হাতটা ধরে বলে, "আহা কী শোনালি রে!" আর সেই থেকে সুযোগ পেলেই করবীর কাছ ঘেঁষে আসবার মতলব করে। ক্যান্টিনে করবীর দেখা পেলে খাওয়াতে চাইবে। ডিপার্টমেন্ট থেকে লেডিজ হস্টেল হাঁটাপথে দশ মিনিট। তাতেও মাঝে মাঝে ছুটির পর পথচলতি করবীর পেছন থেকে বাইক নিয়ে এসে উদয় হয়ে বলবে, "চল পৌঁছে দি।"

আরুণির গা'টা চিড়বিড় করছিল। সঙ্গমে আনহোনি লাভ স্টোরি চলছে। বেশ কিছু মশলা সিন আছে। কোথায় ক্লাসের বন্ধুবান্ধব নিয়ে একটু ফুর্তি হবে, তা না, একটা সিনিয়র এসে ঘাড়ে চেপে বসল। সব এই করবীরটার দোষ।

তবে করার কিছু ছিল না। এ যা নাছোড়। করবীকে যখন দেখেছে তখন সহজে পিছু ছাড়বে না। কিছু বললে খ্যাঁক খ্যাঁক করবে। "সিনেমাহল কারও একার না, আমার ইচ্ছে আমি যাব, আসিস নিউমেরিকাল অ্যানালিসিস বুঝতে, মজা দেখিয়ে দেব..." এইসব নানান কথা।

নীলাদ্রিদা এবারে ফের করবীর দিকে চোখ ধরে রেখে বলে, "তোরা এগো। একটা টিকিট এক্সট্রা কাটবি আমার জন্য। আমি লাইব্রেরিতে বইটা দিয়ে সোজা বাইক নিয়ে হলে চলে আসছি। স্টার্ট হয়ে গেলে তোরা গেটে টিকিট রেখে আমার নাম বলে দিয়ে ঢুকে যাস। আর করবী, তুই আর এই রোদে হাঁটবি কেন? আমার বাইকেই একেবারে..."

করবী তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলল, "না না নীলাদ্রিদা। আমি ওদের সঙ্গে ঘোষপাড়া থেকে ট্রেনেই চলে যাচ্ছি। তুমি পেছন পেছন এসো।" তারপর নীলাদ্রি ছুটতে ছুটতে লাইব্রেরির দিকে চলে গেলে মুখটা আষাঢ়ের মেঘের মতো করে আরুণির দিকে তাকিয়ে বলে, "হাসলে দাঁত ভেঙে দেব।"

আরুণি করুণ মুখ করে বলে "আমি আবার হাসলাম কখন? আমি তো..." বলতে বলতেই তার কথাটথা ভাসিয়ে দিয়ে একরাশ হাসি এসে উদয় হয়েছে। সংক্রামক হাসিটা গোটা দলটার মুখেই ছড়িয়ে পড়ছিল...

***

তবে মাথার ওপর একজন ওপরওলা আছেন। মাঝে মাঝে তিনি সদয়ও হন। হলে পৌঁছে দেখা গেল আজকেই সেই সদয় হবার দিন। একেবারে ছপ্পর ফুঁড়ে সদয়।

সঙ্গমে এলে লাইনটা আরুণিই দেয়। ঠিকঠাক সিটপত্রের বন্দোবস্ত করে নেয় কাউন্টারে সুদেশকাকুকে বলে। তা, হলে পৌঁছে টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে সামনে কাউন্টারের মুখটার দিকে তাকিয়েই দেখা গেল খেলা জমে গেছে। খানিক বাদে

কাউন্টার থেকে টিকিট নিয়ে প্রায় দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে। সেখানে অয়নরা সবে বিড়ি ধরিয়ে টান দিয়েছে। এসে হাসি হাসি মুখে হাত পাতল আরুণি, "দে বিড়ি দে। কাউন্টার নয়। গোটা বিড়ি দিবি।"

"কিঁউ? গোটা বিড়ি কিঁউ? অয়ন চোখ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল।

আরুণি এইবার হেসে ফেলল, "নিউজ । গ্রেট নিউজ। আগে বিড়ি দে।"

"আগে নিউজ বল।"

"ওকে। শোন তাহলে। এম-আর আর এম-আরের বউ। এইমাত্র টিকিট কেটে... হি হি ... 'ইমপর্ট্যান্ট কাজে' হল-এ ঢুকল।"

রেবতী একটু আঁতকে উঠেছিল খবরটা শুনে। বলে, "খাইছে। স্যার আর স্যারের বউয়ের সঙ্গে বসে 'আনহোনি লাভ স্টোরি'..."

আরুণি তাকে আশ্বস্ত করল, "কাউন্টারে দেখে নিয়েছি। ডিসি তে 'ই'-রো। ফাইভ সিক্স। আমরা একেবারে পেছনে গেস্ট রোয়ে ঢুকে যাচ্ছি। টেরও পাবে না। লাস্ট সিন শেষ হবার মুখমুখ উঠে চলে এলেই হল। কুল। কিন্তু আসল মজাটা অন্য। একসঙ্গে দুটো সিনেমা দেখা হবে আজ। একটা আনহোনি, আর একটা 'ই'-রো-এর কমেডি শো।"

"আরুণি অসভ্যতা করবি না। দিনদিন তোর রুচির লেভেলটা..."

আরুণি করবীর দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল, "তোর মনটা হেবি মরবিড হয়ে গেছে করবী। শুধু অশ্লীল চিন্তা মাথায় ঘোরে। আরে সবটা শোন আগে। আমি তোর মঙ্গলার্থেই..."

"আমার মঙ্গলার্থে? তুই? ওরে আমার হিরো রে! তুই টিফিন খেলি কি না সে-খবরটাও রানিমাসি আমার কাছ থেকে নেয়। আর তুই আমার মঙ্গলার্থে..."

আরুণি একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ফিকফিক করে হাসতে হাসতে হাসতে হাতের মুঠো খুলে টিকিটগুলো থেকে একখানা বেছে তুলে নিয়ে করবীর সামনে ধরে বলল, "কমেডি শো-টার একটা হিন্ট দিচ্ছি। নীলাদ্রিদার টিকিট।"

"তা আমি তার কী করব?"

"আরে রো আর সিট নম্বরটা তো একবার খেয়াল করে দ্যাখ! সুদেশকাকুকে বলে ম্যানেজ করলাম।"

এইবার দেখা গেল করবীর ব্যাপারটা বোধগম্য হয়েছে। হি হি করে হাসতে হাসতে টিকিটটা সে অন্যদের সামনে তুলে ধরে দেখাল একবার।

সিনেমাটা বেশ পচা। পেত্নীর সঙ্গে হিরোর ভয়ানক প্রেম চলছে। সস্তার ভিএফএক্স। তবে মশলা সিনগুলো বেশ রগরগে। তবে ওদের আর সেসব দেখবার অবস্থা ছিল না। চারটে রো আগে 'ই' রো-তে ঘটে চলা নাটকটা দেখে পেটের খিল

খুলে যাবার জোগাড় হয়েছিল। পাশাপাশি বসে নীলাদ্রি আর এম-আর গায়ে ছ্যাঁকা লাগবার মতো হাবভাব করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই একেকটা গরম সিন আসে, ওমনি নীলাদ্রি মাথা নীচু করে ফেলে আর এম-আর ছাদের দিকে চোখ তুলে ধ্যানস্থ হয়।

হাফটাইমের সামান্য আগে ওরা উঠে এসে বাইরে একজায়গায় গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর ফের আলো নিভলে ভেতরে ঢুকে দেখা গেল সস্ত্রীক এম-আর বা নীলাদ্রিদা আর হলে নেই।

শো-এর পর বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ফুরফুরে মুখে বেরিয়ে এসে দেখা গেল, আকাশ কালো করে এসেছে। জোলো হাওয়া দিচ্ছে একটু একটু। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক। মার্চের মাঝামাঝি চলছে। এখনও ঠিক ঝড়বৃষ্টির সময় নয়। তবে আজকার আকাশের আচরণের তো আর মাথামুণ্ডু নেই! যখন যা প্রাণে চায় করলেই হল।

মেঘ দেখেই আরুণিরা যে-যার পথ ধরবার মতলব করেছিল, তা ঠিক তখন নীলাদ্রিদা ফের কান এঁটো করা হাসি মুখ নিয়ে এসে উদয় হল। সঙ্গে বাইক। খানিক আগে হলের কেসটা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। অয়ন হাসি চেপে ভালোমানুষের মতো মুখ করে জিজ্ঞাসা করল, "সিনেমা কেমন দেখলে নীলাদ্রিদা?"

"ধুত! থার্ডক্লাস সিনেমা।" যেন কিছুই হয়নি এমন হাবভাব করে নীলাদ্রি মাথা নাড়ল, "আমি তো বোর হয়ে ইন্টারমিশনের পর হল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, এত বোকা-বোকা।"

বলতে বলতেই ফের তার চোখ গিয়ে করবীতে বিঁধেছে, "শোন, এসব ফালতু ট্র্যাশ না দেখে গোদার দেখবি, ত্রুফো দেখবি। একটু পুরোনো, কিন্তু সিনেমার আর্ট কাকে বলে বুঝবি তাহলে। নে। বাইকে বোস। আমি তোকে একদম হোস্টেলে ছেড়ে দিয়ে যাব। যা মেঘ করেছে..."

করবী অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। দলটার মধ্যে সে-ই একা হোস্টেলে থাকে। বৃষ্টির মুখমুখ প্রস্তাবটা অস্বীকার করবার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খাড়া করবার উপায়ও নেই।

"কী রে, আয় বোস। বৃষ্টি আসছে দেখছিস তো। জোরসে চালালে ওর আগেই..."

হঠাৎ কী যেন মনে করে মাথা নাড়ল করবী। তারপর আরুণির দিকে তাকিয়ে বলে, "আজ কি আর তাহলে এসবির বাড়িতে..."

প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও ব্যাপারটা ধরে ফেলতে অসুবিধে হয়নি আরুণির। আহা অসহায় বেচারা! জাস্ট একটু সাহায্য চাইছে! সে ঝোলা থেকে একটা ছাতা বের করে নিয়ে বলল, "না রে। কামাই না করাই ভালো। একটা ছাতায় ঘোষপাড়া স্টেশন অবধি কুলিয়ে যাবে। সীমান্তে নেমে পাশেই তো স্যারের বাড়ি, ঢুকে যাব।"

নীলাদ্রি খানিক আশাহত মুখ করে বলল, "তোরা এখন এসবির কাছে..."

আরুণি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। এসবি নীলাদ্রিদার যম। কোনো অজ্ঞাত কারণে তাকে দেখলেই লোকটা মোষের লাল কাপড় দেখার মতো খেপে ওঠে। পড়াটড়া সব বাজে কথা। করবী ঝোপ বুঝে কোপটা মেরে দিয়েছে।

"স্যার আমাদের দুজনকে আজ বিকেলে একসঙ্গে ডেকেছেন, বুঝলে নীলাদ্রিদা। ইনফারেন্সের কয়েকটা অঙ্ক একটু দেখিয়ে দেবেন। তা, তুমি কি তাহলে করবীকে এসবির বাড়িতে ছেড়ে দেবে? আমি তবে ট্রেনেই বেরিয়ে যাই।"

প্রত্যাশামতোই অন্ধকার মুখে মাথা নাড়ল নীলাদ্রি, "উঁহু। ওই যমরাজের বাড়ির দিকে আমি..."

বলতে বলতেই ফের একঝলক আলো জ্বলে উঠল তার মুখে। করবীর দিকে তাকিয়ে বলে, "আরে তোদের ইনফারেন্স আর কতটুকু। তুই বরং যমের বাড়ি না গিয়ে আমার হোস্টেলে চল, আমি নিজেই..."

আরুণি সঙ্গে সঙ্গে লোপ্পা বলটা ধরে নিয়ে বলল, "রাইট। করবী তুই নীলাদ্রিদার সঙ্গে যা, আমি এসবিকে গিয়ে বলে দিচ্ছি নীলাদ্রিদা তোকে ইনফারেন্স পড়িয়ে দেবে বলে তুই আর স্যারের কাছে..."

নীলাদ্রি মুখটা তেলো হাঁড়ির মতো করে বলল, "থাক। ও উপকারে আমার কাজ নেই। যা তোরা। ভাগ।"

ঘোষপাড়া স্টেশনে এসে দেখা গেল ট্রেন পনেরো মিনিট লেট। মামুর থেকে হ্লাইট কফি মেশানো দুটো চাফি-র ভাঁড় নিয়ে ওরা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাতে চুমুক দিচ্ছিল। নীলাদ্রি কাছাকাছি কোথাও থেকে নজর রাখতে পারে। কাজেই ঠিক হয়েছে ওরা ট্রেনটা ধরে সীমান্ত স্টেশনে নামবে। ওখানে পিকনিক গার্ডেনের পাশে আরুণিদের বাড়ি। সে বাড়ি চলে যাবে আর করবী ওই ট্রেনটাতেই ঘোষপাড়া ফিরে হোস্টেলে চলে আসবে।

ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতেই বৃষ্টিটা নেমে এল। আরুণির খোলা ছাতাটার তলায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার দিকে একটু ঘন হয়ে এল করবী।

আরুণি একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "কী রে? কী হল?"

করবী মুচকি হাসল, "মাথা ঘোরাবি না। ডাইনে চোখ ফেলে দ্যাখ। ব্যাটা বাইক নিয়ে লাইনের ওপাশে দাঁড়িয়ে এদিকে নজর রাখছে।"

"হুম। কিন্তু সেজন্য এভাবে তুই গায়ের ওপর ঠেলে আসবি? আরে ধাক্কা দিস না। পড়ে যাব যে!"

আরুণি সত্যিই একটু টলে গিয়েছিল। ছাতাটা সরে গেছে মাথার ওপর থেকে। দূরে এগিয়ে আসতে থাকা ট্রেনটার মাথা দেখা দিয়েছে ততক্ষণে।

করবী তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে ধরে সামলে নিল তারপর প্ল্যাটফর্মের সামান্য ভেতরের দিকে সরে আসতে আসতে বলল, "একটা হেল্প লাগবে একটু তোর।"

***

"হুঁ। এবারে বল। কী হেল্প।"

ট্রেন গতি বাড়াচ্ছিল। জানালার দিকে চোখ রেখে করবী মিটমিট করে হেসে বলে, "একটু প্রেম করতে হবে আমার সঙ্গে, বুঝলি?"

আরুণি এবারে বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে চোখ গোলগোল করে করবীর দিকে তাকিয়ে দেখে নিল একবার। মেয়েটার হয় মাথাটা গেছে। আর তা নইলে এ সত্যিই ফুলকরবী। নইলে তাকে এসব কথা বলে?"

করবী বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল আরুণির মনের কথাটা। একটু সরে বসে বলে, "আরে তুই হলি আদর্শবাদি যুবক। পড়াশোনা গোল্লায় দিয়ে ইউনিয়ান করিস, স্ট্রিট কর্নার, গণসংগীত... কত সিরিয়াস সব কাজ! তোর ওসব প্রেমফ্রেমের ডিজিজ নেই সে আমি জানি। কাজেই তুই হলি সেফ বেট। তা ছাড়া আমি নিজেও তোর মতো একটা মোষের সঙ্গে..."

"কী বললি তুই? আমি মোষ? তুই..."

"আহা রাগিস কেন? আচ্ছা যা। সিংহ। হল? এবারে কথাটা শুনবি তো? নাকি?"

"হুঁ বল। তোর মাথাটা গেছে বুঝতে পারছি। তবু...বল।"

"আরুণি..." করবীর গলাটা এইবার একটু সিরিয়াস, "এই নীলাদ্রিটা এমন ছিনেজোঁকের মতো পেছনে লেগেছে যে কী করব বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে পারছিস না সে আবার কী? প্রেম করে ফ্যাল। ভালো রেজাল্ট। দুদিন পরে ক্যাম্পাসিং-এ ব্যাঙ্কফ্যাঙ্কে মোটা মাইনের চাকরি জুটিয়ে নেবে। হয়ে গেল তো!"

"মার খাবি কিন্তু তুই আমার কাছে। নীলাদ্রিদার হাইট দেখেছিস? আমায় চুমু খেতে মই ঘাড়ে করে আনতে হবে ওকে। আর তা ছাড়া ওরকম বাঁদরের মত মুখ, কথায় কথায় গোদার-ত্রুফোর বাতেলা দেয়। বলে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা সন্তানের উন্নতিতেই কাজে লাগানো উচিত। প্লাস গাঁজাখোর। আঙুলগুলো দেখেছিস? হলদে হয়ে গেছে।"

"তাহলে ডেকে ক্লিয়ারকাট বলে দে একদিন।"

"তিনবার বলেছি। ঠারেঠোরে, সরাসরি সব। বলেছি এই গা-ঘেঁষা টাইপ আচরণ আমার পছন্দ নয়। কিন্তু কথায় কান না দিলে আমি কী করব? এই টাইপের পাবলিকের ধারণা হল, মেয়েদের না মানে আসলে হ্যাঁ। যত কড়াভাবে বলি, ততই

ঘেঁষটে ঘেঁষটে আসে। তা আজকে হঠাৎ করেই ওর রি-অ্যাকশানটা দেখে মনে হল এই রাস্তাটা নিলে কাজ হতে পারে।"

"হোয়াট রাস্তা?"

"আরে দেখলি না, তোর সঙ্গে যাব বলে ওর অফারটা রিজেক্ট করতে মুখটা কেমন চুনমার্কা হয়ে গেল! আরুণি প্লিজ। দু-একটা হপ্তা। ম্যাক্স দু-একটা মাস। একটু আমার সঙ্গে ঘোর। ক্যান্টিনে, ক্লাসে, কমন রুমে,... একসঙ্গে দু'একটা সিনেমা দেখা... ওতেই এই ছিনেজোঁক খসে পড়বে দেখিস।তারপর তুই তোর মতো আমি আমার মতো।"

সীমান্ত স্টেশন এসে গিয়েছিল। বাইরে হালকা অন্ধকার নেমেছে। বৃষ্টিটা ধরে এসেছে এবারে। ট্রেন থেকে নেমে ওরা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল দু-জনে। ভেজা হাওয়া ছাড়ছে।

দূরে সিগন্যালের লাল চোখ ফের সবুজ হয়ে উঠেছে। করবী ট্রেনে উঠে জানালায় এসে বসল। জানালার বাইরে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আরুণি মিটিমিটি হাসছিল। এইবার খেলাটার মজা তার মনে গিয়ে দোল দিয়েছে খানিক। অনেকটা নাটক-ফাটকের ব্যাপার। রিয়েল লাইফ অ্যাকটিং।

"কী রে?"

আরুণি মাথা নাড়ল, "ওক্কে। তবে দুটো কন্ডিশান আছে।"

"এনিথিং।"

"কন্ডিশান ওয়ান, খরচ-খরচা সব তোর। মানে এই 'প্রোজেক্ট প্রেম'-এর সিনেমার টিকিট, খাওয়াদাওয়ার যা লাগে..."

"মার খাবি? নিজে তো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছ দিব্যি। আমার হোস্টেলের খরচ মিটিয়ে কত থাকে হাতে তা জানিস? বাবার কাছে ওর চেয়ে বেশি টাকা চাইলে পুরো অডিট বসিয়ে দেবে।"

"বাজে কথা বলবি না করবী। তোমার একখানি রানিমাসিমা আছে তো! আমায় মাস গেলে হাজারটা টাকা দিতে দশ হাজার কথা শোনায়। আর সেদিন হোস্টেলে তোর ঘর ইনসপেকশান করতে এসে তোর হাতে একগাদা টাকা দিয়ে গেল না?"

"আমায়? রানিমাসি? টাকা? গাঁজাটাজা খাচ্ছিস তুই? না কী?"

আরুণি একটা চালাকমার্কা হাসি উগড়ে দিল, "প্রুফ হ্যাজ। মা সেদিন মাসিমাকে ফোনে বলছিল। বলে, 'ভেবো না রেখা। করবী তো আমারও মেয়ের মতোই। দেখেও এলাম। হাতখরচের ক'টা টাকা হাতে দিয়ে এলাম। তাতে কী হল? কী গুছুনি মেয়ে হয়েছে গো তোমার! আমার ছেলেটার মতো উড়নচণ্ডী তো নয়। ওকে তুমি বলে দিয়ো দরকারে-অদরকারে আমি কাছেই রইলাম। কোনো সংকোচ না করে যেন।' এই হয় বুঝলি। নিজের ছেলের চেয়ে অন্যের ওপরে বেশি কনফিডেন্স। এনিহাউ। কী আর করা যাবে? মোদ্দাকথা, টাকা তুমি চাইলেই পাবে। এবারে বল, ডিল অর নো ডিল?"

ট্রেনটা লম্বা হুইশিল বাজিয়ে দিয়েছে। ছাড়বে এবারে।

জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে করবী বলে উঠল, "অগত্যা। ডিল। আর দু'নম্বর কন্ডিশানটা?"

"হুম। প্রোজেক্ট লেংথ এক মাস ম্যাক্স।এপ্রিল এন্ড-এ সোশ্যাল আছে। ওর পরে আমি আর এতে নেই, এই বলে দিলাম।"

"কেন রে?" করবী কৌতূহলী মুখে জিজ্ঞেস করল, "মে থেকে শুভদিন-টিন দেখে রিয়েল কোনো অ্যাফেয়ার শুরু করছিস নাকি? হ্যাঁ রে, কোন মেয়েটা রে? সোশিওলজির ঝুনু নয় তো? তোকে দেখলেই কেমন এলিয়ে যায়। আমি খেয়াল করেছি। এই ব্যাটা, বল!"

ট্রেনটা নড়ে উঠেছিল। অরণি কিছু একটা বলবার জন্য মুখটা খুলেও থেমে গেল। চলন্ত জানালায় করবীর মুখটা সরে যেতে শুরু করেছে আস্তে আস্তে। ওকে বলেই দেওয়া যেত। কিন্তু...

আস্তে আস্তে নিজের মনেই মাথা নাড়ল আরুণি। থাক। আঠারোই এপ্রিল রেজাল্ট বেরোবে। পেলে তো এমনিতেই সবাই জানবে। না পেলে, চেপে গেলেই হল। কিন্তু, করবীকে এখন বললে সবাই জেনে যাবে। গতবারের মতো। কত আশা করেছিল সবাই। বাবা, মা, স্কুলের স্যাররা! ঠিক এক পার্সেন্টের জন্য কাট অফটা মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

একটাই সাবজেক্ট তো ভালোবেসেছে আরুণি। অঙ্ক। বাকিগুলোয় যা নম্বর হল তাতে গোটা রেজাল্টের পার্সেন্টেজে শেষমেশ ওই... ইউনিভার্সিটির ওয়েট লিস্টে অনার্স পড়তে আসা। এবারে কেবল বাবা আর মা জানে। আর, একান্ত বাধ্য হয়েই হেড ডিপ সুশীলবাবুকে বলতে হয়েছে। পুজোর পর একটা মক টেস্টে রেজাল্টের হাল দেখে ভদ্রলোক খেপে গিয়ে ওকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "এটা ছেলেখেলা নয়। পড়াশোনাটা না করতে ইচ্ছে হলে ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে দাও। এত শার্প একটা ছেলে! অর্ধেক ক্লাস তো বাঙ্ক করো। অ্যাটেনডেন্সের রিকোয়ার্ড পার্সেন্টেজটা অবধি নেই।"

তখন ওকে বলতে হয়েছিল। বলে অনুরোধ করেছিল, স্যার কাউকে যেন না বলেন। স্যারের বোধায় একটু কৃপাই হয়েছিল ওর মুখটা দেখে। তারপর চুক্তি হয়েছে, এপ্রিলের পর যদি ও ডিপার্টমেন্টে থাকে তবে জুন-এর থার্ড সেমেস্টারে ওকে টপ করতে হবে। থার্ড সেম-এর সিলেবাসটা দেখেও রেখেছে আরুণি। ইউজির বাকি সিলেবাসের মতোই। সরল। বোকা-বোকা জিনিসপত্র। মাসখানেক দোর বন্ধ করে বসে খানিক গাধার মতো গিললেই ও হয়ে যাবে।

***

'নে। রিপোর্ট বল।'

হোলির ক'দিন বাদে দুপুরবেলা। লাইব্রেরির পেছনদিকটায় ঘোরানো সিঁড়িটার ল্যান্ডিং-এ বসে কথা হচ্ছিল। এ-জায়গাটা ইউনিভার্সিটির প্রেমিক-প্রেমিকাদের রেজিস্টার্ড অঙ্গন। সিঁড়ির ওপর-নীচের নানান ধাপে বেশ কিছু জুটি বসে বকমবকম করে যাচ্ছে।

"রিপোর্ট প্রমিসিং," করবী হাতের বইটার দিকে চোখ রেখেই মাথা নাড়ল, "নীলাদ্রিদা শুনলাম তোর নামে যা তা বলে বেড়াচ্ছে। সোশিওলজিতে গিয়ে আমার হোস্টেলের রুমমেট শ্যামলীদিকে ধরেছিল কাল বিকেলে। ওদের এক ব্যাচের তো। ওই যে, ও ব্যাটা হোলির দিন আমায় টার্গেট করে তেড়ে আসছিল, তখন তুই আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে মুখে, মাথায় আবির ঢেলে দিলি, সেটা মোবাইলে ছবি তুলেছে। ওই দেখিয়ে শ্যামলীদিকে বলে এসেছে, নাকি একটা ফালতু, পড়াশোনায় ঢোলগোবিন্দর সঙ্গে আমার এরকম পাবলিক ঢলাঢলিটা মোটেই ভালো দেখাচ্ছে না। যেখানে দেখো জুটি বেঁধে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে, ক্লাস কেটে দুজন মিলে সিনেমা যাচ্ছে আর হোলির নামে যা করেছি সে নাকি অকথ্য। লোকে অন্য কিছু ভাবতে পারে।"

"হুম। তা এসব যে বলেছে সেটা তুই জানলি কী করে? তুই ওখানে ছিলি?"

"উঁহু। শ্যামলীদিই বলল রুমে এসে। ভীষণ রেগে গেছে শ্যামলীদি।"

"রাগবারই কথা। একটা মেয়ের নামে এভাবে..."

"আরে ধুৎ! তুইও যেমন। শ্যামলীদি একদম ব্রাহ্ম ইশকুলের হেডমিস্ট্রেস হবার জন্য জন্মেছে। উলটে আমাকেই একগাদা জ্ঞান দিল। তারপর কী বলে জানিস? হি হি..."

"কী?"

"বলে, 'নীলাদ্রি তোকে খুবই পছন্দ করে করবী। কিন্তু এবারে ও তোর ব্যাপারে আস্তে আস্তে ইনটারেস্ট হারাচ্ছে। ঠারেঠোরে আমায় বলে গেল। নিজের ভালোটা বোঝ। এসব ফালতু ফ্লার্টিং বন্ধ কর এবারে। ওর রেজাল্ট তো জানিস! তা ছাড়া ছেলেটাও প্রচণ্ড ভালো। অনেস্ট। বছরদুয়েকের ডিফারেন্সও আছে তোর সঙ্গে। সামনেই ওদের ক্যাম্পাসিং।"

"উ লা লা... হা হা, পারফেক্ট ম্যাচ। তা তুই কিছু বললি না?"

করবী দাঁত বের করে হাসল, "বলেছি তো। আর বলার পর থেকে শ্যামলীদি আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছে।"

"গ্রেট। তা কী বললি শুনতে পাই?"

"বললাম, 'ইনটারেস্ট হারাচ্ছে সে আমার সৌভাগ্য। তাহলে বরং তুমি গিয়ে এবারে ভালোছেলের গলায় ঝুলে পড়ো না!' তারপর তো পুরো সিন! ভ্যাঁ করে কেঁদেটেদে সে যা তা কাণ্ড।"

"অ্যাঁ? সে কী? কেঁদেছে? তার মানে কেস তো..."

করবী মুচকি হাসল। আজ একটা ময়ূরকণ্ঠী সালোয়ার কুর্তা পরেছে ও। হালকা ন্যাচরাল কালার লিপস্টিক। সেদিকে নজর করে আরুণি হাসল একটু। মেয়েটা পড়েও, সাজেও। দুটোতেই তুখোর। নীলাদ্রি বেচারার আর দোষ কী?

"কেস জন্ডিস। নীলাদ্রিদা যদি একবার একটু শ্যামলীদির ইমোশনটা খেয়াল করত..."

বলতে বলতে আরুণির দিকে ঘুরে বসল করবী, "আসলে কথা কী জানিস? তোরা ছেলেরা এক-একটা আস্ত বোকা। চোখ থেকেও অন্ধ। বাড়িয়ে ধরা ঠিক হাতটা চোখে দেখেও চিনতে পারিস না।"

করবীর ডানহাতটা আলগোছে এগিয়ে আরুণির কনুই ছুঁয়ে আছে। সোনার জল করা একটা মাত্র পাতলা বালা ওতে। শ্যামলা হাতে কী চমৎকার যে মানিয়েছে!

আরুণি ফিক করে হেসে ওর হাতটাকে ছুঁয়ে দিয়ে বলল, "বড্ডো জেনারেলাইজড কমেন্ট। এই তো। এটা শ্রীমতী করবীর বাড়িয়ে ধরা ডানহাত। আমি দিব্যি চিনতে পারছি!"

"ফালতু ইয়ার্কি করিস না তো আরুণি!" একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হাতটা সরিয়ে নিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল করবী।

প্রতিক্রিয়াটা একটু অপ্রত্যাশিতই ছিল আরুণির কাছে। সে-ও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আরে এই করবী! আমি তো জাস্ট একটু ইয়ার্কি..."

সিঁড়ি দিয়ে দুপ দুপ কর নেমে যেতে যেতে করবী বলল, "ওসব ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না আরুণি। আর কয়েকটা দিন স্লাইট কষ্ট কর। কিন্তু প্লিজ এসব রসিকতা তুই আমার সঙ্গে করবি না।"

আরুণি ফের সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল। মাথার ওপর ঝুঁকে থাকা গাছটার পাতায় হাওয়া বইছে। হালকা গরমের ছোঁয়া লাগছিল তার গালে। একটু কষ্টই হচ্ছিল তার করবীটার জন্য। কেন যে হঠাৎ এমন দুঃখ পেয়ে গেল এ, কে জানে! আরুণি তো স্রেফ একটু মজাই করেছিল...

বিকেলে ক্লাসের পর রিহার্সালের সময়টাও করবী বেশ গম্ভীর হয়ে রইল। তিনদিনের মাথায় সোশ্যাল। সিধুদা বেজায় কড়া ডিরেক্টর। সাড়ে পাঁচটা বাজতেও করবী না আসতে হোস্টেলে ফোন করে ডাকিয়ে এনেছে। আরুণি খানিক অপরাধী-অপরাধী মুখ করে ওর কাছাকাছি ঘুরল কিছুক্ষণ, লাভ হল না। কথাই বলছে না করবী। কেবল, যন্ত্রের মতো ওর সঙ্গে শ্যামা-উত্তীয়র দৃশ্যগুলোর রিহার্সাল দিয়ে ফের মুখ গোঁজ করে হোস্টেলের দিকে চলে গেল।

অবশ্য তাতেও আখেরে লাভই হয়েছে দেখা গেল অবশেষে। নীলাদ্রি দুখী আত্মার মত রিহার্সাল রুমের চারপাশে ঘুরঘুর করছিল। ও বেচারার এসব কালচার-টালচার বিশেষ আসে না। তা-সত্ত্বেও কেন যে এ-চত্বরে এহেন ঘুরঘুর করে সেটা মোটামুটি

সবাই জানে। সিধুদা অতএব তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে একটা শয়তানি হাসি হেসে ডেকে বলে, "বুঝলি নীলাদ্রি, করবীদের বোধায় মান-অভিমান চলছে কিছু একটা। ও ঠিক হয়ে যাবে। আঃ, দুটোয় যা মানিয়েছে না, শ্যামা-উত্তীয়তে।"

জবাবে নীলাদ্রিদা বিড়বিড় করে কী বলল সেটা শোনা না গেলেও সে যে ভালো কোনো কথা নয় সেটা বুঝতে আরুণির সমস্যা হয়নি। কাজেই বাড়ি আসতে আসতে মনটা বেশ ফুরফুরেই হয়ে উঠছিল তার। আহা, মেয়েটার অনেক টাকা খসেছে এই ক'দিনে। এবারে এ-আপদ খসে গেলে প্রোজেক্ট সাকসেসফুল।

বাড়ি এসে দেখা গেল মা হাসি হাসি মুখ করে ঘুরছে। আরুণি এসে ঢুকতে রাগ রাগ মুখ করে বলে, "এই যে, নবাবের এতক্ষণে আসবার সময় হল। নিজে তো আর সাইট-টাইট চেক করবে না। সবই মায়ের ঘাড়ে।"

আরুণি কিছু একটা বলতে গিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই মা এসে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে। বলে, "দুপুরে রেজাল্ট বেরিয়েছে রে। তুই পেয়ে গেছিস।"

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিয়ে উঠল আরুণির। খানিক চুপ করে থেকে তারপর আস্তে আস্তে বলল, "তুমি ঠিক দেখেছ মা? আ...আমি রামানুজন কলেজ অব ম্যাথস্-এ..."

"হ্যাঁ রে। সেভেন্থ র‍্যাঙ্ক করেছিস তুই।"

বলতে-বলতেই হঠাৎ মায়ের গলাটা কেমন যেন একটু বিষণ্ণ হয়ে উঠল, "মে-র শুরুতে নয়ডা ক্যাম্পাসে রিপোর্ট করতে হবে। মানে আর ক'টামাত্র দিন। তারপর তো..."

হঠাৎ করে, এতদিনের সব চেষ্টা, গত একটা বছরের ভেতরে ভেতরে কুরে কুরে খাওয়া যন্ত্রণার থেকে মুক্তি, সেই সব কিছুর উল্লাস চলে গিয়ে বুকের ভেতরটা একেবারে অকারণেই চিনচিন করে উঠল আরুণিরও। চলে যেতে হবে।

মা... না মা নয়... অন্য একটা মুখ... একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে, তার অজান্তেই কখন যেন মুখটা এসে বুকের ভেতরে কোথাও তার লুকিয়ে বসেছিল। আজ আনন্দ আর দুঃখের মিশেল দেওয়া এই অপ্রস্তুত মুহূর্তটার সুযোগে সেটা বাইরে বেরিয়ে এসে তার মর্ম ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বসেছে হঠাৎ। বারবার মুখটাকে সেখান থেকে যত সরিয়ে দিতে চায় আরুণি, ততই বারংবার গত দু-তিনটে সপ্তাহের প্রত্যেকটা মুহূর্ত... সেদিন দুপুরে মেয়েটার ওই রাগ আর অকারণ অভিমান ভরা মুখটা... সব কিছু অবাধ্যের মতন ঝাঁপিয়ে আসে তার বুক জুড়ে।

"আরে এই দেখ, আমি তো এমনি একটু মজা করলাম। তাই বলে একটা আনন্দের দিনে তুইও মুখটা প্যাঁচার মতো করে বসবি? আরে মা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না!"

প্রায় জোর করেই চিনচিনে দুঃখটাকে ফের চাপা দিয়ে আরুণি মিথ্যে কথাটা বলেই ফেলল, "কিন্তু মা, তোমায় ছেড়ে..."

***

"ফ্যান্টাসটিক। তোদের অনস্টেজ কেমিস্ট্রিটা... উফ। জাস্ট ভাবা যায় না। 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া' গানটার সময় যা ইনটেন্স এক্সপ্রেশন দুটোর... উফ্।"

বলতে বলতে তাদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে সিধুদা গ্রিনরুম থেকে বেরিয়ে গেল।

এখানে এখন কেবল আরুণি আর করবী। আয়নার সামনে পাশাপাশি দুটো চেয়ার। এতক্ষণ ধরে মঞ্চে শ্যামা-উত্তীয়র প্রেমের অভিনয়ের মেক-আপ ঘষে ঘষে তুলে ফেলছিল তারা। বাইরে স্টেজে অন্য প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেছে।

"তাহলে আর সাতদিন তাইতো?" করবী হঠাৎ নীচুগলায় বলে উঠল।

আরুণি মাথা নাড়ল, "ইয়েস। আর, ইতিমধ্যে তোর প্রোজেক্ট যে সাকসেসফুল সে তো বলাই বাহুল্য।"

করবী মাথা নাড়ল। স্টেজ থেকে সামনের রো-য়ে পাশাপাশি বসা নীলাদ্রি আর শ্যামলীর হাসিমুখদুটো তার চোখে এখনও ভাসছে।

"ভালোই হল, বুঝলি। আসলে শ্যামলীদিকে আমি নিজেই কয়েকদিন কাউন্সেলিং করেছি। বললাম, এভাবে চুপ করে না থেকে নিজের স্ট্যান্ডটা তুমি নীলাদ্রিদাকে ডেকে পরিষ্কার করে বলো। তারপর ইয়েস বা নো যা হবার সেটা ক্লিয়ার কাট হয়ে যাক। এভাবে বুকের ভেতর ব্যাপারটাকে বয়ে বেড়িয়ে কষ্ট পাবার মানে নেই। প্রথমে তো কিছুতেই রাজি নয়। শেষে কোন ফাঁকে গিয়ে সব সেটিং করে নিয়েছে কে জানে। আজ সোশ্যালে জিনিসটা পাবলিক করল তবে।"

"যাক। তুই তবে নিশ্চিন্দি। এবারে আর কেউ..."

"নাঃ। আর কেউ জ্বালাবে না। এবার আমি একদম নিশ্চিন্ত। থ্যাঙ্ক ইউ আরুণি। তুই এবারে খুশিমনে নিজের রাস্তায় চলে যা। থ্যাঙ্কস... গত দুতিন সপ্তাহ জুড়ে তোর অ'সাম অভিনয়ের জন্য... আমাকে এই হেল্পটুকু করবার জন্য... ফর এভরিথিং..."

গলাটা হঠাৎ বদলে গিয়েছে করবীর। কাঁসার বাসনে সামান্য চির ধরলে যেমন প্রায় অশ্রুত বেসুর বাজে তাতে... এমনিতে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু সঠিক কানে সে বেসুর ঠিকই সাড়া জাগায়...

চমকে উঠে তার দিকে ঘুরে দেখল আরুণি। আর তারপর, উঠে গিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাতটা রাখল, "হ্যাঁ রে করবী, সিরিয়াসলি একটা কথা বল তো? তুই বোধ হয় এই ক'দিন আমার সঙ্গে ঠিক অ্যাক্টিং করিসনি... তাই না?"

একটুক্ষণ স্থির হয়ে রইল করবী। তারপর আস্তে আস্তে দুদিকে মাথা নাড়ল, "আসলে তুই ঠিক নামই দিয়েছিলি আমার আরুণি। আমি একটা ফুল করবীই বটে। বুঝতেই পারিনি... কখন যে..."

খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আরুণি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কেলোটা কী জানিস? আমি নিজেও ভাবছিলাম অ্যাক্টিং করছি। কিন্তু এখন মনে

হচ্ছে, ঠিক অ্যাক্টিং নয়... হ্যাঁ রে যদি সত্যি সত্যিই...”

চোখ তুলে তার দিকে তাকাল করবী। তারপর মুখে হাসি আর চোখে জল নিয়ে বলল, “হুঁ। বুঝলাম। এবারে শোন, যাচ্ছিস যা, ভালো কথা। কেরিয়ার সবার আগে। কিন্তু জাস্ট অঙ্ক নিয়ে বেভুল হয়ে পড়ে থাকবি না। মা-বাবা এগারোটায় শুতে যায়। অতএব, রোজ রাত এগারোটা দশে হোয়াটসঅ্যাপে...”

“তোকে একটা করে ভিডিয়ো কল। শিওর।” আরুণি তার অসমাপ্ত বাক্যটা শেষ করে দিল। তারপর তার মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিতে দিতে বলল, “ব্যাটা ফুল করবী কোথাকার। এবার থেকে আমার কাছে ওটা তোর পার্মানেন্ট নাম হয়ে রইল।”



গৌরিপিসির গল্প

ইদানীং ইতিউতি ঘোরাঘুরির বাতিক হয়েছে। আসলে ব্যাপার হল বয়েস হয়েছে। চাকরিবাকরির পাট সে-ও চুকেছে অনেকদিন হল। ছেলেপিলে চাকরি, সংসার নিয়ে এদেশে-ওদেশে ব্যস্ত। বাড়িতে তো সেই 'সঙ্গে যাবে কে? না এর সঙ্গে আমি আর আমার সঙ্গে এ।'

আমি তাই ইদানীং একটা কায়দা ধরেছি। বেশি গরম-টরম না থাকলে করি কী, সকাল সকাল চান, খাওয়াদাওয়া সেরে উঠে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে স্টেশনে চলে যাই। একটা মান্থলি কাটা আছে। ট্রেনে চেপে তিন-চার স্টেশন যাই। তারপর নেমে এসে যে শহরে এলাম তার নানান জায়গায় ঘোরাফেরা করে, তার বাজারে, চায়ের দোকানে আড্ডা-টাড্ডা মেরে সন্ধেবেলা ফিরে আসা। মন্দ সময় কাটে না। সাধু, চোর, হকার, জোকার সব মিলে বেশ একটা লাইব্রেরি যেন। তার হরেক গল্প। যেমন ধরুন কদিন আগে খড়দা স্টেশনে এক ব্যাটা এসে নাগাল ধরল। তার বক্তব্য, স্টেশনের পাশেই তার এক কবিরাজ বন্ধুর ঘাঁটি। সেখানে গ্যারান্টি দিয়ে যৌবন পুনরুদ্ধারকারী টনিক মেলে। তার সঙ্গে গেলেই যৌবন ওয়াপিস। তা, আমি বেজায় উৎসাহে তার আছ থেকে সে টনিকের গুণাগুণ থেকে শুরু করে বার্ধক্যের বেজায় দুঃখুকষ্টের নানান গল্প করে শেষমেশ ডাউনের দিকে একটা ট্রেন আসতে যেই তার হাতল ধরে উঠতে যাব, তা সে হতচ্ছাড়া তখন, "শালা বুড়্ঢা, কিছুই খসাবি না তো তোর কলমটাই..." বলে খপ করে বুকপকেট থেকে তিনটাকা দামের ডটপেনটা তুলে নিয়ে দৌড় দিল।

আবার উলটোটাও হয়। মাঝেমধ্যে এমন মিষ্টি কিছু ছবি আর স্মৃতি নিয়ে বাড়ি ফিরি, সে বলার নয়। তেমন একটা দিনের কথা বলি।

সেদিন ট্রেন ধরে একেবারে সেই কল্যাণী গিয়ে উঠেছিলাম। কল্যাণী মেইন ছেড়ে আরো দুটো ইস্টিশান গিয়ে কল্যাণী ঘোষপাড়া। সেখানে সতীমায়ের মেলা চলছে শুনেছিলাম ট্রেনেই। ভাবলাম গিয়ে দেখে আসি।

তা মেলা-টেলা ঘুরে স্টেশনে ফিরেছি, আকাশে বেশ মেঘ-মেঘ করে এসেছে তখন। চারপাশে সবুজগুলো কেমন কালচে ছোপ মেরে রয়েছে। ভিজে হাওয়ায় শীত শীত লাগছিল খানিক। লেভেল ক্রসিং খোলা। তার মানে ট্রেন ঢুকবার দেরি আছে। কাজেই লেভেল ক্রসিং-এর পাশে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসা গেল। টিপ টিপ করে বৃষ্টি নেমেছে তখন। ঝিমঝিম করছে দুপুর। দোকানে লোকজন নেই বিশেষ।

হাতে চায়ের ভাঁড় নিয়ে তাতে চুমুক দিতে দিতে চারপাশটা একবার ভালো করে দেখে নিলাম। মেলাফেরত একজন দুজন লোক তখন স্টেশনমুখো হয়েছে। তারা আসে, চা, সিগারেট কিনে খেয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে চলে যায় ছাতা খুলে। আমার অবশ্য ট্রেন আসবার আগে দোকানের আশ্রয় ছেড়ে নড়বার কোনো ইচ্ছে ছিল না। কাজেই মিনিট দশ বাদে বাদে দোকানদারের ভ্রূটা কুঁচকে উঠতে আরম্ভ করলেই আর একটা চা বলে দিই। তিনটাকা করে, এইটুকুন ভাঁড়ের এককোঁটা চা... তাই দিয়ে আরো দশ মিনিট কেটে যায়। অতএব দোকানের স্থায়ী সদস্য বলতে তখন মালিক আর আমি।

তবে আরও দুজন তখন সেখানে হাজির ছিল। তারা কেউই দোকানের খদ্দের নয়। চা হাতে বসে বসে আমি এই দুজনের দিকে নজর রাখছিলাম খানিক খানিক। তাদের একজনের বয়েস ষাটের খানিক ওপার। চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। কাঁধে একটা তেলচিটে ঝোলা। তার ভেতর থেকে হলদেটে রঙের হাসপাতালের কার্ড উঁকি মারছে। কাছাকাছি সরকারি হাসপাতাল আছে। সম্ভবত সেখানেই দেখাতে এসেছিলেন। এখন ডাক্তারের নিদান-টিদান নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। সঙ্গে ছাতাটাতা কিছু নেই। একলা-একলা দোকানটার মুখে রাখা একটা টুলের ওপর বসে রয়েছেন। মাথার ওপর দোকানের চালটা খানিক এগিয়ে আছে। বৃষ্টির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতেই বোধ হয় এখানে তাঁর আশ্রয় নেওয়া।

দোকানদার মাঝে মাঝেই সেদিকে বাঁকা চোখে তাকায়। কানাকড়ি খরচ না করে তার টুলটাকে এভাবে দখল করে রাখা যে তার বিশেষ পছন্দের নয় তা তার সেই বাঁকাচোখের চাউনিতেই পরিষ্কার। দৃষ্টিটা তাঁর দিকে ঘুরলেই মানুষটা আরও জড়োসড়ো হয়ে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছিলেন।

একেবারেই সাদামাটা, নজরে না পড়া একজন মানুষ। দোকানদারের বিরক্ত দৃষ্টি বাদে আর কারও দৃষ্টিপ্রসাদ তাঁর ভাগ্যে জুটছিল না। জোটবার কথাও ছিল না। তার কারণ, দোকানের দু'নম্বর না-খদ্দের। উজ্জ্বল গৌরী সে মেয়ের রূপ সত্যিই নজরকাড়া।

ছিপছিপে গড়ন। পরনের জিন্‌স আর সফেদ টি-শার্টে ঝকমক করছে যেন। কাঁধে তার একটা শান্তিনিকেতনি ঝোলা। সেখান থেকে মোটকা এক জটিল অঙ্কের বই উঁকি মারছিল। বোঝা যাচ্ছিল কাছেই থাকা কল্যাণী ইউনিভার্সিটির ছাত্রী সে।

কারও দিকে চোখ নেই সে মেয়ের তখন। আপনমনেই সে তার হাতের মোবাইলে খুটুরখাটুর করে, মাঝে মাঝেই ইতিউতি ঘুরে তাকায়, ফোনে কোনো একটা নম্বর রিডায়াল করে, তারপর জবাব না পেয়ে মুখটা ভার হয়ে ওঠে তার।

বেশ বোঝা যাচ্ছিল, কারও জন্যে অপেক্ষায় রয়েছে সে। মুখে তার রাজ্যের বিরক্তি। আর তাইতেই আরও বেশি সুন্দরী মনে হয় তাকে। বুঝতে পারছিলাম, যার জন্য অপেক্ষা, তার কপালে আজ খানিক দুঃখ আছে। সুস্বাদু দুঃখ অবশ্য। আমি জানি। সেই প্রেমপর্ব থেকে শুরু করে, এই কয়েক বছর আগে অবধিও তো সময়ে কথা দিয়ে রাখতে না পারবার গঞ্জনা আমায় সইতে হয়েছে আমার অনীতার কাছে!

বলা বাহুল্য, এমন কেউ পাশে থাকলে আর কারও দিকে মানুষের চোখ যাওয়া সম্ভব নয়। আশপাশ দিয়ে চলে যাওয়া নারীপুরুষযুবাবৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই একঝলক দৃষ্টির অঞ্জলি দিয়ে যাচ্ছিল সে-মেয়ের রূপের বেদিতে। "ক'টা বাজে?", "টিকেট কাউন্টারটা কোনদিকে?" "ট্রেন কি অ্যানাউন্স করল?" ইত্যাদি নিতান্তই অনাবশ্যক সব বাক্যবিনিময়ে তার মনোযোগটি খানিক পাবার চেষ্টাও চলছে অবিরত, বিশেষত ইউনিভার্সিটি ফেরত হরেক কিসিমের তরুণ রূপমুগ্ধদের তরফে।

তরুণীটির মুখে অহংকারী ঔদাসীন্য। তবে একটু গর্বও যে হচ্ছে তার সেটি তার চোখ দেখলেই টের পাওয়া যায়। সব বিরক্তি উপচে চোখদুটোয় লুকোনো হাসির আলগা ছোঁয়া। পায়ের তলায় গোটা দুনিয়া, এমনটা মনে হলে, পুজো পাওয়া সুন্দরী মেয়েদের চোখে যে হাসির আভাস ফোটে, ঠিক সেইরকম।

টুলে বসে মাঝে মাঝেই স্তিমিত চোখে তাই দেখছিলেন সেই প্রৌঢ়া। তাঁর চোখদুটি ভারী উদাস। উদাস? না স্মৃতিমেদুর? কে জানে!

"আচ্ছা, আপনি চাকদার গৌরীপিসি না?"

হঠাৎ নতুন একটা গলার আওয়াজ পেয়ে ঘুরে তাকালাম আমরা। মেয়েটাও তখন তার মোবাইল, দৃষ্টিপ্রসাদ প্রার্থী হাজারো চোখের পুজো, সেই সব কিছুকে উপেক্ষা করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে নবাগত ছোকরাকে দেখে। রাগ আর অনুরাগের মিশেলে যে অনির্বচনীয় মুখ একমাত্র সুন্দরী সদ্যযুবতিদের দখলে থাকে, সেই মুখ তখন তার।

ছোকরার ভারি ঝকঝকে চেহারা। ছিপছিপে, লম্বা, কাঁচা হলুদের মত গায়ের রঙ। উলোঝুলো চুল আর না-কাটা একরাশ দাড়িগোঁফ। পরনে বয়সোচিত তাপ্পি দেয়া জিন্‌স, স্টিল গ্রে একটা টি-শার্ট।

মেয়েটা একমুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে কী যেন একটা বলতে গিয়েছিল। তা ছোকরা দেখি, অন্য ধাতুর বস্তু। সুন্দর মুখের জাদু তার ওপরে মোটেই কাজ করছে না। যেন বেজায় উপেক্ষায় কনোকে হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে সে প্রৌঢ়ার আরও কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে তখন। জিজ্ঞাসু চোখদুটিতে তার ভালোবাসা টলমল।

প্রৌঢ়া এবারে ঘুরে তাকালেন তার দিকে। একটু অবাক। কিন্তু মনোযোগটা পেয়ে যেন খুশি হয়েছেন খানিক। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "না গো। আমি... চাকদার লোক নই। গয়েশপুর থেকে হাসপাতালে..."

শুনে ছোকরা যেন অবাক হল ভারি। বলে "কী আশ্চর্য। একেবারে অবিকল আমার গৌরীপিসির মতন দেখতে তো আপনাকে। তেমনি গায়ের রং। তেমনি সুন্দর।"

হঠাৎ করেই প্রৌঢ়ার মুখের বিষণ্ণতার দাগগুলো দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছিল। ঝোলা সামলে উঠে ছেলেটার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন তিনি, "হ্যাঁ বাবা, তোমার পিসি বুঝি খুব সুন্দর দেখতে?"

"হ্যাঁ মাসীমা। অনেকদিন দেখিনি। আসাও হয় না চাকদার দিকে আজকাল। আপনাকে এখানে দেখে তাই প্রথমে একটু চমকে গিয়েছিলাম। ঠিক তেমনি সুন্দর। এমন সুন্দর দেখতে মানুষ আজকাল আর দেখা যায় কই!"

হঠাৎ করে প্রৌঢ়ার মুখে দেখি একটুকরো হাসি ফুটেছে। খেয়াল করছিলাম, সত্যিই তাঁর মুখটিতে কোথাও, হারিয়ে যাওয়া এককালের রূপের স্মৃতিটুকু যেন ফিরে আসছে, সকালের আবছা আলোর মতন। মাথা নেড়ে বলেন, "দূর। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, তার আবার সুন্দর আর অসুন্দর! তবে হ্যাঁ বাবা, তুই কিন্তু সত্যিই খুব সুন্দর দেখতে, জানিস! মরি মরি। এ যেন গৌরাঙ্গ এসে দাঁড়িয়েছিস সামনে!" বলতে বলতেই কোনো অজানা আশঙ্কায় একটু শিউরে উঠে তার চিবুকটা ছুঁয়ে ঠোঁটে ঠেকিয়ে তিনি বলেন, "এই দ্যাখো। শেষে নজর না লাগে আবার!"

তা দেখা গেল ছোকরা যতই তাপ্পি মারা জিন্‌স পরুক আর ইন্টেলেকচুয়াল চুলদাড়ি রাখুক, মা মাসিদের এই ব্যাপারগুলোয় তার দিব্যি জ্ঞান আছে। বলে, "এ মা মাসিমা, মা-মাসিরা ভালো দেখতে বললে আবার নজর লাগে নাকি? ছাড়ুন তো!"

কথাগুলো বলতে বলতেই পাশে দাঁড়ানো তরুণীর গম্ভীর মুখটার দিকে তার ঝিলমিলে চোখদুটো নিঃশব্দে কিছু একটা কথা ছুড়ে দিল যেন! যেন বলছে, "এই দ্যাখ! আমাকেও লোকে..."

তারপর ফের মহিলার দিকে ঘুরে সে বলে, "চলুন দেখি মাসীমা, আপনি আমার গৌরীপিসি না হলেন তো কী, আপনার সঙ্গে বসে একটু চা খাই। খাবেন তো?"

পাশে দাঁড়ানো তরুণীর মুখটা দেখি ততক্ষণে বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। ছেলেটা সেইদিকে পাত্তা না দিয়ে প্রৌঢ়ার হাত ধরে যত্ন করে দোকানের ভেতরে নিয়ে গিয়ে

বসাল। তারপর বলল, "দুটো চা আর একটা ডিমটোস্ট দেখি সুধীরদা : তাড়াতাড়ি : ট্রেনের টাইম হয়ে গেছে।"

বলতে বলতেই প্রৌঢ়ার দিকে মুখ ফিরেছে তার। হাসি-হাসি মুখে বলে, "হাসপাতাল থেকে আসছেন তো মাসিমা! খিদে পেয়ে গেছে সে আমি মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি। সুধীরদার ডিমটোস্ট! আহ্! ফাস্টক্লাস। ওই খেয়েই তো বেঁচে আছি! খেয়ে দেখুন একবার কেবল!"

তার গলায় এমন একটা আন্তরিকতার ছোঁয়া ছিল যে তাকে ফেরানোর সাধ্য ছিল না প্রৌঢ়ার। দেখি চোখদুটোয় তাঁর জল চিকচিক করছে। অবজ্ঞা সইতে সইতে ঔদাসীন্যের যে শক্ত প্রলেপ আঁকড়ে রয়েছে তাঁর মুখে, তাতে কোথায় যেন ফাটল ধরেছে একটা। সেই ফাটল বেয়ে রোদের ঝলকানির মতো একচিলতে হাসি বের হয়ে এসে মুখটাকে তাঁর ঝলমলে করে তুলছিল।

বসে বসে তাই দেখি। বড়ো ভালো লাগে। আমার ছেলেটার কথা মনে পড়ে। সে-ও এমনি হাসত। এখন জার্মানিতে থাকে। ওখানেই সেটল করেছে। আমাদের নিয়ে যাবে বলেছিল। রাজি হইনি। আহা বেঁচে থাক। ভালো থাক।

হঠাৎ মাইকের শব্দ শুনে চমকটা ভেঙে গেল। ডাউন কল্যাণী এনাউন্স হচ্ছিল।

সেই শুনে মেয়েটা গম্ভীর মুখে এদিকে একঝলক তাকিয়ে গটগট করে প্ল্যাটফর্মের দিকে চলে গেল। ছেলেটা এবারে একটু চঞ্চল হচ্ছিল। প্রৌঢ়ার খাওয়া ততক্ষণে শেষ। তাঁর দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আমার ট্রেন বলে দিল মাসিমা, আজ যাই?"

"হ্যাঁ বাবা। আয়। তুই এ জন্মে না হলেও আর জন্মে আমার কেউ ছিলি। ভালো থাকিস বাবা।"

***

"রাগ করেছ মনে হচ্ছে?"

ট্রেন ছুটছে মেঘলা আকাশ মাথায় নিয়ে। বাইরে সবুজ। জানালায় বৃষ্টির ছিটে।

বসে ছিলাম ভেতরের দিকের এক সিটে। আমার পেছনের দিকের জানালার পাশের দুখানা সিটে তারা দু-জন। পাশাপাশি। ছেলেটা আর মেয়েটা।

"করেছিই তো।" অভিমানিনী জবাব দিল, "একে তো আধঘণ্টা দেরি করে এলি। এসে পাত্তাও দিচ্ছিলি না। তার ওপর, আজকালকার মেয়েদের মধ্যে রূপগুণ নেই। তাদের চেয়ে তোমার কে না কে গৌরীপিসি..."

"ও হরি। এই ব্যাপার?" ছেলের মুখে হাসি ফুটেছে এবারে। মাথা নেড়ে ঠোঁটে একটা দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে সে বলে, "ধুত! গৌরীপিসি বলে আমার কেউ কোথাও নেই। আমি তো জীবনে একটা গৌরীকেই জানি, তাই মিথ্যে বলতে গিয়েও তোর

নামটাই মুখে চলে এল। আমার গৌরীর মতো রূপ আর কারো নেই। সে কথাটা আমি ভুল বলিনি কিন্তু।"

"আাঁ সে কী রে? মহিলার মুখের ওপর এমন জলজ্যান্ত একটা মিছে কথা তুই..."

হঠাৎ করেই হাসি ফিরে এসেছে কন্যের মুখে। পাশে বসা সঙ্গীটির গায়ে আদুরে একটা ঠেলা দিয়ে সে হি হি করে হাসছিল। মেঘ ফেটে রোদ উঠেছে এবার।

"তুই না, একটা পাগল। এমন সব একেকটা কাজ করিস..."

"কী করব? কষ্ট হচ্ছিল যে। কেউ ওনার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিল না। একলা একলা মুখটা কালো করে বসে ছিল। কে জানে বাড়িতে কেউ আছে কি না। থাকলে কী আর অসুস্থ মানুষ একলা একলা হাসপাতালে আসে, বল? তাই ওঁকে একটু আনন্দ দিতে, বুঝলই তো? আমি আসলে..."

বেলঘরিয়া ঢুকছিল। নেমে গেলাম। ওদের বাকি গল্পটা আর শোনা হয়নি। বাড়ি ফিরতে ফিরতে মনে মনে বলছিলাম, "বেঁচে থাক বাবা। সুখে থাক, শান্তিতে থাক। আর পারলে আরও কিছু দুঃখী মানুষের মুখে এমনি করে একটু হাসি ফুটিয়ে দিস। সে মিথ্যে হলেও দোষ কী? অনেক মিথ্যেই তো সত্যির থেকে বেশি সত্যি, তাই না?"



নারী ও নদী

সন্ধ্যা নামছে। পাহাড়ের পেছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। নদীর ওপাড়ে উঠে যাওয়া পাথুরে দেয়ালের মাথায় তার লালচে আলো। চেতনা ফিরতে একনজর সেইদিকে তাকিয়ে দেখল সে। তার মাথার ওপরে ছেয়ে থাকা অর্জুন গাছ থেকে টুপটাপ জল ঝরে। তাকে ঘিরে সদ্য বৃষ্টিভেজা মাটি থেকে টাটকা, সুগন্ধ ভাপ ওঠে।

কতক্ষণ এখানে এইভাবে স্থির হয়ে রয়েছে সে তা তার জানা নেই। হয়তো রাত হলে তার আন্দাজ পাবে। শেষ যে-মুহূর্তটির কথা মনে আছে তার, তখন আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ছিল। নদীর উজানে, গিরিশিরার অনেক উচ্চতায়, তার ছুটন্ত জলে শরীর এলিয়ে শুয়ে ছিল সে।

তবে তা নতুন কিছু নয়। মোহিনীর সঙ্গে নিভৃত, নির্ভাষ আলাপচারিতেই এখন বেশির ভাগ সময় কাটে তার। তখন তাকে জড়িয়ে ঘন হয়ে থাকে মোহিনীর উদ্দাম শরীর। ছুটন্ত জলে বেজে ওঠে রতিরঙ্গিনীর শীৎকারধ্বনি। চেতনায় অন্তহীন আসঙ্গের শিহরন ছড়িয়ে দিয়ে অবিরাম বহে চলে সে তাকে ঘিরে।

আজকাল ক্রমশই দীর্ঘায়িত হয়ে চলেছে এই সুখকালগুলি। ক্বচিৎ আজকের মতোই কোনো সন্ধ্যায়, গভীর রাত্রে, কিংবা খররৌদ্রের নির্জন দুপুরে হঠাৎ জেগে ওঠে সে। খেয়াল হয়, নদীতীরের কোনো বিজন অরণ্যপ্রান্তে, কিংবা তার ছুটন্ত জলের বুকে দীর্ঘক্ষণ ধরে একখণ্ড পাথরের মতই স্থির হয়ে রয়েছে তার শরীর।

চেতনা ফিরে আসবার মুহূর্তগুলো বড়ো যন্ত্রণার। প্রায় ভুলে যাওয়া প্রাচীন কিছু স্মৃতি শকুনের মতো ঝাঁক বেঁধে ফিরে আসে এ-সময়টা। আবছা আবছা মনে পড়ে কোনো এক শহরের ছবি। তার কচি দুটি ঠোঁটে জড়িয়ে থাকা মায়ের স্তনের সুবাস, একটি স্কুলপ্রাঙ্গণ, অন্ধকার কোনো ঘরে তার শরীরে মিশে থাকা একটি নারীশরীরের

উল্লাস। বড়ো নির্দয়, নৃশংসভাবে তারা তাকে টেনে, ছিঁড়েখুঁড়ে নিয়ে যেতে চায় মোহিনীর বুক থেকে।

আর তারপর... সেইসব অর্ধবিস্মৃত স্মৃতিখণ্ডকে ভাসিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে আসে, গভীর গিরিখাত ভাসিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো এক তরল পাহাড়ের ছবি। তার তলে ভেসে চলা তাঁবুটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তখনও ছটফট করতে থাকা একটি মরণোন্মুখ শরীর।

সে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। কারণ, শঙ্খলাগা শরীরটি থেকে তাকে ছিঁড়ে এনে, সেই সেই ছুটন্ত জলধারার গভীরে তখন তাকে ঘিরে নিবিড় হয়ে এসেছিল আবছায়া অন্য এক শ্যামাঙ্গী অবয়ব। সে-স্পর্শে উদ্দাম হয়ে ওঠা তার আদিম পুরুষশরীর সে-মুহূর্তে তার কথা শোনেনি। তীব্র স্রোতে ভেসে যেতে যেতে তখন তার রক্তেও ঝড় জেগেছিল...

***

...সন্ধে হয়ে আসছিল। মেঘ কেটে গেছে। চারপাশে ভিড় করে থাকা হলং, তিতচাঁপা, শাল আর কাঠগোলাপের শাখাপ্রশাখায় অস্তগামী রৌদ্র মিলিয়ে আসছিল দ্রুত। এইখানটা, মাথার ওপর গাছগাছালির ভেজা ডাল থেকে ঝুলে থাকা মস আর হরেক অর্কিডের ডালপালায় ঘেরা একটা কুঞ্জের মতো হয়ে আছে। তার বাইরে, খানিক দূর দিয়ে জল থেকে উঠে এগিয়ে যাওয়া পায়েচলা পথ। সে জানে ওই পথের প্রান্তে বসতি আছে। একবার সেখানে পৌঁছোলে সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে আরও নিবিড় বসতি... কোনো শহর... তার পরিচিত কোনো...

তাকে ঘিরে পাক খেয়ে উঠছিল অতি পরিচিত কিন্তু অবয়ববিহীন কিছু পুরোনো জীবনের সুতো। খণ্ডখণ্ড স্মৃতি, অজস্র চেনা অথচ ভুলে যাওয়া অনুভূতির দল তাকে ঘিরে ধরেছে এসে। প্রাণপণে তাদের আঁকড়ে ধরতে চায় সে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে আলোকিত একটি দরজার স্বচ্ছ অথচ সুকঠিন আবরণে বারংবার মাথা ঠোকে যেন তার চেতনা।

তারপর একসময় হঠাৎ, সদ্যোজাত সন্ধ্যার নিষ্কলঙ্ক নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে হা হা করে কেঁদে ওঠে মানুষের সন্তান। তার চোখে তখন ফের একবার ভেসে উঠেছে দুকূল ভাসানো জলস্রোতের প্রলয়ংকরী রূপ। একটি বস্ত্রহীন শব তাতে ভেসে যায়।

তার সে-কান্নার শব্দ ভেসে যায় নিঃশব্দ পাহাড়ের বুকে। ভেসে যায় তার পাশ দিয়ে বেয়ে চলা মোহিনীর অন্ধকার স্রোতে। আর তারপর হঠাৎ নদীর বুক থেকে উঠে আসা শীতল হাওয়ার স্রোত যেন ঘনীভূত হয়ে দুটো কোমল হাতের মতো তাকে জড়িয়ে ধরে এসে। তার কানে করে দুটি শব্দ বেজে ওঠে, "কাছে এস।"

তারপর থাকে শুধু বহে চলা এক নদী, আর তার গর্ভে সমাধিস্থ একটি মানবশরীর।

নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে অস্তিত্বের সূচনার রূপ আকারে ফিরে গেছে সে ফের। সেই অন্ধকারে স্রোতস্বিনী নারীশরীর ফের তাকে ঘিরে ঘন হয়ে আসে। কানে কানে বলে, "মনে আছে, সেই প্রথম দিনের কথা? যেদিন তুমি এলে..."

।২।

"ওয়াও! বিউটিফুল। মোহিনীই বটে! আর তুমি ব্যাটা আমাকে এইটে মিস করাবার তালে ছিলে? বলে কী না হাইলি রিস্কি! অ্যাঁ!"

হাতের চারকোলের টুকরো কাগজের বুকে ঘষতে ঘষতে যুবতীটি তার সঙ্গীর উদ্দেশে কথাগুলি ছুড়ে দিচ্ছিল।

জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে সংগমের প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার উজানের এই এলাকায় মোহিনী একটা গভীর খাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। অপরাহ্নের রোদ তার ডানপাশের পাহাড়ি দেয়াল টপকে ছুটন্ত জলের ওপর তেরছা হয়ে এসে পড়ছিল।

"ছবি আঁকবার মানুষজনকে নিয়ে এই মুশকিল, বুঝলে?" পুরুষটি হাসছিল। তাদের ছোট্ট তাঁবুর বাইরে, নদীর বুকে ছড়ানো পাথরের ওপরে বসা মেয়েটির দিকে তার নজর আটকানো। সে-মেয়ের হাতের কাগজে তখন চারকোলের আঁচড়ে নদীটির ধারার একটা আদল গড়ে উঠছে।

খানিক বাদে গলা খানিক গম্ভীর করে সে ফের বলল, "শুধু রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেলে! ভাবছ বেজায় শান্তশিষ্ট, তাই না? কিন্তু আমাদের হাইড্রোলজিক্যাল রিপোর্ট কী বলে জানো? বলে, এ-নদীতে বান ডাকলে ওই গর্জ-এর অর্ধেকটা অবধি ভরতি হয়ে জল ছুটতে পারে। অতীতে তা ঘটেছেও কয়েকবার। নীচের দিকে একাধিক গ্রাম ধুয়ে নিয়ে গেছে তখন এই মোহিনী। ঝড়বৃষ্টির দিন। হঠাৎ করে তেমনটা হলে যেখানটা বসে আছ, সেখানটা ওই জলের পাহাড়ের নীচে তলিয়ে যেতে পারে কয়েক ঘণ্টার নোটিশে।"

মেয়েটি হাসল। হাসলে তার গালে টোল পড়ে। বয়েস বেশি হয়নি তার। মৃত্যু এখনও তার কাছে, আর দশজন তরুণের মতই ভারী দূরের কোনো স্টেশন। তাকে সে ভয় পেতে শেখেনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে যুবকের গলায় হাতদুটো জড়িয়ে নিল সে। তারপর ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বলল, "তেমন হলে তুমি ঠিক আমায় বাঁচিয়ে নেবে। আমি জানি..."

বলতে বলতেই শশব্যস্ত হয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল সে, "এই, কী হচ্ছে?"

"আহা কীভাবে তোমাকে বাঁচাব সেইটার একটু প্র্যাকটিস করতে হবে না? এই যে...এইভাবে জড়িয়ে ধরে..."

"অ্যাট লিস্ট তাঁবুর মধ্যে তো চলো! কেউ দেখলে..."

অধৈর্য হাতে তার পোশাকের বোতামগুলোর সন্ধান করতে করতেই পুরুষটি জবাব দিল, "কয়েক মাইল নীচে প্রথম গ্রাম ম্যাডাম। কে দেখবে বলো?"

"নদীটা..."

তার কথা শেষ করতে দিল না ঠোঁটের ওপর আক্রমণ করে উঠে আসা অন্য দুটো ঠোঁট। বাধার অভিনয়টুকু শেষ করে তার ইচ্ছুক কোমল শরীর তখন গলেমিশে গেছে শক্তপোক্ত পুরুষালি শরীরটিতে।

ছুটন্ত জলের মধ্যে, একটুকরো পাথুরে চাতালের বুকে শঙ্খলাগা শরীরদুটোর ওপরে অপরাহ্নের সূর্য তার স্বর্ণাভ রেণু ছড়িয়ে দিচ্ছিল। বিকেলের হাওয়া শীতেল হাত বোলাচ্ছিল তাদের গায়ে...

...পাশাপাশি শুয়ে তারা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝি। হঠাৎ পুরুষটির ঘুম ভাঙল বাহুমূলে একটা প্রবল টানে। পাহাড়ে অন্ধকার নেমেছে। তার আড়াল নিয়ে কখন যেন পাথরটাকে ঘিরে বেড়ে উঠেছে মোহিনীর জল। লোভী হাতের মতো তার একটা ধারা হঠাৎ করেই পাথরে উঠে এসে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল তরুণীটিকে। অর্ধেক শরীর তার নেমে গেছে অন্ধকার জলে। প্রাণপণে দু'হাত দিয়ে সে তাই আঁকড়ে ধরেছে তার সঙ্গীর বাহুমূল।

অন্ধকারে চোখ খুলে বিষয়টা বুঝে নিয়ে মৃদু হাসল যুবক। অরণ্য-পাহাড়ের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা তার পেশার অঙ্গ। প্রকৃতির এই দুষ্টুমিগুলো তার কাছে অপরিচিত নয়। ওতে সে ভয় পায় না। তাড়াতাড়ি উপুড় হয়ে যুবতীর হাতদুটি ধরল সে। তারপর উঠে বসে ছুটন্ত জলে সাবধানে পা নামিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল তার পাশে।

তার প্রগাঢ় স্পর্শ যুবতিকে তখন ভরসা দিয়েছে। নিজের ভারসাম্য ফের খুঁজে পেয়ে এইবার সে সাবধানে তার সঙ্গীর পদক্ষেপ অনুসরণ করে। আর এইভাবেই পাথর থেকে পাথরে পা দিয়ে ছুটন্ত নদীর লুব্ধ আকর্ষণ ছেড়ে তারা উঠে যায় তার তীরের অস্থায়ী বাসাটিতে।

***

"বলেছিলাম না, নদীটা আমাদের দেখছে? আমায় ওর সহ্য হয়নি, বুঝলে? কাল থেকে একলা একলা ওর আপস্ট্রিমে কাজ করবে। সাবধান।"

যুবতির কটাক্ষে রহস্য ছিল। সভ্যতার ফিনফিনে দেয়ালটির আশ্রয়ে বসে হাতে গরম কফির মগ ধরে নিজেকে তখন ফের একবার ফিরে পেয়েছে সে। সব ভয় কেটে গিয়ে, এক কপট ঈর্ষার অস্ত্রে সে প্রিয় পুরুষের মুখ থেকে তার অগ্নিসাক্ষী করে করা

প্রিয় শপথ শুনতে চায় আরও একবার।

পুরুষটি তার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখল না। তার কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে নিয়ে কানে কানে বলল, "আমায় ভাসিয়ে নিতে পারে এমন একটা নদীই তো আছে দুনিয়ায়।"

বাক্যটিতে শব্দের মধুর খেলা ছিল। যুবতির নাম ছিল নদী। শুধুই নদী।

। ৩ ।

এখানে নদী কেবলই জলধারা। পাহাড়ের কঠিন বুক ক্ষইয়ে তটভূমি গড়বার বিলাসিতার সুযোগ সে পায়নি এখানে। তার বুকে ইতস্তত জেগে থাকা পাথরের ছোটোবড়ো চাঙড় সামান্য নতিতে তার ধারাকে অনুসরণ করে পাহাড় বেয়ে ওপরের দিকে চলেছে। তখন দুপুরের সূর্য প্রখর হয়ে যুবকটিকে রৌদ্রস্নান করাচ্ছিল।

সাবধানে বোল্ডারগুলিতে পা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলে সে তার যন্ত্রের পুঁটুলি হাতে। মাঝে মাঝে নদীগর্ভের এখান-ওখান থেকে তুলে আনে কিছু বালি, কিছু সম্ভাবনাময় প্রস্তরখণ্ড। পুঁটুলি থেকে অন্য এক যন্ত্র বের করে সংগৃহীত জিনিসগুলোকে পরীক্ষা করে দেখে। কখনো নিরাশ হয়। কখনো-বা খুশিয়াল হয়ে উঠে একা একাই গুনগুন করে সুর ভাঁজে। তারপর সফল নমুনাগুলিকে পুঁটুলিতে পুরে, নদীর একটি মানচিত্রে কিছু অঙ্কপাত করে ফের এগিয়ে চলে তার উজানে।

স্যাটেলাইট মানচিত্র এই নদীর অনেকটা এলাকা জুড়ে মূল্যবান তেজস্ক্রিয় ধাতুর অবস্থান দেখিয়েছে। তার উৎস খুঁজতেই তার এই অভিযান। সেই সন্ধান চালাতে চালাতে যত সে নদীর উজানে উঠে যায়, ততই দুর্গম হয়ে ওঠে তার পথ, আর ততই আরও উচ্চকিত হয়ে ওঠে তার যন্ত্রের পাঠ। অভিজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদটি বুঝতে পারছিল লক্ষ্যস্থল আর বেশি দূরে নেই।

জল বেয়ে চলতে চলতে এই ক'দিনে খানিক ঘনিষ্ঠতাই গড়ে উঠেছে তার নদীর সঙ্গে। দিনগুলি তার কেটে যায় মোহিনীর শরীর হাতড়ে। অবরেসবরে তার সঙ্গে কিছু কথাও বলে সে। নদীও সে-কথার উত্তর দেয় নিজের ভাষায়।

রহস্য করে সেই কলধ্বনিকে মানুষের ভাষায় আপন খেয়ালে অনুবাদ করে নেয় রূপবান পুরুষ। তারপর, কখনো নির্জন নদীর বুকে দাঁড়িয়ে একলাই হেসে ওঠে তার জবাবে, আবার কখনো, যেন-বা নদীর মিঠে অনুরোধটি রাখতে, বড়ো সোহাগে হাত বুলিয়ে দেয় কলস্রোতার তুলতুলে নরম শরীরে।

পাশাপাশি, একটা যুক্তিহীন দুঃখও আজকাল তাকে আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছে। সে জানে এই নদীর মৃত্যু হবে। আজ নয় কাল নির্দিষ্ট স্থানটিকে খুঁজে পাবার পর সে-খবর সে পৌঁছে দেবে তার প্রতিষ্ঠানের কাছে। তারপর অতিকায় যন্ত্রগুলি মোহিনীকে

বন্দি করে, তার জলের গৈরিক আবরণ সরিয়ে তার দেহ ছিঁড়েখুঁড়ে সমস্ত সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যাবে।

কখনো-কখনো সেই কথাগুলোও সে খুলে বলে তার মোহিনীকে। মূর্খ নদী তার কিছুই বোঝে না। শুধু, তার দুঃখকে কোন অজ্ঞেয় পথে অনুভব করে হয়তো-বা। তখন সে তার শীতল আঙুলগুলি বাড়িয়ে তার গায়ে-মুখে ছুঁয়ে ছুঁয়ে করে তাকে শান্ত করে। তার জলধ্বনি পুরুষটিকে ভালোবাসা-ভরা কোনো অপরিচিত আশ্বাসবাণী শোনায়।

তবে এই নিভৃত বাক্যালাপগুলি পুরুষটি নিজের কাছেই গোপন রাখে। তার রাত্রির মানবী সহচরীটি এখনও অপরিণত। সে বড়োই ঈর্ষাপরায়ণা।

অবশ্য নির্জন নদীতীরের সেই আদিম আবহে শুক্লপক্ষের অসামান্য রাতগুলি বাক্যালাপে অপচয় করবার সময়ও থাকে না তাদের দুজনের। আর তখন, চন্দ্রালোকিত নদীটি তাদের ঘনবদ্ধ যুগলমূর্তির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সব দেখে। আপনমনে হয়তো কিছু বলেও। তবে সে-কথা মানুষের বোধগম্য নয়।

***

তারপর, অবশেষে সেই দিনটি এল। সেদিন প্রখর দুপুরে, নদীর বুকে চলতে চলতেই একটি বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। প্রকৃতির বিচিত্র কারসাজিতে এইখানে নদীর গতি খানিক শ্লথ হয়েছে। ওপর থেকে এক তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে নেমে আসা ধারাটি তুলনায় সামান্য গভীর একটি জলকুণ্ড রচনা করে তার অন্যপাশ দিয়ে ফের আর একটি তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে ছুটে চলেছে নীচের দিকে।

জলকুণ্ডটির মাঝামাঝি কিছু বিচিত্র গড়নের পাথর। দেখে একটু অবাকই হচ্ছিল সে। যেন অবিকল কিছু মানুষ-শরীর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে চারপাশে। তাদেরই একটি পাথরে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার যন্ত্রটি বের করে চালু করতেই তা সরব হয়ে উঠল। তার বৈদ্যুতিন নির্দেশক দেখাচ্ছিল, সেখানে জলের গভীর থেকে ভেসে আসা অদৃশ্য তেজোরাশি এই ক'দিনের মধ্যে উচ্চতম মাত্রা ছুঁয়েছে। জায়গাটিকে নথিভুক্ত করে এইবার কুণ্ডের অন্যপাশ দিয়ে বাঁকটি ধরে কিছুদূর উঠে যেতে যন্ত্রের পাঠ নীচুস্তরে নেমে এল ফের।

এইবার চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল সে। ওই জলকুণ্ডটিই তবে মোহিনীর আসল রত্নকুটির। ওইটি লুণ্ঠনের লোভেই তার এখানে আসা।

তবে একেবারে নিশ্চিত হতে হবে প্রথমে। হাতের যন্ত্রটিকে পুঁটুলিতে ভরে সে পায়ে পায়ে ফিরে যায় কুণ্ডটির কেন্দ্রস্থলের দিকে। এখানে জলের তলদেশ অসমান। সাবধানে, বড়ো সাবধানে পা ফেলছিল সে তাই। হাঁটু অবধি ডুবিয়ে দেওয়া

সেই জলস্তর এইখানে মৃদুস্রোতা। তাতে নির্মেঘ আকাশ ও দু'পাশের গিরিখাতের দেয়ালের ছায়া পড়ে তিরতির করে কাঁপছিল।

সেইদিকে চোখ ফেলে এগোতে এগোতেই হঠাৎ সামনের একটা জায়গায় তার চোখদুটি আটকে গেল। সেখানে কয়েকটি স্বর্ণবর্ণ চাঁপার ফুল ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে মৃদু স্রোতের ধাক্কায়।

কৌতূহলী হয়ে, মুখ তুলে চারপাশে সে তাকিয়ে দেখল একবার। এইখানটা পাহাড়ের ঢালের অরণ্য নিবিড় নয়। দু-একটি হলং ও তিতচাঁপার গাছ ছাড়া বাকি সবই লতাগুল্ম ও ঝোপঝাড়। তবে সে জানে, এ-অরণ্যে অন্যত্র চাঁপার বিভিন্ন প্রজাতির অজস্র গাছ আছে। হয়ত নদীর উজানের দিকের অদেখা অরণ্যের কোনো ফুলন্ত চাঁপার গাছ থেকে এরা নদীর বুকে ঝড়ে পড়ে থাকবে। এ-ফুল তার নদীর বড়ো প্রিয়। পেলে সে খুশি হবে। অতএব, নীচু হয়ে তাদের সবচেয়ে কাছেরটিকে হাতে তুলে নিতে চাইল যুবকটি।

কিন্তু মোহিনীর শরীরে তখন কিশোরীর চাপল্য ভর করেছে যেন। হঠাৎ করেই চলকে ওঠা জলের আঘাতে ফুলটাকে তার নাগালের বাইরে সরিয়ে নিয়ে গেল সে। জলের কাছে নেমে আসা তার মুখটির পাশে মৃদু কলধ্বনিতে রহস্য করে কিছু বলেও উঠল যেন-বা।

ভারী মজা পাচ্ছিল যুবক। নিজেকে এখন অনেকটাই ভারমুক্ত ঠেকছিল তার। কাজের সার্থকতার মুখে এসে পৌঁছেছে সে। এ-আবিষ্কারের গুরুত্ব তার জীবনে অনেকটা। শহরে ফিরে, পুরস্কারস্বরূপ খানিক পদোন্নতি, তার নদীর জন্য আরও খানিক সুখ কেনবার অর্থবল। এইটুকুর বেশি তো আর কোনো স্বপ্ন নেই তার!

এই ফুলগুলির দু-একখানি নিয়ে গিয়ে সে তার নদীকে উপহার দেবে। বিনিময়ে যে পুরস্কারটি মিলবে আজ রাত্রে তার স্বপ্নেই বিভোর হয়ে সে ফের এগিয়ে গেল ভেসে চলা সাধের বস্তুগুলির দিকে।

কুণ্ডটির মাঝামাঝি এসে জড়ো হচ্ছিল ফুলগুলি। মৃদুমন্দ পাক খাচ্ছে তার কেন্দ্রস্থলকে ঘিরে। ওইখানে ঘূর্ণি আছে কোন। সাবধান হয়ে গেল অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক। সতর্ক পদক্ষেপে জল ভেঙে সে তার লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যায়। বারে বারে থেমে গিয়ে অনুভব করে নেয় জলের গতিপ্রকৃতিকে।

ফুলগুলির প্রায় কাছাকাছি এসে পৌঁছাতে ঘুরন্ত জলের মৃদু টান টের পাওয়া গেল। আর এগোনো ঠিক হবে না। এইখানে, তার নাগালের ঠিক বাইরে বৃত্তাকার একটি এলাকায় এলোমেলো ছড়িয়ে ভেসে আছে তার ফুলগুলি। আকাশনীল জলের বুকে একটি স্বর্ণবর্ণ ফুলশয্যা রচনা করেছে যেন তারা।

ঘূর্ণির মৃদু টানে দুলছিল সোনারঙের ফুলের দল। হাতছানি দিয়ে তাকে ডাক

দিচ্ছিল যেন। ওই ফুলগুলি তার চাই। আজ রাত্রে তাঁবুতে ফিরে তার নদীর শয্যায় ওগুলিকে বিছিয়ে দিয়ে তাদের দ্বিতীয় ফুলশয্যা হবে।

মনে মনে এই লোভনীয় সংকল্পটি করে নিয়ে, একটুক্ষণ স্থির হয়ে জলের গতিপ্রকৃতিকে ফের অনুভব করে নিল সে। তারপর, সাবধানে একটি পা এগিয়ে ধরে জলের ওপর শরীর ঝুঁকিয়ে ফুলগুলির দিকে হাত প্রসারিত করে দিল অধীর যুবক।

এই সময়টির অপেক্ষাতেই ছিল কি প্রগলভা মোহিনী? তা না হলে যুবকের সেই ভারসাম্যহীন মুহূর্তটিতেই তার পা জড়িয়ে কেন অমন বেহিসাবি টান দেবে তার ঘূর্ণির জল?

হঠাৎ পায়ে সেই টান লাগতে একটু চমকে উঠেছিল সে। হাতদুটি আকাশের দিকে উঁচিয়ে নিজেকে সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টাও করেছিল একবার। আর তারপর ভারসাম্য হারিয়ে সেই ঘুরন্ত জলের বুকে আছড়ে পড়েছিল তার শরীরটা।

কোনো রূঢ় আঘাত পায়নি সে। নদীর বহমান জল কোমল আশ্লেষে জড়িয়ে ধরেছিল তার প্রিয় পতিত পুরুষের শরীর। তারপর, তার রৌদ্রতপ্ত দেহে বড়ো মধুর সুখাবেশ ছড়িয়ে দিয়ে সব প্রতিরোধ সাঙ্গ করে দিয়েছিল তার।

বড়ো আরামে নদীটির জলে দেহ ছড়িয়ে দিয়েছে এইবার শ্রমক্লান্ত পুরুষ। তার দেহের অন্ধিসন্ধিতে তরল আঙুলগুলি খেলা করে যায়। জলতলের বালি ও নুড়িপাথরের শয্যা তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় বড়ো আদরে। জলের ঘূর্ণায়মান মৃদু স্রোত তার ভারহীন শরীরকে সেই কুসুমাস্তীর্ণ জলশয়ানে রেখে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যায় কুণ্ডের কেন্দ্রস্থলের দিকে। তার সেই স্পর্শকে শরীরে জড়িয়ে নিয়ে মৃদুমন্দ ভেসে যেতে যেতে একটা ব্যাখ্যাহীন তীব্র উল্লাস এসে আশ্রয় করছিল যুবকটির চেতনায়।

তার যন্ত্রপাতির পুঁটুলিটি খুলে এসে কিছুদূরের একটি পাথরের গায়ে আটকে আছে। জলশয়ানে শুয়ে একমুহূর্তের জন্য সেদিকে তাকিয়ে দেখেছিল সে। কিছু একটা কথা মনে আসতে গিয়েও আসেনি তার। কারণ, তাকে ঘিরে ভাসমান চাঁপা ফুলের সিক্ত সুবাস আর তাকে নিবিড় আশ্লেষে জড়িয়ে ধরা নদীর জলের মৃদু মদগন্ধ তখন তার পুরুষশরীরকে জাগিয়ে তুলছিল ধীরে ধীরে। অর্থহীন এক অন্ধ রিপুর তাড়ণায় যুবকের হাতদুটি সেই জলকে আলিঙ্গনে বাঁধতে চায় বারবার।

সে চেষ্টাটি করতে করতেই একসময় সে অনুভব করল, সেই ডাকে সাড়া দিচ্ছে ধীরগামিনী মোহিনী। তার সহসা প্রখর হয়ে ওঠা চেতনা অনুভব করতে পারছিল, জলের গভীরে তাকে জড়িয়ে ধরে ফুটে উঠছে যেন শ্যামাঙ্গী এক যুবতির কঠোর অথচ কমনীয় অবয়ব। গভীর, শীতল আলিঙ্গনে তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে নিয়ে তার কানে কানে কত কথা সে বলে যায়।

ভাসমান সে-পুষ্পশয্যার ভারহীন শয়নে শুয়ে, চেতনার অন্য কোন স্তরে সেই কলধ্বনির অর্থ বুঝে নিতে আর কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না তার। আর, যেন সেই

আহ্বানে সাড়া দিয়েই, মধ্যাহ্নের সূর্য আকাশ ও পর্বতরাজিকে সাক্ষী রেখে তার কামনাথরথর শরীরটি সর্বশক্তিতে বিদ্ধ করে তার সঙ্গিনীর উদ্দাম বশ না-মানা ছায়াশরীরকে। তার ভালোবাসার নদীর পোষমানা নাগরিক শরীরেই এতকাল তৃপ্ত ছিল সে। মোহিনীর দেহের এই সুতীব্র শৃঙ্গারসুখের খবর তাকে সে-শরীর দিতে পারেনি।

সেদিন অনেক রাত হয়েছিল তার তাঁবুতে ফিরতে। ভেজা শরীর থেকে পোশাক-আশাকগুলো খুলে ফেলে তার নদীর পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়েছিল সে। নদীর প্রশ্নের জবাবে তাকে সংক্ষেপে নিজের সাফল্যের খবরটুকু দিয়েছিল শুধু। কিন্তু তাতে উল্লাসের কোনো স্পর্শ ছিল না তার। সেদিন, জুটি বাঁধবার পর প্রথমবার, শয্যায় এসেও তারা মিলিত হয়নি।

নদী মেনে নিয়েছিল। হয়তো পুরুষটি পরিশ্রান্ত। হয়তো দীর্ঘ খাটুনির শেষে সাফল্যের প্রথম স্বাদ তার ক্লান্ত শরীরে ঘুম ডেকে এনেছে। তাই বড়ো নিশ্চিন্তে তার সঙ্গে ঘন হয়ে শুয়ে চোখ বুজেছিল সে। কাজ শেষ। এইবার তাদের ফিরে যাবার পালা। প্রথম কয়েকদিনের নতুনত্বের স্বাদ পুরোনো হয়ে যাবার পর, এই নির্জনতা আর তার ভালো লাগছে না। এখানে আকাশ বড়ো প্রখর নীল। প্রিয় শহরটির ধূসর আকাশের জন্য এবার তার বড়ো মন কেমন করছে।

***

সেদিন মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল নদীর। বাইরে তীব্র চাঁদের আলো চরাচর ধুইয়ে নিচ্ছে। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে তাদের বিছানাতেও সেই আলো এসে পড়েছিল। সেই আলোয় চোখ খুলে কোনো অজানা ভয়ে সে কেঁপে উঠেছিল হঠাৎ। তার পুরুষটি বিছানায় নেই!

শহরে আজন্ম লালিত সে। সেখানকার বিজ্ঞানসম্মত উদ্যানের পোষমানা সবুজ আর বশমানা জলাশয় তার প্রিয় বটে, কিন্তু এই নির্জন স্বাধীন বনপাহাড় বা জলস্রোতকে সে বিশ্বাস করে না। তাড়াতাড়ি গায়ে পোশাক জড়িয়ে তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল নদী। তারপর সামনের দিকে চোখ পড়তে হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে ছুটে গিয়েছিল মোহিনীর ঢাল বেয়ে তার গর্ভের দিকে।

ছুটন্ত জলের মধ্যে পড়ে থাকা অর্ধচেতন মানুষটার শরীরে কোনো পোশাক ছিল না। সেখানে, প্রকৃতির নিয়মকে অগ্রাহ্য করে, স্রোতের মধ্যে জেগে উঠেছে ঘূর্ণায়মান একটি জলকুণ্ড। তার ভেতর উপুড় হয়ে পড়ে আছে তার পুরুষটি। তার সঞ্চরমান শরীরের প্রতিটি ভঙ্গি, তার গলা থেকে উঠে আসতে থাকা শীৎকারের আবছা শব্দ তার বড়ো পরিচিত, বড়ো আদরের!

তবে সে-মাত্রই কয়েকটি মুহূর্তের জন্য। তার কাছে এসে দাঁড়াবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মানুষটার সমস্ত নড়াচড়া যেন কোন জাদুতেই মুহূর্তে থেমে গেল। তাকে ঘিরে ছুটে চলা ঘূর্ণিটিও যেন চোখের ভুলের মতোই মিলিয়ে গেছে ছুটন্ত জলের স্রোতে।

কয়েকমুহূর্ত বজ্রাহতের মতো সেই বহমান জলের দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে নিজেকে শক্ত করল নদী। বিজ্ঞানের ছাত্র সে নয়। প্রকৃতির শক্তিদের বিচিত্র কার্যকলাপের ব্যাখ্যা তার অধিগত না হলেও, তার শিক্ষা তাকে বুঝিয়েছে প্রকৃতির কোনো আচরণই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার অতীত নয়। হয়ত তার পুরুষটি এর ব্যাখ্যা জানে। হয়ত কাল সকালে জেগে উঠে প্রিয় হাসিটি হেসে সে তাকে এর কোনো সরল কারণ বলে দিয়ে তার সব ভয়কে দূর করে দেবে।

তবে সেই মুহূর্তে তার প্রিয় মানুষটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই তার লক্ষ্য ছিল। বুকের ভেতর গড়ে ওঠা একটা যুক্তিহীন বিতৃষ্ণাকে জোর করে প্রতিহত করে সে এগিয়ে গিয়েছিল নিশ্চল হয়ে নদীর বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকা উলঙ্গ মানুষটার দিকে।

খানিক পরে, বোধহীন দৃষ্টি নিয়ে যন্ত্রের মতো তার হাত ধরে হাঁটতে থাকা মানুষটাকে তাঁবুতে এনে শুইয়ে দিয়েছিল নদী। তারপর পাগলের মতো তার শরীর ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেছিল, "কী হল তোমার? হঠাৎ কী হল গো? আমায় চিনতে পারছ না? আমি... আমি তোমার নদী যে!"

শব্দটা কানে যেতে তার দিকে ঘুরে দেখল তার পুরুষ। ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে আসছিল তার দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিক্ষেত্রে শ্যামাঙ্গী যুবতিটি কোথাও নেই। তার সর্বগ্রাসী আলিঙ্গনের আচ্ছন্নতাও নেই।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা সরল, গৌড়বর্ণ একটি মুখ তখন আতঙ্কে পাংশু হয়ে আছে। দু-হাতে সেই মুখটাকে ধরে তার চোখে চোখ রাখতে গিয়ে আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে উঠছিল যুবকের চোখদুটো। বিশ্বাসভঙ্গের এ-কাহিনি সে কেমন করে তার নদীকে বলবে? কী করে স্বীকার করবে, কোন অবর্ণনীয় সুখে সদ্য অবগাহন করে উঠেছে তার শরীর? কেমন করে জানাবে সে সুখের সন্ধান তাকে কোনোদিন দিতে পারবে না তার নদী!

খানিক বাদে তার কোলে রাখা মাথাটিতে হাতদুটি বুলিয়ে দিতে দিতে সে নীচুস্বরে বলল, "কাল আমরা এখান থেকে চলে যাব নদী। সব ঠিক হয়ে যাবে। ভেব না।"

। ৪ ।

কিন্তু চলে যাওয়া আর তাদের হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিল নির্জন বন, পাহাড় ও পাহাড়ি নদীটি, যোগ দিয়েছিল শেষ গ্রীষ্মে সমুদ্রের গভীর থেকে উঠে

আসা রহস্যময় জলবাহী বাতাসের দল।

পরদিন সকালে তাদের ঘুম ভেঙেছিল তাঁবুর গায়ে প্রবল বৃষ্টির শব্দে। সূর্য ওঠেনি সেদিন। আদিগন্ত ছেয়ে আসা অন্ধকার মেঘের দল ঢেকে রেখেছিল তাকে। ছুটন্ত হাওয়ার তীব্র ধাক্কা বারে বারে তাদের তাঁবুটিকে উড়িয়ে নিতে চেয়েছিল। তার ভেতরে বসে তারা অসহায় চোখে দেখেছিল সভ্যতার সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র, তাদের জিপসিটার চারপাশে খসে পড়া ভাঙা ডালপালার ব্যূহ গড়ে ওঠা।

যুবকটি সেদিন ঘুম থেকে ওঠবার পর থেকেই, একটিও কথা বলেনি তার নদীর সঙ্গে। তাঁবুর আচ্ছাদনের নীচে চুপ করে বসে, মোহিনীর ঘোলা স্রোতের তীব্র দৌড়ের দিকে চোখদুটি ধরে রেখেছিল শুধু। আয়তন বাড়িয়ে সে তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাদের তাঁবুটার দিকে।

তারপর রাত্রি এল। সন্ধ্যার দিকে কিছুক্ষণের বিরতির পর ফের বৃষ্টি এল ঘন হয়ে। মূক পুরুষটির পাশে বসে নিঃশব্দে সেই শব্দ শোনে নদী। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া আর বৃষ্টির শব্দকে তখন ক্রমেই ছাপিয়ে উঠছিল মোহিনীর অন্ধকার জলের ঝরঝর শব্দ।

অন্ধকারে সেইদিকে চোখ ধরে রেখে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে যুবতিটি। তার পাশে বসে থাকা মূক পুরুষ তখনও পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে। তারপর হঠাৎ আকাশ চিরে জেগে ওঠা একটা বিদ্যুতের ঝলক একমুহূর্তের জন্য তাদের মুখোমুখি করে দিল মোহিনীর সঙ্গে। অন্ধকারের আড়ালে নিজের দেহকে বহুগুণে বাড়িয়ে নিয়েছে মোহিনী। যুবতিটি সভয়ে লক্ষ করল, তার ছুটন্ত জল এখন খাদের দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁবুটাকে ছুঁয়ে ফেলেছে প্রায়।

হঠাৎ উত্তর-পশ্চিমে, নদীর উজানে পাহাড়ের ভেতর থেকে ভেসে আসা প্রচণ্ড একটা শব্দ তার বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়ে গেল। পাহাড়ে ভাঙচুর চলেছে কোথাও। আর, সেই প্রলয়ংকার আওয়াজের জবাবেই যেন-বা, স্রোতের স্বাভাবিক ধ্বনিকে ডুবিয়ে দিয়ে তখন হিংস্র আওয়াজ তুলে গর্জে উঠেছে মোহিনীর জলও।

তার ক্ষণিকের জড়তাকে একনিমেষে সরিয়ে দিয়েছিল সেই শব্দটা। ধড়মড় করে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিশ্চল পুরুষটির শরীরে ধাক্কা দিয়ে সে চিৎকার করে উঠল, "শুনছ? নদীর জল বাড়ছে যে! ওগো..."

তার ভয়ার্ত গলা এইবার জাগিয়ে তুলল তার পাশে বসা প্রস্তরপুরুষকে। উঠে দাঁড়িয়েছে সে-ও। কিন্তু তার পরেই, ঘনঘন চমকে ওঠা বিদ্যুতের আলোয় নদী দেখেছিল, মানুষটার চোখদুটো ধরা আছে তাঁবুর বাইরে ফুলে উঠতে থাকে দুলন্ত মোহিনীর দিকে। তার হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে পুরুষটি মোহগ্রস্তের মতো সেইদিকে ছুটে যেতে চায়।

কিন্তু তার একমাত্র আশ্রয়টিকে তখন এভাবে ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না নদী। যেকোন মূল্যে চেতনা ফিরিয়ে আনতে হবে পুরুষটির। বেঁচে থাকবার তীব্র তাড়নায় সে তখন তার শেষ অস্ত্রটি ব্যবহার করল। কাঁপা হাতে দ্রুত পরনের পোশাকগুলি ছুড়ে ফেলে যুবকটিকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল সে। কোমল স্তনদুটিতে তার মুখটি চেপে ধরে সে বারবার বলে, "আমি...আমি তোমার নদী। কোথায় যাবে তুমি? আমায় আদর করবে না? ওগো..."

বড়ো প্রিয় দেহের সেই স্পর্শটি একমুহূর্তের জন্য তার মোহনিদ্রাকে ভেঙে দিয়েছিল। যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠে তার ভালোবাসার নদীকে ফের একবার নতুন করে দেখেছিল সে বিদ্যুতের আলোয়।

কিন্তু তার পর, তাঁবুর জলসিক্ত মাটিতে শুয়ে দেহটিকে দলিতমথিত করতে করতে সেই কামোন্মাদ পুরুষ দেখতে পায়নি, দূরে, মোহিনীর উজানে তখন বিদ্যুতের আলোয় ঝিকিয়ে উঠেছে পাহাড় ফাটিয়ে ধেয়ে আসা উন্মত্ত জলের স্তূপ।

হঠাৎ ছুটে আসা সেই তরল পাহাড়ের প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় ভেসে গিয়েছিল শঙ্খলাগা শরীরদুটি। লোলুপ চাবুকের মতো ছিটকে আসা একটা ঢেউ পুরুষটির হাতের বাঁধন থেকে ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিল নদীর প্রতিরোধহীন শরীর, আর তাদের আশ্রয় সেই তাঁবুটিকে। আর তারপর, ভেসে যেতে থাকা শরীরটার দিকে প্রাণপণে এগিয়ে যেতে চাওয়া পুরুষটিকে বড়ো আদরে জড়িয়ে ধরেছিল সেই ছুটন্ত জলের রাশি। সে বাঁধনে শক্তি ছিল, হিংস্রতা ছিল না।

হ্যাঁ, তার নদীকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু প্রাণপণে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ পুরুষটি টের পেয়েছিল, তাকে ঘিরে থাকা জলরাশি যেন দুটি শক্তিমান অথচ কমনীয় হাত হয়ে বেঁধে নিয়েছে তাকে। টের পেয়েছিল তার দেহকে জড়িয়ে ধরে ফুটে ওঠা একটি শ্যামবর্ণ আধচেনা শরীর। তার স্পর্শ পুরুষের চেতনায় আগুন ধরায়...

। ৫ ।

এবং সময় বহে যায়। মোহিনী নামের নদীটির সঙ্গে এইভাবে জাগরণ ও নিদ্রায় কত অগণিত ঋতুচক্র এই পার হয়ে গেল তার। তারই মধ্যে কখন যে যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সীমানা পেরিয়ে বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছে তার শরীর সে-হিসেব তার কাছে ছিল না।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই তখন বেড়ে উঠছিল নদীটির বুকে তার নিদ্রামগ্ন সুখকালগুলির দৈর্ঘ্য। ক্রমশ আরও সংকুচিত হয়ে আসছিল জেগে থাকবার যন্ত্রণাময় সময়কাল। অবশ্য এখন তার জাগরণকালের যন্ত্রণায় আগেকার সেই তীব্রতা আর নেই। বিস্মৃতির পলিস্তরে ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে তার যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিরা।

***

আরও কিছুকাল বাদে একদিন, আরও একটি সুদীর্ঘ নিদ্রার শেষে ফের নদীটির পাড়ে কোনো এক জায়গায় জেগে উঠল সে। তখন ঘন বর্ষা নেমেছে। সন্ধ্যার আবছায়াতে বর্ষণস্নাত পাহাড় ও নদীটির দিকে তাকিয়ে কিছু একটা মনে করবার চেষ্টা করল বৃদ্ধ মানুষটি। কিন্তু তার ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাওয়া মনটিতে এইবার আর কোনো ছবি ফুটে উঠল না। দীর্ঘ সময়ের শেষতম সুষুপ্তিটির মধ্যে তার মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে তার অন্য জীবনের স্মৃতিরা।

এই জায়গাটি তার পরিচিত। উজান ও ভাঁটার দিকে দুটি বাঁক নিয়ে এগিয়ে যাওয়া নদীর মাঝখানটিতে একটি গোল জলকুণ্ড হয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে একবার মাথা নাড়ল সে। অবশেষে মোহিনীর সম্পূর্ণ শরীরটিকে ঘুরেফিরে বহুকাল বাদে সে ফের ফিরে এসেছে তার দেহের কেন্দ্রস্থলে। তাদের প্রথম দেখা হবার সেই রত্নকুটিরটিতে।

পাক খেয়ে ছুটে চলা ঘোলা জল, কিছুদূরের সেই ঘূর্ণিটিতে গিয়ে আছড়ে পড়ছিল। বর্ষার জলধারা তাকে বহুগুণে শক্তিমান করে তুলেছে। এক অলৌকিক স্বর্ণাভ রঙ ছেয়ে ছিল তার ঘূর্ণায়মান জলে। নিঃশব্দ ইঙ্গিতে সেই সোনালি জল তাকে ডাক দিচ্ছিল।

বড়ো কষ্টে নিজের ঝাপসা হয়ে আসা বয়োজীর্ণ দৃষ্টিকে সে সংহত করল ঘূর্ণিটির দিকে। আর তার পরই তার প্রাচীন ঠোঁটদুটিতে একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। স্বর্ণাভ জল নয়। জলে ভেসে থাকা অগণিত চাঁপা ফুলের দল সেইখানটায় সোনারঙে রাঙিয়ে দিয়েছে মোহিনীর শরীরকে।

সেইদিকে দেখতে দেখতেই একসময় তাকে ঘিরে এসেছিল পাহাড়ের গভীর অন্ধকার। বিদ্যুতের চলমান আলোকসজ্জার সঙ্গে তাল দিয়ে বেজে উঠেছিল বৃষ্টি ও মেঘের দল। তখন, তাকে ঘিরে বয়ে চলা ভেজা বাতাস ঘন হয়ে এসেছিল তার শরীরকে ঘিরে। তখন মোহিনীর ছুটন্ত জলে শেষবারের মতো বেজে উঠেছিল সেই অমোঘ আহ্বান, "কাছে এস।"

পাড় ছেড়ে ধীরে ধীরে জলে পা রাখল মানুষটি। ছুটন্ত জল তাকে বাধা দিল না। তারপর একসময় সেই স্বর্ণাভ শয্যায় পৌঁছে, গভীর জলশয়ানের গর্ভে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে শেষবারের মতো অস্তিত্বের সূচনার ভ্রূণ আকারে ফিরে গেল সে। তারপর সেই অন্ধকারে স্রোতস্বিনী নারীশরীর আবারও একবার তাকে ঘিরে ঘন হয়ে এল। কানে কানে বলল, "মনে আছে, সেই প্রথম দিনের কথা? যেদিন তুমি এলে..."

। ৬ ।

কখনো মোহিনীর উজানে যদি যাও, তবে পাহাড়ের গভীরে তার দুটি বাঁক খেয়ে বয়ে যাওয়া ধারার কেন্দ্রে যে কুণ্ডটি আছে সেইখানে চোখ ফেল। অগভীর জলে সেইখানে ইতিউতি ছড়িয়ে থাকে কিছু পাথরের স্তূপ। অনেকটা মানুষের মতো গড়নের পাথরগুলি জল, সূর্য ও বাতাসের খামখেয়লি তক্ষণের ফল বলেই জানা গেছে।

তবে সেখানকার মানুষজন বলে, সেই পাথরেরা আসলে মোহিনীর প্রেমিক। যুগযুগান্ত ধরে এই পাহাড়ের বুকে বহুগামিনী তার প্রেমের এই খেলাটি খেলে চলেছে। তারা বলে, "পুরুষখাকি ডাইনির শরীরের খিদে আজও যায়নি সাহেব। একা একা ওর কাছে যেয়ো না..."



তিন আখর

"সুধী বন্ধুজন। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন বীরভূমনিবাসী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাউল শ্রী গোপীনাথ দাস বাবাজি আর তাঁর খেপি ব্রজদাসী—আর অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা আমাদের মঞ্চে এসে উপস্থিত হবেন।"

এই অবধি বলে মুনিরের ছেলে জহিরুল একটু থেমে চারিদিকে একবার চোখ চালিয়ে নিল। তার বয়েস বড়োজোর আঠারো-উনিশ। চেহারায় ফকিরি আবরণের আড়ালে যুগোপযোগী চাকচিক্যও উঁকিঝুঁকি মেরে যায় খানিক খানিক।

উমের খাঁয়ের মাজারের ঠিক সামনের চাতালে একটি প্রাচীন আমগাছের পত্রমুকুটের ছায়ায় মঞ্চ বাঁধা হয়েছে। সেখান থেকে বাড়ির ভেতর অবধি যাতায়াত করবার জন্য একটি শুঁড়িপথ ছেড়ে তার চারদিকেই দর্শকের ভিড়। মক্তবপুর ও আশেপাশের দু-চারটে গ্রামের সমস্ত লোকজন এসে ভেঙে পড়েছে আসরে।

মুসলমান-প্রধান এই এলাকায় উমের খাঁয়ের ভক্ত অনেক। এককালে এ-অঞ্চলের জমিদার ছিলেন তাঁর পিতৃপিতামহ। খানদানি মুসলমান বংশের সেই সন্তান, অথচ সেই জীবনের পথে হাঁটলেন না। রাজদণ্ডের বদলে কলমকে তাঁর সঙ্গী করেছিলেন উমের। তারপর একদিন সেই কলম আর কণ্ঠের সুরের ওপর ভরসা করে বে-শরা ফকিরির পথ নিলেন তিনি।

নিজের জমিজমা, ধনসম্পত্তি অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে ভিক্ষান্নে জীবনধারণের পথ নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তবু স্বধর্মের সমাজনির্দেশিত পথ ছাড়বার সাজা থেকে তাঁকে ছাড়ান দেয়নি তাঁর সমাজ। তাঁকে তারা হত্যা করতে এসেছিল। রক্তের ধারায় মুছে দিতে চেয়েছিল মানুষকে ভালোবাসার সংগীতের ধারাকে।

উমের কিন্তু তাতেও নিজের পথকে ছাড়েননি। যুদ্ধঘোষণা করেছিলেন তিনিও,

তবে সে-যুদ্ধে ভালোবাসা আর সংগীতকে অস্ত্র করেছিলেন তিনি। অভাব, প্রাণসংশয়, সমাজের ভ্রূকুটির নিয়ত সম্মুখীন হতে হতে দেশ, কাল, সমাজ ও স্বজাতির বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তবু সেই দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যেই অগণিত গান লিখে গিয়েছেন তিনি। মানুষ ও ঈশ্বরকে ভালোবাসার গান। নিজের সৃষ্টি সেই গানে নিজেই সুর বসিয়ে গেয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, লৌকিক গানের আসর থেকে আসরে। তারপর একসময় ভালোবাসা ও সংগীতের ধর্মে দিক্ষা দিয়েছেন নিজের একমাত্র সন্তানকেও। তার হাতে তুলে দিয়েছেন সেই ফকিরি ধর্মের উত্তরাধিকার।

তাঁর নশ্বর শরীর দীর্ঘকাল আগেই ধুলোয় মিশে গেছে। শুধু রয়ে গেছে গানের খাতাটি। ধীরগামী জলধারার মতোই মধুর অথচ অসীম শক্তিধর সেই গানের খাতা ধীরে ধীরে তার পথ কেটে নিয়েছে এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে স্থানীয় মানুষজনের বুকে। একদা তাদের জানমালের মালিক, সর্বস্বহারা ফকির হয়ে গিয়েও ফের হয়ে উঠেছেন তাঁদের হৃদয়ের অধীশ্বর।

আজ, তাঁর স্মৃতিতে তাঁর ছেলে মুনির ফকিরের আয়োজিত বার্ষিক এই সংগীত-আসরের শেষ রাতটিতে লোকজনের ভিড় অন্যান্যদিনের তুলনায় বেশি। বিস্তীর্ণ উঠোনটিতে আলোর বন্দোবস্ত বিশেষ নেই। প্রায়-অন্ধকার সেই আসরে কুয়াশার হালকা আস্তরণের নীচে চাদরে গা মাথা ঢেকে ধৈর্য ধরে বসে রয়েছেন বহু নারীপুরুষ। তাঁদের চেহারায় কোনো বহুজাতিকত্ব নেই, আচরণে সংস্কৃতামোদী এবং নাগরিক অস্থিরতাও নেই।

উমের ফকির এ-অঞ্চলের বাউল-ফকির সমাজে একটি শ্রদ্ধার্হ্য নাম। তাঁর স্মৃতি-উৎসবে তাই নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাউল ও ফকিরসমাজের খ্যাত-অখ্যাত সমস্ত শিল্পীরাই এসে জড়ো হন। তিনরাত্রি ধরে চলে সংগীতের উৎসব।

তবে এ-বছর তাতে আরো একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটেছে। মুনির ফকিরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাউল সম্রাট গোপীনাথ বাবাজি স্বয়ং এবং তাঁর আসবার সম্ভাবনাটি চাউর হতে আজ অনুষ্ঠানের তৃতীয় রাতে এ-আসরে যত দর্শক এসে পৌঁছেছেন, এ-আসর বহুকাল তেমন জনসমাগম দেখেনি।

ব্যাপারটা কি তরুণ জহিরুলের মনের ভেতর কোথাও একটা ঈর্ষার জন্ম দিয়েছিল? অসম্ভব নয়। তার শরীরী ভাষায়, ঘোষণার উচ্চারণভঙ্গিতে সেই বিদ্বেষের সূক্ষ্ম বহিঃপ্রকাশ ঘটে যাচ্ছিল বারবার। নাম ঘোষণার পর প্রায় মিনিট পাঁচেক কেটে গেছে। গোপীনাথ বাবাজির তখনও দেখা নেই। মঞ্চের পেছনদিকের ঘেরা দেওয়া জায়গাটির দিকে খানিক বাঁকা দৃষ্টি দিয়ে সে এবার কিঞ্চিৎ শ্লেষ মাখানো গলায় ফের

বলল, "আপনারা ধৈর্য ধরেন গো। মনে হয় বাউলসম্রাট মেকাপে বসিছেন। অতবড়ো শিল্পী... তাই মনে হয় আসতে একটু দেরি লাগে।"

চাপা একটা হাসির শব্দ উঠল চারদিক থেকে কথাগুলো শুনে। তারপর দর্শকের মধ্যে থেকে উড়ে এল একটা অনুরোধ, "তাহলে ততক্ষণ জহিরুল তুমিই না হয় একখান শুনায়ে দাও দেখি—"

মঞ্চে গাইবার ব্যাপারে জহিরুলের কিঞ্চিৎ জড়তা আছে। এ গ্রামের দর্শকমণ্ডলীরও সেটা অজানা নয়। তাদের মধ্যে থেকে সাবধানবাণী উড়ে আসছিল, "দেখিস বাপধন, আমাদের মক্তবপুরের নাম খারাপ করিস না রে—"

একটু থমকে গিয়ে এদিক-ওদিক চাইছিল তরুণটি। মঞ্চের ওপর বসে থাকা মুনির মুখ তুলে একবার চাইলেন ছেলের দিকে। মৃদু হাসি তাঁর মুখে। মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হল দুজনে। তার পরেই নীচু হয়ে জহিরুল মুনিরের দোতারাটি তুলে নিয়ে নিজের গলায় পরে নিল। যন্ত্রটি পুরোনো। তার চেহারায় কোনো চাকচিক্য অবশিষ্ট নেই আর। দু'এক মুহূর্ত তার শরীরে হাত বুলিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল জহিরুল। দক্ষ আঙুলের ঘায়ে কথা বলে উঠল তার পূর্বপুরুষের তারবাদ্যটি।

এলোমেলো সুরখণ্ডগুলোকে একটি নির্দিষ্ট চালে বাঁধতে বাঁধতে নীচু গলায় সে কথা বলে চলেছে তখন, "হিঁদুর বইতে লেখে, পরমাত্মায় জীবাত্মার পায়ে ধরি বলে দেহিপদপল্লবমুদারম। শুদ্ধোদনে বাপ হইয়ে ব্যাটার পায়ে ধরিছিল। তা সে বিষয়ে লালন সাঁই কী বলেন তাই নিবেদন করি -আলেফ অর্থাৎ আল্লাহ, তেনাকে স্পর্শ করতি গেলে দ্যাখবে স্পর্শটি লেগেছে গিয়া মিম, অর্থাৎ কিনা নবির দেহে। তাই সাঁই বলছেন—

আলেফ দিয়ে টোকা মারো
লাগবে গিয়ে মিমের গায়

বলতে বলতেই হঠাৎ 'আলেফ' শব্দটির ওপর সুতীব্র একটি টান মেরে যেন প্রায় বাতাসেই ভাসিয়ে দিল সে তার তরুণ শরীরটিকে। তার অপটু কণ্ঠকে অবলম্বন করেই উৎসারিত হচ্ছে পদটির গভীর ভাবময় পঙক্তিগুলি—

আলেফ দিয়ে টোকা মারো
লাগবে গিয়ে মিমের গায়
আয় নবিকে দেখবি যদি আয় রে আয়

গাইতে গাইতেই তার সতর্ক চোখদুটি দর্শকের ভাবলেশহীন মুখগুলির দিকে বারবার ফিরে ফিরে চায়। পর্দা না ছোঁয়া সুরগুলি তার গানটির মূল ভাবকে ছুঁতে চেষ্টা করে প্রাণপণ, কিন্তু তাদের তল পায় না। নিজের অক্ষমতার তিক্তস্বাদটুকুকে হজম করে নিয়ে সে আশৈশব অভ্যস্ত ব্যাখ্যাটি বলে চলেছে তখন,

তা বন্ধুজন, শোনেন, আদিতে আছেন তিনজন। আল্লা অর্থাৎ আলেফ, তেনার

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আদম অর্থাৎ লাম, আর আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তান মিম অর্থাৎ কিনা নবি। তা আলেফ যখন নিখোঁজ হইয়ে যান তখন কী ঘটে? সাঁই বলতেছেন—

কাঁধে কার হাতের ছোঁয়া পেয়ে গানটি ফের ধরতে গিয়েও থমকে গেল সে। কোমল স্পর্শটি বুকে ভরসা জোগায়। তার ফিরিয়ে ধরা মুখটি তখন তাকিয়ে রয়েছে দুটি বয়োঃজীর্ণ গভীর চোখের দিকে।

"তুমি বরং দোতরা ধরো বাবা। বড়ো মিঠা হাত। আমি গানটা গাই?" বলতে বলতেই গানের পরবর্তী কলিটি তুলে নিলেন মঞ্চে উঠে আসা গেরুয়াধারী নতুন মানুষটি,

আজব এক সুরত দেখিয়া
আলেফ যায়রে নিখোঁজ হইয়া
লামটি তখন যায় ফাটিয়া
তখন তাহার কী উপায়
আয় নবীকে দেখবি যদি আয় রে আয়

"কিন্তু কথা হল, নিখোঁজ হইয়ে আলেফ যান কোথা গো?"

প্রশান্ত চোখদুটি জহিরুলের তরুণ, উদ্ধত দৃষ্টিকে বেঁধে নিয়েছে যেন এবার? সরাসরি প্রশ্নটি তার দিকে ছুড়ে দিয়েই ব্যাখ্যানের সুতোটি নিজেই তুলে নিলেন মঞ্চে উঠে আসা গোপীনাথ,

"যান মাতৃগর্ভে। ভালোবাসার দায়ে নারীর গর্ভফান্দে আসি স্বেচ্ছায় দেহকারায় বন্দি হন তিনি। দশ মাস দশ দিন মায়ের গর্ভে বসি যন্ত্রণা ভোগ করি, তারপর ভূমিষ্ঠ হয়ে জীবনকারায় বন্দি হন। তারপর—

আলেফ পড়িয়া ফান্দে
জারেদজার হইয়া কান্দে
পড়িয়া নিরানন্দে
ধরে গিয়া মিমের পায়
আয় নবিকে দেখবি যদি আয় রে আয়

হঠাৎ গোটা আসরটি যেন একসঙ্গে জেগে উঠে পদটির ধুয়া ধরে নেয়। বাংলার বাউল-ফকির-বৈষ্ণব-শাক্ত নির্বিশেষে যুগে যুগে একটি জায়গায় এক; তা হল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ঈশ্বরত্ব থেকে সরিয়ে এনে কাছের মানুষ করে নেওয়ার আকুতি। পিতা কিংবা সন্তান থেকে শুরু করে নর্মসহচর, এমন কত রূপেই না দেবতাকে বারেবারে গ্রহণ করে চলেছে তারা যুগে যুগে।

আজ এই বয়স্ক ও অভিজ্ঞ বাউলের গানে আবার সেই নিবিড় সম্পর্কের পুনরুচ্চারণ শ্রোতাদের মনে নতুন করে সাড়া জাগিয়েছে। গাইতে গাইতেই মানুষটার দুটি গাল ভেসে যাচ্ছিল জলে। অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে তাঁর গানের বাকি পদগুলি ভালো বোঝা যায় না। কিন্তু সে গান ততক্ষণে শব্দবোধের সীমাকে ছাড়িয়ে গিয়ে, বাক্ ও মনের অগোচর কোনো অনুভূতিকে স্পর্শ করেছে। সেখানে মানুষের তৈরি শব্দবন্ধের সাহায্য ছাড়াই ভাবের বিনিময় ঘটে চলে—

***

মঞ্চের একপাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে মানুষটাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল জহিরুল। খানিক আগে গড়ে ওঠা মুগ্ধতার অনুভূতিটি তার ফের এখন হারিয়ে যাচ্ছে এক গোপন ঈর্ষার বৃত্তে। তার নিজের উঠোনে দাঁড়িয়ে তারই অক্ষমতাকে এই সভার সামনে খুলে ধরেছেন ওই বহিরাগত বাউল।

গানের রেশটুকু মিলিয়ে যেতে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন মুনির ফকির। বললেন, "মক্তবপুরের সৌভাগ্য যে এই আসরে আপনার মতন মানুষের পদধূলি পড়েছে। লালন সাঁইয়ের এই গান এমনভাবে কখনো শুনব তা আমি..."

উত্তরে মৃদু হেসে সামান্য মাথা নোয়ালেন গোপীনাথ বাউল। তারপর, বিনা ভূমিকায় একেবারে সোজা ঢুকে এলেন তাঁর নিজের গানের ভেতর,

আমি এমন জনম পাবো কী রে আর
এমন চাঁদের বাজার মিলবে কী আবার

হাতের নিঁখুত টানে তাঁর আনন্দলহরীর তারে সুর বেজে ওঠে। তার সঙ্গে সংগতের মতোই জেগে ওঠে মঞ্চের বুকে ঘুরন্ত দেহটির ছন্দময় পদাঘাত। তারপর সেই সুরের মধ্যে থেকেই ফের জেগে ওঠে গায়কের কণ্ঠসুর,

এমন আনন্দ রসে
আর কি গো যাবো ভেসে
মানব জন্ম পাবো
দেহের কামনা অপার

গোপী বাউলের গলাটি সুন্দর। তদ্‌গত ভাবের স্পর্শে উচ্চারিত শব্দগুলি এক একটি মণিখণ্ডের মতই উজ্জ্বল হয়ে ঝরে পড়ছিল। কিন্তু, কোথায় যেন একটু তফাৎ এসে গিয়েছে। গানের চালের মধ্যে নাগরিক ঔজ্জ্বল্যের হালকা মিশেল। তার সুরের বিস্তারে হিন্দুস্থানি রাগসংগীতের মৃদু হলেও সুনিশ্চিত সুবাস।

ব্যাপারটা অন্যদেরও নজর এড়ায়নি দেখা গেল। দর্শক আসন থেকে হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলার একটি আওয়াজ ভেসে এল, "ও বাউল, অত তানকারি দেখাবা যদি, তাহলে

তানটাই করো না কেনে, গান আর কেন?"

কথাগুলো মঞ্চে বসা ব্রজদাসীর কান এড়ায়নি দেখা গেল। তাঁর সুগৌর মুখটিতে কেউ যেন একমুঠো আবির মাখিয়ে দিয়ে গেছে একমুহূর্তের জন্য। কিন্তু তার পরেই নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। ঠোঁটদুটি তাঁর নিঃশব্দে নড়ছিল শব্দহীন কোনো প্রার্থনায়।

ততক্ষণে গোপী বাউল তাঁর গানের শেষ পঙক্তিগুলিতে এসে পৌঁছেছেন—

এহেন জনম পেয়ে
কাল কাটালাম ঘুমাইয়ে
জনম গেল রে বয়ে গেল আমার
পরের গোয়ালে ধুয়া
কাটালাম পথে কত কুঁয়া
দীন উমের কয় দোহাই দিয়া
সাঁই যা করো এবার—

গান শেষ করে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ঈষৎ দুলছে শরীরটি। সদ্যসমাপ্ত সংগীতের ঘোর তখনও রয়ে গেছে তাঁর দেহে। হঠাৎ জহিরুল এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। এরই মধ্যে কোন ফাঁকে গিয়ে গাঁজার কল্কেতে টান লাগিয়ে এসেছে সম্ভবত। চোখদুটি ঈষৎ লাল। পায়ের ভঙ্গি টালমাটাল। পকেট থেকে একটি কুড়ি টাকার নোট বের করে গোপী বাউলের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, "গানটা তো ভালোই গাইলা গো বাউল! এক্কেবারে টিভি, সিনিমার বাউল গান গো! এই এলাকায় এমনটা তো শোনা যায় না বিশেষ! তাই তোমায় কুড়ি টাকা পুরুস্কার দিলাম। কিন্তু জিগেস করি, দুদ্দু শাহের পদে আমার ঠাকুদ্দা উমের খাঁ সাহেবের ভণিতা তুমি দিলা কোন হিসেবে?"

কথাটা শুনে মঞ্চে বসা মানুষজন একটু হতভম্ব হয়ে থেমে গেলেন। মুনিরও বিব্রত মুখে মাথা নাড়ছিলেন। এ-আসরে এই ধরণের আক্রমণ তিনি আশা করেননি। জহিরুলের জ্ঞানের গভীরতা আছে। কথাটা সে ভুল বলেনি। পদটা দুদ্দু শাহেরই। কিন্তু তা হলেও আসরে নিমন্ত্রিত অতিথিকে সে-কথাটা এমন অভদ্রভাবে বলাটা রুচিবগর্হিত কাজ।

গোপী বাউল হতচকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন জহিরুলের দিকে। খানিক বাদে ধীরে ধীরে বললেন, "না, মানে জাত বাউল তো আর নই। জ্ঞানট্যান তত নাই। ছোটোবেলায় বাপ-মা মরে ঘর ছেড়েছিলাম। পথে পথে ঘুরি, তা সর্বেশ্বর দাস বাউল দয়া করে তেনার আখড়ায় ঠাঁই দিলেন। তেনার কাছেই শুনে শুনে যেটুক শিক্ষা। তা-বাদে আমি তো আর কিছু জানিশুনি না গো। তত্ত্বজ্ঞান দূরস্থান, কোনো জ্ঞানই তো আমার এ জীবনে হল না আর। চিরকাল শুনে এসেছি এ-হল গে উমের খাঁ সাহেবের পদ। তা ভুল যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে—"

“না না ভুল হবে কেন, ভুল হবে কেন? এই যে, শোনেন বলি—” বলতে বলতে ব্যাপারটা সামাল দেবার জন্য মুনির উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে জহিরুল ফের গোপী বাউলের দিকে ঘুরে বলে, “চিরকাল ভুল শুনেছ হে দাসমশায়। শোন বলি, এ হল মক্তবপুর। তোমার হিল্লি-দিল্লি-কলকাতা নয় যে বগলদাবায় বিলাতি খেপি নিয়ে ইস্টেজে দাঁড়ায়ে যা বললে, লোকে চক্ষু গোল গোল করি তা ফকির-বাউলের গান বলি গিলল আর আন্ডিল আন্ডিল ট্যাকা দিয়ে গেল। এ-গাঁয়ের ছেলে আমি। তত্ত্ব শিখিছি মুনির ফকিরের কাছে। আমি যদি বলি এ উমের খাঁয়ের গান নয় তাহলে তেনার নিজের ছেলে, এই আমার বাপ দূরস্থান, স্বয়ং উমের খাঁ-ও আসি যদি বলে এ-গান তেনার তাহলি তারেও বলব, ‘ভুল বলতেছ। ভুল তোমার হতে পারে, আমাদের ভুল হবে না।’ আমাদের বোকা বোঝাতে না এসে শহরের বাউল সাজা বোষ্টুমি কোলে শহরে গিয়া গান শোনাও না কেনে। এখেনে এসেছ কী করতে?”

আকস্মিক এই অন্যায় আক্রমণে গোপী বাউল একেবারে নির্বাক হয়ে গেছেন তখন। আন্তর্জাতিক আঙিনায় তাঁর বিপুল সাফল্য এসেছে। সে সাফল্যের আলোয় পৌঁছোবার পথে কখন যেন সংগীতের আঙ্গিকে তাঁর মিশে গেছে ভারতীয় সংগীতের অন্যান্য ধারার গায়কিও। হতে পারে তত্ত্বের গভীর জ্ঞান তাঁর নেই। তবু, সুর আর নিবেদিত চিত্তের সাধনায় এ-দেশের মাটির গানের খানিক রস তো তিনি পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বের আঙিনায়!

তবু, সর্বত্যাগী ফকির-বাউলের সমাজেও মাৎসর্য কোনো নতুন বিষয় নয়। আজ নিজের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই অযাচিত, তীক্ষ্ণ অপমানটুকু বড়ো ধাক্কা দিয়েছে তাঁকে। ধাক্কা দিয়েছে ভালোবাসার মানুষটিকে নিয়ে ওই উক্তিটি। অথচ এ-সাধনায় ভালোবাসার তো কোনো জাত থাকবার কথা নয়!

ঠোঁটদুটি কাঁপছিল তাঁর। দু'একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে ধীরে ধীরে মঞ্চ থেকে নীচের দিকে পা বাড়াচ্ছেন তিনি, তখন ব্রজদাসী উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তাঁকে বসিয়ে দিলেন নিজের খালি জায়গাটিতে, তারপর তাঁর হাত থেকে আনন্দলহরিটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে গিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর দু-কাঁধ বেয়ে স্বর্ণাভ চুলের ঢেউ উপচে পড়েছে। পরনের সাদা খোলের কাপড়টি তাঁর গৌরবর্ণ শরীরে ভারি ভালো মানিয়েছে। গোটা আসর হঠাৎ একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল। ব্রজদাসীর গানের খ্যাতি আছে এ অঞ্চলে। দর্শকদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাতের যন্ত্রটিতে ঘা দিলেন তিনি, তারপর গোপী বাউলের অপমানিত মুখটির দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে গান শুরু করলেন,

আমি আর চাহিনে জনম আর চাহিনে মরণ
তোমার চরণতলে রেখে দাও

শুধু তোমার চরণতলে রেখে দাও
আমি বড়ো দুখি তাই তোমারে ডাকি
সেই পলকে তবু ফিরে চাও
আমারই এ চাওয়া তাই তোমারই দেওয়া
আমার এ নশ্বর দেহে একটু হাওয়া
দুদিনের তরে এসে বেড়িয়ে যাওয়া
এ ভুল চিরতরে মুছে দাও

সাগরপাড়ের মেয়ে মার্গারেট এই দেশের মাটির সন্তান গোপীনাথ বাউলকে ভালোবেসে নিজের দেশ-ঘর-ভাষা-সংস্কৃতিকে ছেড়ে এসে বাউল ধর্মে দিক্ষা নিয়ে ব্রজদাসী হয়েছেন। কিন্তু সেজন্য কোনো লাঞ্ছনা তাঁর কপালে জোটেনি। পরম আদরেই তিনি রয়েছেন এ-দেশের মাটিতে। কিন্তু তাঁকে ভালোবেসেই গ্রাম ছেড়ে নগরের পথে পা বাড়ানো গ্রামের মানুষটি নিজের সংস্কৃতির বিশুদ্ধতাকে বিনা প্রতিবাদে বিসর্জন দিয়েছেন। পিরিতি নামের তিন আখরের নাম জপ করতে গিয়ে ত্যাগ করেছেন সুরের শুদ্ধতাকে। সাধনসমুদ্রে ডুব দিয়ে তত্ত্বজ্ঞানের রত্নখনি ত্যাগ করে ভালোবাসার নুড়িপাথর কুড়িয়ে নৌকা বোঝাই দিয়েছেন শুধু সেই মেয়েটির মুখ চেয়ে। অংশত তারই মূল্য চোকাবার দায়ে আজ এ আসরে তাঁর এই লাঞ্ছনাটুকু প্রাপ্য হয়েছে। সে গ্লানিকে মুছিয়ে দেবার জন্যই হয়তো-বা বিদেশিনী মেয়েটি প্রেমিকের কাছে তাঁর অকুণ্ঠ আত্মদানের কথা স্বীকার করে নিচ্ছিলেন সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে। ভবা পাগলার সৃষ্টি, ইষ্টদেবতার পায়ে আত্মদানের গানটি সাগরপারের মেয়ে মার্গারেটের গলায় হঠাৎ করেই যেন পরিপূর্ণ মানবিক প্রেমের গাথায় বদলে গেল।

***

জহিরুল মঞ্চ থেকে নেমে কোথায় যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল। এইবারে দেখা গেল সে ফের এসে মঞ্চে উঠছে। তার মুখে মৃদু নেশাতুর হাসির স্পর্শ। হাসতে হাসতেই ঈষৎ তরল গলায় সে বলে উঠল, "ওরে বাস রে! পিরিতি যে কাঁঠালের আঠা গো, লাগলে পরে ছাড়ে না হে—"

দর্শকের ভেতর থেকে তখন সগর্জন দাবি উঠেছে, "আর একখান হোক ব্রজদাসী।"

মাথা নামিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন ব্রজদাসী। জহিরুলের মন্তব্যটি তাঁর কানে গেছে। কিন্তু তাতে তিনি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি। একটুক্ষণ বাদে মাইক্রোফোনটি হাতে ধরে নিয়ে তিনি বললেন, "এইবারে একখানা নতুন গান শোনাবার অনুমতি দিন। এ গানের পদকর্তা হলেন বরুণ দাস। নামটি আপনাদের তত পরিচিত নয়। তবে কিনা গানটি ভালো। ওতে লোকশিক্ষা হয়।" বলতে বলতেই গানে ঢুকে এলেন তিনি—

আগে জান রে মন কীসে হয় পিরীতি
না জানলে পিরিতির মর্ম শেষে হয় অধোগতি
পি শব্দে হয় ইন্দ্রিয় দমন
রি শব্দে হয় রিপু দমন
তি শব্দে হয় রে ভক্তি
এই তিনে মিলে হয় পিরিতি
আবার রতিতে আবদ্ধ হইয়া
ঘনীভূত রস আস্বাদিয়া
তবে হয় জীয়ন্তে মরা
শুদ্ধ হয় চিত্ত মতি
ভেবে দীন বরুণ কয়
কোন কোন ভাগ্যবানের এই পিরিতি হয়
সাধন ভজনে হয় রতির উদয়
ঐ রতিতে মিলে জগতপতি

গাইতে গাইতে তাঁর অভিযোগভরা তীক্ষ্ণ চোখদুটি বারংবার ছুঁয়ে যাচ্ছিল জহিরুলকে। চারিচন্দ্রের উপাসনায় দেহরসের আস্বাদনের মধ্যে দিয়ে দেহাতীতে পৌঁছোবার যে প্রেম আরাধনায় তিনি ব্রতী হয়েছেন তাঁর ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে, সেই প্রেমের এমন সগৌরব, উচ্চকিত প্রকাশে আসরে খানিক আগে তৈরি হওয়া সমস্ত গ্লানি যেন ধুয়ে মুছে যাচ্ছিল।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন মুনির। দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন মার্গারেটের পাশে। দুহাতে তার মুখটি ধরে বললেন, "দেখো রে সাঁইয়ের লীলাখান। দুই বছর আগে এই মেয়ে যেদিন প্রথম আমার আখড়ায় আসে, বাংলা ভাষাটা অবধি জানত না। আর আজ সে মক্তবপুরের মাটিতে দাঁড়ায়ে উমের খানের নাতিরে প্রেমতত্ত্বের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা ধরে। এই জ্ঞানরত্ন কোন সাধনায় পেলা তুমি বল— বলতে বলতেই আবেগদীর্ণ ভাঙা ভাঙা গলায় তিনি গেয়ে উঠলেন-

"আগুন আছে ছাইয়ের ভেতর
আগুন বার করে নে—
আগুন ইস্পাতেতে মজুত ছিল রে
ভাই মজুত আছে পাথরে—"

তাঁর চোখে চোখ রেখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন মার্গারেট। দু-চোখ দিয়ে তার অবিরল ধারায় জল গড়িয়ে পড়ে শুধু। তারপর, একসময় ধীরে ধীরে পিতৃপ্রতিম ফকিরটির হাত ছাড়িয়ে তিনি এগিয়ে গিয়ে গোপী বাউলের হাত ধরলেন। গোটা

আসর নিঃশব্দ হয়ে দেখে চলেছিল তখন মঞ্চের ওপর অভিনীত হয়ে চলা এই জীবন নাট্যের একটা বিচিত্র অঙ্ককে।

জহিরুল কখন যেন এগিয়ে এসেছিল সামনে। হঠাৎ নীচু হয়ে সে মার্গারেট আর গোপী বাউলের পা স্পর্শ করল। তার সব অভিমান এইবারে শান্ত হয়েছে। মার্গারেটের মুখে হাসি, চোখে জল। গোপী বাউলেরও চোখ শুকনো ছিল না। দুহাতে তরুণটিকে তুলে ধরে তার চোখে চোখ রেখে বললেন, "জেনে রেখো বাবা, সর্বতত্ত্বের সার রসতত্ত্ব। পিরিতি। এই হল গিয়া তিন আখরের বীজমন্ত্র। সর্বসাধনার আধার। ওতেই সব কিছুর শুরু— আবার ওতেই সর্বতত্ত্বের লয় গো! ফকিরি তত্ত্বের জ্ঞান তোমার হয়েছে বটে, কিন্তু আসল তত্ত্বের হাতেখড়ি হতে তোমার আজও বাকি আছে। যে ভাষাতেই বল না কেন, যেদিন তোমার ঈশ্বরীর পায়ে মাথা ঠ্যাকায়ে বলতে পারবা দেহি পদপল্লবমুদারম, সেদিন তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলবে গো! আশীর্বাদ করি সে শিক্ষা তোমার পুরা হোক।"



স্ট্রেন-সি

আকাইবুরু

ফোন বাজছিল। অফিস? চমকে উঠে বালিশের পাশে রাখা ফোনটার দিকে তাকাতেই মন ভালো হয়ে গেল কৌশিকের। কল নয়। অ্যালার্ম। কল হবার সম্ভাবনা নেই। এখানে কিলোমিটার তিনেকের ভেতর টাওয়ার নেই কোনো।

জায়গাটা অনেক ভেবেচিন্তেই বেছেছিল কৌশিক। ছ-ছ'টা মাস যে কী দুঃসহভাবে কেটেছে ভাবা যায় না। একে লকডাউনে খুদে ফ্ল্যাটে দিনরাত অটিকা, আর সেই গোদের ওপর সাক্ষাৎ বিষফোড়া হয়ে উঠেছিল অফিস। দিন-রাত-শনি-রবি অফ আওয়ার বলে কোনো ব্যাপারই নেই। কিছু বললেই ঠারেঠোরে শুনিয়ে দেবে, লক ডাউনে কোম্পানির অবস্থা ঢিলে, এখন একটু কো-অপারেশান না করলে... অর্থাৎ হয় দিনরাত্তির কাজ করো, নয়তো, ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করলে বিদেয় হও।

কাজেই গাড়িঘোড়া খানিক স্বাভাবিক হতেই কৌশিক দিনদুয়েক ছুটি চেয়ে একটা মেল করে দিয়েছিল। উইক-এন্ড জুড়ে নিয়ে পাক্কা চারদিন।

জায়গাটা পুরুলিয়ার একেবারে ইন্টিরিয়ার এলাকায়। খোঁজটা দিয়েছিল ওদের অফিসের অসীম। সে নাকি কিছুদিন আগে ঘুরে এসেছে। জায়গাটার অনেক গুণগান করে ওর কেয়ারটেকার নরেন হাঁসদা-র ফোন নম্বরটা দিয়ে দিয়েছিল। ওতে অসীমের রেফারেন্স দিয়ে একটা মেসেজ পাঠালেই হয়ে যাবে। জায়গাটায় মোবাইল টাওয়ার ধরে না। হাঁসদা হপ্তায় একবার পুরুলিয়া টাউনে আসে। সেখানে মেসেজ দেখে জবাব দিয়ে দেবে।

ওই টাওয়ার না-পাওয়ার ব্যাপারটাই টেনেছিল কৌশিককে। মেইলে অতএব খুব ভালো ছেলের মতো লিখে দিয়েছিল, সঙ্গে কোম্পানির ল্যাপটপ নিয়ে যাবে। শুধু ওই

টাওয়ার না পাবার 'ইতি গজ'টা বাদ দিয়ে গিয়েছিল। ফল হল হাতে হাতে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই প্রোজেক্ট লিডার হর্ষর জবাবি মেইল, "ওকে। এনজয়। বি ইন টাচ।"

শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছিল। কৌশিক চাদরের তলা থেকে মিটমিট করে একবার তাকিয়ে দেখল। জানালা দিয়ে আকাইবুরু দেখা যাচ্ছে। আকাশ, তারপর সকালের রোদমাখা আকাইবুরু, তারপর খোলা মাঠ, তার এপাশে এই খোলার চাল দেওয়া মেটে বাড়িটা। পুরো স্বর্গ, আহা! তবে ক্ষণিকের। মাঝে কেবল আজকের দিনটা। কাল ফের ট্রেকার, তারপর বাস...

চার ঘরের বাড়িটা হোম-স্টের জন্যই নির্জন জায়গা বেছে তৈরি। তিনটে গেস্টরুম। একটা ভাঁড়ার। সামনের দিকে একটুকরো উঠোনে কাঠের চুলো। নরেন মাইলদশেক দূরে শিরিডি না কী যেন একটা গ্রামে থাকে। সকাল-বিকেল সাইকেল মেরে এসে ফাইফরমাশ, রান্নাবান্না সামলে দিয়ে যায়। তবে তার একটা মহৎ গুণ হল, যতক্ষণ থাকে কথাবার্তা বিশেষ বলে না। রান্নার হাতটাও ভালো।

গত দুদিন কৌশিক এই সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়ে বসেছিল। দু'দিন ধরে মোবাইলটা তার লাইব্রেরি আর ক্যামেরা হিসেবেই কাজ করেছে শুধু। ল্যাপটপ ব্যাগের মধ্যেই ঘুমিয়ে। সঙ্গে আনা গ্লাভস, মুখোশ আর স্যানিটাইজার ওর পাশেই ঘুমিয়ে আছে। জায়গাটায় এসে ইস্তক একটা আশ্চর্য নিরাপত্তার বোধ ঘিরে রেখেছে কৌশিককে। প্রোটেকশনগুলোর কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি সে।

সাড়ে সাতটা বাজছিল। এতক্ষণে তো নরেনের এসে চা বানিয়ে ফেলবার কথা! হলটা কী? কৌশিক চাদর থেকে মুখ বাড়িয়ে হাঁক দিল "নরেন?"

কোনো জবাব নেই আর তারপর হঠাৎ আর একটা সরু গলাও হাঁক দিয়ে উঠল পাশের ঘর থেকে, "নরেনবাবু? ও কেয়ার-টেকারদা..."

ডাকটা শুনেই মুখ বাঁকাল কৌশিক। তার নন্দনকাননে এই কাঁটাটি উদয় হয়েছেন গতকাল সন্ধের মুখ-মুখ। এখনও চাক্ষুষ দেখেনি ভদ্রমহিলাকে কৌশিক। তবে তাঁর গলার কল্যাণে চেনাপরিচিতিটা হয়ে গেছে মোটামুটি। উত্তর কলকাতার কোনো একটা কিন্ডারগার্টেন ইশকুলে পড়ান, কৌশিকের মতোই তিনিও বেশ কিছুদিন লকডাউনে আটকা থাকবার পর প্রথম সুযোগেই উইক-এন্ডের জন্য বেরিয়ে এসেছেন এবং মহামারি বিষয়ে কেয়ার-টেকারের কেয়ারলেসনেস তিনি শুধরে ছাড়বেন এই তাঁর প্রতিজ্ঞা। তা, এসে ঢোকবার পর আধঘণ্টা ধরে তীব্রমধুর কণ্ঠে নরেনের হাইজিনশিক্ষার এপিসোডটা কানে যেতে কৌশিক আর ঘর ছেড়ে বাইরে পা দেয়নি গতকাল সন্ধেবেলা।

"নরেন? জবাব দিচ্ছ না কেন?" তীক্ষ্ণ গলার শব্দটা ফের একবার উঠে এসে চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে দিয়ে গেল কৌশিকের। নাঃ। ব্যাপারটা দেখতে হয় একবার!

বাড়িটা অনেকটা জায়গা জুড়ে। সামনে ছড়ানো উঠোন। তার এক কোণে কাঠের চুলোয় আগুন পড়েনি আজ। সেদিকে দেখে নিয়ে কৌশিক বাড়ির পেছনদিকে গেল একবার। এদিকটা এ-বাড়ির টয়লেটগুলো রয়েছে। একটা জেন্টস, একটা লেডিজ। টিউবয়েল আছে একটা জলের জন্য।

এদিকটাতেও নরেনের দেখা নেই। ইতিউতি দেখতে দেখতেই হঠাৎ কৌশিক খেয়াল করল ভদ্রমহিলা ঘর ছেড়ে এদিকটায় বেরিয়ে এসেছেন। হাতে একটা খালি বালতি। মাঝারি হাইট। বয়েসে কৌশিকের চাইতে একটু ছোটোই হবেন। মাজা গায়ের রং। একটা আলগা লাবণ্য আছে।

তার নজরটা টের পেয়ে মেয়েটার মুখ হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠছিল। কটমট করে তার দিকে ঘুরে বলে, "তাকিয়ে আছেন যে? কিছু বলবেন?"

কৌশিক তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে হাঁটা দিল।

বাইরে রোদ এবারে সামান্য উষ্ণ। হু হু করে হাওয়া ছাড়ছিল আকাইবুরুর দিক থেকে। গায়ের চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিল কৌশিক। আজ আর নরেনের হাতে চা পাবার আশা নেই। ছেলেটা এভাবে দুম করে ডুব দিল কেন কে জানে! তবে সে নিয়ে ভেবে লাভ নেই বিশেষ। এখান থেকে কিলোমিটার খানেক হেঁটে গেলে আকাইবুরু বাজার। সেখানে চা-তেলেভাজা মিলতে পারে। অতএব কৌশিক সেদিকেই হাঁটা দিল।

***

"এই যে, দাঁড়ান দাঁড়ান..."

পেছনে হঠাৎ এসে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে যাওয়া গাড়িটা থেকে একটা কড়া গলা হাঁক দিয়ে উঠেছে। কৌশিক একটু চমকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। আজ সকাল থেকেই সব কিছু একেবারে অন্য কানুনে চলছে। আকাইবুরু বাজারে এসে দেখা গেল সেটা বন্ধ। জনমানুষের দেখা নেই গোটা চত্বরটায়। খানিক এদিক-ওদিক ঘুরে হাল ছেড়ে দিয়ে কৌশিক উলটোমুখে রওনা দিয়েছিল ফের। বন্‌ধ্-টন্‌ধ্ ডাকল নাকি কে জানে!

হাঁকটার মধ্যে একটা পুলিশি গন্ধ ছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে কৌশিক দেখল অনুমানটা মিথ্যে নয়।

"ট্যুরিস্ট?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানে একটা হোম-স্টে তে..."

"হুম। হাফপ্যান্ট, টি-শার্ট পরে মাস্ক ছাড়া রাস্তায় মজা করতে এসেছেন?"

কৌশিক স্পষ্ট টের পাচ্ছিল, জিপের ড্রাইভারের আসনে বসা ভুঁড়িদার লোকটার হাতদুটো নিশপিশ করছে লোকটার তার দিকে চোখ রেখে।

আস্তে আস্তে, খুব শান্ত গলায় সে বলল, "না মানে কাল সন্ধেবেলাও তো এই বাজারে..."

"দেখে তো শিক্ষিত লোক বলে মনে হচ্ছে মশাই।" লোকটা এইবার নেমে এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে, "একটা এপিডেমিক চলছে, তার মাঝখানে কন্টেনমেন্ট জোনের নিয়মের তোয়াক্কা না করে..."

"কনটেনমেন্ট জোন? মানে?"

"অ। এখন ফাঁদে পড়ে ইগনোরেন্স দেখানো হচ্ছে?" আরে মশাই 'করোনা স্ট্রেন-সি' নামটা শোনেননি নাকি? ওসব সর্দি, গলা খুশখুশ নয়, এ সাক্ষাৎ যম। ফার্স্ট সিম্পটমই ব্রিদিং ট্রাবল। জ্বর কারও আসে, কারও আসে না। তবে একবার ধরলে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে লাং কোলাপ্স। এই আকাইবুরু মার্কেট এলাকায় তিন-তিনটে ফ্রেশ ডেথ কেস। ধরেছে পরশু, গতকাল সকালে শেষ। কাল রাতে কলকাতা থেকে ভিকটিমদের টেস্ট রিপোর্ট এসে পৌঁছোতে গোটা ব্লকটাই কন্টেনমেন্ট জোন অ্যানাউন্স হয়েছে। রাত দশটা থেকে কন্টিনিউয়াস মাইকিং চলছে, আর আপনি বলছেন..."

একটা হালকা অস্বস্তির কাঁপুনি কৌশিকের সারা শরীরে ছড়িয়ে গেল। এইজন্যেই তাহলে নরেন, আকাইবুরু বাজার...

একটু অস্বস্তিভরে মাথা নেড়ে সে বলল, "মানে, যেখানটায় আছি সেখানে মাইকিং-এর কোনো আওয়াজ তো..."

দারোগাবাবু কৌশিকের মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন একবার। তারপর হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে বলেন "বিনোদ, এই হারামজাদা বিনোদ, এর থার্মালটা একবার করে নে। যত আপদ..."

সঙ্গে সঙ্গেই জিপ থেকে রোগামতো একটা কনস্টেবল নেমে এসে কৌশিকের কপালের সামনে খুদে যন্ত্রটা একবার ধরে "ঠিকই আছে" বলতে দারোগা যেন একটু স্বস্তি পেলেন। তারপর ভুরু কুঁচকে হুংকার দিয়ে বললেন, "যেখানে উঠেছেন সোজা সেখানে গিয়ে বসে থাকুন। বাইরে পা দেবেন না। বিকেলে একঘণ্টার জন্য বাজারে একটা দোকান খোলা হবে। তখন যা দরকার কিনে নিয়ে যাবেন। আর মাস্ক ছাড়া দ্বিতীয়বার দেখলে..."

বাক্যটা সম্পূর্ণ করবার আগেই দারোগার জিপের ইঞ্জিন গর্জে উঠেছে। একরাশ লাল ধুলো ছড়িয়ে দিয়ে এবার তিনি পরের শিকারের খোঁজে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে উধাও হলেন। ফাঁকা রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে কৌশিক বোকার মতো সেদিকে তাকিয়ে রইল কেবল।

***

বাড়ির সামনাসামনি এসেই প্রাণকাড়া হালকা সুবাসটা নাকে এসে লেগেছিল কৌশিকের। গুডরিকের রোস্টেড চা। কৌশিকের ব্র্যান্ড। এখানে এসেই একশো

গ্রামের একটা কৌটো সে নরেনের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। তার মানে নরেন...

স্বস্তির ভাবটা তার মিলিয়ে গেল পরক্ষণেই। উঠোনের উনুনটার মধ্যে একরাশ শুকনো পাতালতায় তখনও ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। পাশে একটা মোড়া নিয়ে বসে ভদ্রমহিলা আরাম করে একটা স্টিলের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। পায়ের কাছে কৌশিকের চায়ের কৌটো। একটা বাটিতে খানিক চা। মেরি বিস্কুটের প্যাকেট। তাকে আসতে দেখে মুখটা বেশ আষাঢ়ের মেঘের মতো করে বললেন, "পেলেন?"

কৌশিক বাটিটার দিকে একনজর তাকিয়ে দেখল। প্রাণটা আনচান করছে গন্ধে।

"কী পাব?"

"মানে? আপনি নরেনকে খুঁজতেই গিয়েছিলেন তো! এল না? আমি ওয়েট করে করে শেষে খুঁজে-পেতে চায়ের সরঞ্জাম বের করে নিজেই... "

কৌশিক কোনো জবাব দিল না। এই মুহূর্তে চা ছাড়া তার মাথা কোনো কাজ করবে না। উঠে গিয়ে ভাঁড়ার থেকে আর একটা গ্লাস নিয়ে এল সে। তারপর বাটি থেকে বাকি চা'টুকু ঢেলে নিতে যেতে ভদ্রমহিলা একটু কড়া গলায় বললেন, "আপনি কাইন্ডলি নিজের চা'টা বানিয়ে নিলে ভালো হয়। ওটুকু আমার লাগবে।"

কৌশিক টের পাচ্ছিল মাথার ভেতরে একটা পলতেতে বিনবিন করে আগুন জ্বলছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে সে গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, "যে চা'টা আপনি এখন খাচ্ছেন সেটা কিন্তু আমার আনা। গেস্ট হাউসের জিনিস নয়।"

ভদ্রমহিলা হাতের গ্লাসটায় চুমুক দিতে গিয়েও থেমে গেলেন হঠাৎ। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বললেন, "ও!" তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো পায়ে তাঁর ঘরে ঢুকে গেলেন।

আলটপকা কথাটা বলে ফেলেই কৌশিকের মাথাটা ঠান্ডা হয়ে এসেছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কী করবে তাই ভাবছে, তখন ভদ্রমহিলা হঠাৎ ঘর থেকে সটান বেরিয়ে এলেন। পোশাক পালটে নিয়েছেন এর মধ্যেই। জিন্‌স টি-শার্ট। পিঠে একটা ছোটো স্যাক।

কৌশিক তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, "ম্যাডাম প্লিজ..."

ভদ্রমহিলা একবার তাঁর দিকে ঘুরে তাকালেন, "কিছু মনে করবেন না। এখানে আগেও একবার থেকে গেছি আমি। জায়গাটা ভালো। সেফ। কিন্তু এযাত্রা এসে যা হাল দেখছি তাতে... আর তার ওপর এরকম একটা কোম্পানিতে দুটো দিন কাটানো! সকালে তো মনে হল টয়লেটের দিকটা আমায় স্টক করছিলেন। আর এখন... সরি। রাস্তায় ট্রেকার পেয়ে গেলে দশটার বাসটা ধরে নিতে পারব। "

"ম্যাডাম প্লিজ, আমার কথাটা শুনুন... এখানে এখন..."

কোনো জবাব না দিয়ে বড়ো বড়ো পায়ে বাড়ির চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন মহিলা।

সেদিকে একনজর তাকিয়ে দেখে হাল ছেড়ে দিল কৌশিক। এর পেছন পেছন তাড়া করে যাবার কোনো মানে হয় না। যেতে চায় যাক। স্টকার। হাঃ। এই বদনামটাই বোধ হয় পাওয়ার বাকি ছিল জীবনে।

ফাঁকা বাড়িটা হা-হা করছিল। উনুনের পাশে বিস্কুটের প্যাকেট... নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন ভদ্রমহিলা। নষ্ট করে লাভ নেই। খিদেও পাচ্ছে একটু আধটু। কৌশিক বিস্কুটের প্যাকেটটা কাছে টেনে নিল।

***

ব্যাপারটা এত অপ্রত্যাশিত যে, পরের মুভটা ঠিক কী হওয়া উচিত সেটা বুঝে উঠতে পারছিল না কৌশিক। জায়গাটা গ্রামের একটেরেতে। লোকজনের যাতায়াত নেই। পেছনে ফাঁকা মাঠ আর আকাইবুরু রেঞ্জ হা-হা করছে। চা শেষ করবার পর প্রায় আধঘণ্টাটাক সে চুপচাপ বসে ছিল উঠোনে। নিজেকে বেশ রবিনসন ক্রুসো টাইপের ঠেকছে এই মুহূর্তে।

বেলা চড়ে উঠছিল আস্তে আস্তে। এভাবে বসে থাকবার কোনো মানে নেই। কৌশিক উঠল অতএব। কদ্দিনের জন্য আটকা পড়া গেছে বোঝা যাচ্ছে না। এখন প্রথম যেটা দরকার তা হল খাবার। উঠে ভাঁড়ারের দিকে একবার গেল সে।

নরেন গোছানো ছেলে। খানিক চাল, মুসুর ডাল, এক বোতল তেল, ঝুড়িতে মশলা, নুন— জোগাড় মোটামুটি করেই রেখেছে সে রসদের। কিন্তু...

এই 'কিন্তু'-টাতেই আটকে গিয়ে খানিক বাদে উঠোনে উবু হয়ে বসেছিল কৌশিক। সামনেই উনুন নির্বিকল্প সমাধিতে অচল। তার মাথায় হাঁড়ির কানাভরতি জল নিশ্চল। হাঁড়ির নীচে গুঁজে দেওয়া কাঠগুলোর ভেতরে আরও একটা জ্বলন্ত দেশলাইকাঠি ফেলে দিল সে। তারপর সেটার নিভে যাওয়াটা দেখতে দেখতেই রহস্যটা নিয়ে ভাবছিল কৌশিক। আগুনের সংস্পর্শে দাহ্য বস্তু এলে তাতে আগুন ধরে। সাধারণ ফিজিক্সের সূত্র। অথচ এই খড়খড়ে শুকনো কাঠগুলো কেন যে...

"এই যে! এতক্ষণ ফালতু কাঁদুনি গেয়ে আমাদের টাইম ওয়েস্ট করছিলেন কেন ম্যাডাম? 'একলা ট্যুরে এসে ঝামেলায় পড়ে গেছি... হেল্প চাই...' আর এদিকে এই ভদ্রলোক সকালে বাজারের জোগাড় দেখতে বাইরে বেরিয়ে লক-আপ যাবার হাল করেছিলেন..."

হঠাৎ চেনা গলাটা ফের একবার কানে যেতে সেদিকে ঘুরে তাকাল কৌশিক। বাড়ির সামনে জিপটা এসে থেমেছে এবং সেই অবিসংবাদিত উর্দি উপচানো ভুঁড়ি জিপের ভেতর থেকে পাশে বসা ভদ্রমহিলাকে নীচে নেমে যেতে ইশারা করছেন।

"আপনি ভুল করছেন দাদা..."

প্রায় একই সঙ্গে দুটো গলা বেজে উঠল দু'জায়গা থেকে। কৌশিক তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তার আগেই ভদ্রমহিলাকে নামিয়ে দিয়েছেন থানাদার ভদ্রলোক। তারপর ফের ইঞ্জিনে চাবি ঘুরিয়ে গাড়িটা ব্যাক করতে করতেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে গেলেন, "ঝগড়াঝাঁটি করবার হলে মনের সুখে বাড়িতে বসেই করবেন মশাই। এভাবে মেয়েছেলে একা একা বেরিয়ে গিয়ে রওনা দিচ্ছে... হুঁঃ। বলে কিনা একা এসেছি! কলকাতা যাবার ট্রান্সপোর্ট অ্যারেঞ্জ করে দিন... আরে কন্টেনমেন্ট জোন থেকে হুট করে বের করে নিয়ে গিয়ে শেষে চাকরিটা খোয়াব নাকি? যাকগে, সামলেসুমলে রাখবেন মশাই। ফের বাইরে দেখলে..."

একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে উঠোন জুড়ে। ভদ্রমহিলা বারান্দায় উঠে স্যাকটা পাশে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মাটির ওপরেই থেবড়ে বসে পড়েছেন। একটুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে কৌশিক উঠল। স্টেলমেটটা এইভাবে চলতে দেয়া যায় না। একপক্ষকে নীচু হতে হবে একটু এই মুহূর্তে।

তাকে বারান্দার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মুখটা কঠিন হয়ে উঠছিল ভদ্রমহিলার। ভাবটা কৌশিক চেনে। ভয় পাচ্ছেন ইনি। একে তো এরকম একটা খবরের শক, তারপর পুলিশের উৎপাত। তার ওপরে ফাঁকা বাড়িতে একজন অচেনা পুরুষ...

খানিকটা দূরত্ব রেখে উঠোনে দাঁড়িয়েই কৌশিক হাতদুটো জোড় করে বলল, "নমস্কার। আমার নাম কৌশিক হালদার। ভদ্রলোকের ছেলে। কলকাতায় গিরীশ পার্কে থাকি। আপনার নামটা জানতে পারি কি?"

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর বেশ গম্ভীর গলায় জবাব এল, "মালিনী চৌধুরী। এবারে বাড়ির ঠিকানা চাইবেন, তাই তো?"

কৌশিক হাসল, "না ম্যাডাম। আপনার পার্সোনাল বিষয়ে কোনো কৌতূহল আমার নেই। শুধু একটা হেল্প চাইছিলাম। "

একটা ভুরু একটু উঁচুর দিকে উঠল।

"বলছিলাম, খেতে হবে তো কিছু দুপুরে। কিন্তু উনুনটা জ্বলতে চাইছে না। আপনার যদি কায়দাটা জানা থাকে..."

মালিনী একবার উনুনটার দিকে ঘুরে তাকাল। ঠোঁটে একটা হালকা হাসির ছোঁয়া এল কি? এই মুহূর্তে অবশ্য সেদিকে নজর দেওয়াটা রিস্কি হয়ে উঠতে পারে। কৌশিক তাড়াতাড়ি হাঁড়ির দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিল।

মেয়েটা ততক্ষণে উঠে ভাঁড়ার ঘরের ভেতর থেকে একটা বেঁটে পাইপ খুঁজে নিয়ে উঠোনে নেমে এসেছে। উনুনটার ভেতরে ঠেসে রাখা চ্যালাকাঠগুলো থেকে ক'খানা টেনে বের করে দিল। তারপর পাশে জমানো শুকনো পাতাগুলোর দিকে ইশারায় দেখাল। কৌশিক উনুনে কিছু পাতা গুঁজে দিয়ে ফের দেশলাইয়ের আগুন

দিতে কাঠের টুকরোগুলোকে ঘিরে পাতাগুলো ধু-ধু করে জ্বলে উঠেছে। এবারে পাইপটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে মালিনী বলল, "ফুঁ দিতে থাকুন। যতক্ষণ না কাঠে আগুন ধরে..."

***

"গুঁড়ো সাবান আছে?"

"আজ্ঞে না।"

কৌশিক হতাশ চোখে একবার দোকানদারের দিকে তাকিয়ে দেখল। এই নিয়ে তার তিন নম্বর 'না।' মশার ধূপ- নেই। ব্রিটানিয়া মারি- নাম শোনেনি। এবার গুঁড়ো সাবানও...

তবে চাহিদামাফিক জিনিসপত্র না থাকলেও লোকটা ভালো সেলসম্যান। মশার ধূপের বদলে এক শিশি মহুয়া তেল গছিয়েছে। নাকি আগুনে এক ফোঁটা ফেললে মশা থাকে না। ব্রিটানিয়ার বদলে লেড়ো বিস্কুট। এইবার সে হাসি-হাসি মুখে একটা বস্তার দিকে দেখিয়ে বলল, "সোটা নিয়ে যান। কাপড়চোপড় একেবারে ধপধপি করে উঠবেক।"

কৌশিক ম্লান হাসল একটু, "আচ্ছা, দিয়ে দাও আড়াইশো।" গুঁড়ো সাবানটা মালিনী আনতে বলেছিলেন হ্যান্ড স্যানিটাইজারের বিকল্প হিসেবে। দুটো খুদে বোতল ছিল দু-জনের কাছে। স্টক মিলিয়ে দেখা গেছে তার আয়ু আর এক-দুদিনের বেশি নয়। এখন ওই সোডা দিয়েই তবে...

দূরে দাঁড়ানো উর্দি পরা চৌকিদারটা এদিকে দেখছিল। দোকানদার সেদিকে আড়চোখে একবারে দেখে ছেঁড়া একটা গামছা দিয়ে মুখটা ঢেকে নিয়ে বলল, "তাহলে আপনার হল গিয়ে বিসকুট তিন প্যাকেট, মহুয়ার তেল, ক্রাচিন এক লিটার আর এই সোটা...একুনে ছাপ্পান্ন টাকা পঞ্চাশ..."

পলাশ, মহুয়ার অরণ্য এখন পাতাহীন। শুকনো ডালগুলির মধ্যে দিয়ে শনশন করে হাওয়া বয়ে যায়। আকাইবুরুর পেছনে সূর্য নেমে গেছে অনেকক্ষণ। লালচে আকাশের পটভূমিতে কোবাল্ট-ব্লু প্রাচীন পাহাড়। সেই পাহাড়টির দিকে লক্ষ্য ধরে প্রাক্‌সন্ধ্যার হিমেল হাওয়া গায়েমুখে মেখে নিতে নিতে যুবকটি তার আস্তানার দিকে হেঁটে যায়। হাঁটতে হাঁটতেই হঠাৎ একটা কথা ভেবে একটু হাসি পেয়ে গেল কৌশিকের। বাবা এখনও এইভাবে জলপাইগুড়িতে বাড়িতে ঢোকে সন্ধেবেলা। দিনান্তে পরিবারের কর্তা বাড়ির দিকে ফিরছেন। হাতে গিন্নির বলে দেওয়া লিস্ট মেলানো সংসারের রসদ... ধেৎ!

অনেকদিন বাড়ি যাওয়া হয় না। অনেকদিন...

***

দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। প্রতিটা দিনই আগের দিনটার চাইতে বেশি অসহ্য হয়ে উঠছিল তাদের। একটা খুদে বাড়ি। তার মধ্যে দুটি মানুষের অলীক, অপ্রার্থিত সংসারযাপন। নিতান্ত বেঁচে থাকবার দায়ে কিছু অচেনা লাইফ স্কিলের অনুশীলন করতে করতে চলা...

অনভ্যস্ত হাতে কাঠের উনুনে মাটির পাত্রে খাবার তৈরির কৌশল রপ্ত করতে দুটো পুরো দিন লেগে গিয়েছে তাদের। কাঠের আগুন নিভে যায়। মাটির বাসন ভেঙে যায় অভ্যাসহীন হাতে। সীমিত রসদের দোকানে যেটুকু চালডাল মেলে তাতে দুবেলার বেশি চলে না। অতএব চালডাল, জ্বালানি, নতুন পাত্র... তাদের সন্ধানে কৌশিকের প্রতিদিন বারংবার বাইরে যাওয়া। কখনো আকাইবুরুর বাজারের ওই একটামাত্র দোকানে, কখনো কাছাকাছি বসতিগুলোর মানুষজনের কাছে। তারপর ফিরে এলে, মালিনীর আতঙ্কিত মুখ। এলাকা জুড়ে আরও কিছু মৃত্যুর খবর এসেছে। হয়তো ওই যুবকের শরীরেই এযাত্রা ভর করে এসেছে মারণ ভাইরাসের নতুন স্ট্রেন। হয়তো আজ যে রসদগুলো সে জুটিয়ে এনেছে তাতেই...

বিচিত্র এই পরিস্থিতিটা ফের একবার আধুনিক নগরজীবনের সমস্ত দর্শনকে ব্যর্থ করে দিয়ে তাদের জীবনকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কর্মবিভাজনের একটা প্রাচীন ও পরিত্যক্ত সংস্কৃতিতে। দোকান-বাজার, পরিস্থিতির খবর নেওয়া এই সমস্ত বাইরের কাজকর্মের দায়িত্ব কৌশিকের। কারণ, সংক্রমণ নিয়ে মালিনীর আতঙ্কটা প্যারানইয়ার পর্যায়ে চলে গেছে। বাড়ির বাইরে পা দিতে সে রাজি নয়।

অন্যদিকে, বাড়িতে আটকা থেকে গৃহস্থালির অধিকাংশ দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়েছে মালিনীকেই। তার মূলেও সেই সন্দেহ। বাইরের দুনিয়ায় প্রাত্যহিক খাদ্য সংগ্রহ অভিযানে যাওয়া এই যুবকের হাতে খাবার তৈরি কিংবা বাসনকোসন, পোশাক-আশাক পরিষ্কার রাখবার দায়িত্ব সে দিতে রাজি নয়।

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বেঁচে থাকবার লড়াই মানুষকে কাছে টানে। কিন্তু এই আশ্চর্য অসুখ সেই সুযোগটা থেকেও বঞ্চিত করেছিল তাদের। তার রাজত্বে মানুষে-মানুষে মুখোশবিহীন ঘনিষ্ঠতার শাস্তি মৃত্যু। যে যত একা, যার মুখোশ যত পুরু, সে তত আয়ুষ্মান।

এছাড়াও, দূরত্বের আরও একটা কারণ ছিল। নির্জন বাড়িতে একক পুরুষের সান্নিধ্যে বাধ্যতামূলক দিন ও রাত্রিযাপন। যুবতিটির কঠোর চোখ অতএব প্রতি মুহূর্তে গভীর সন্দেহে পাহারায় রেখেছে তাকে। সেটা বড়ো অপমানকর ঠেকে কৌশিকের কাছে। সে-ও যে ভদ্রসন্তান, তা ভুলে যাবার অধিকার কে দিয়েছে ওই যুবতিকে?

নাগরিক জীবনে ব্যক্তির একাকিত্বকে ঢেকে দেয় আধুনিক যোগাযোগে ভর করা গোষ্ঠীজীবন। টেলিফোন, ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, হোয়াটস অ্যাপ, স্ন্যাপচ্যাট। প্রতি মুহূর্তের হাজারো অনুভূতিকে অগণিত পরিচিত-অপরিচিতের সঙ্গে ভাগ করে নেয়া।

অথচ এইখানে, এই নিঃসীম আতঙ্কের বন্দিজীবনের অনিশ্চয়তাকে সেইপথে ভাগ করে নেবার পথটুকুও বন্ধ। বারে বারে তারা নিজের নিজের চার্জ ফুরিয়ে যাওয়া মৃত মোবাইল ফোনগুলোর দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখে। ওই যন্ত্রে তাদের যার যার প্রিয়জনের বসবাস। অবশ্য চার্জ থাকলেও বা লাভ কী ছিল! হতচ্ছাড়া এই নরকে মোবাইল টাওয়ার নেই যে।

এই সমস্ত কিছু মিলেই একটা গভীর তিক্ততার জন্ম দিয়েছিল বাড়িটার বাতাসে। দুটি মানুষ। একটি প্রায়-দাম্পত্যহেন জীবন। অথচ তারা কেউ একে অন্যের সঙ্গে কথা বলে না। প্রথম দুটি দিনের বারংবার ঠোকাঠুকি ও ঝাঁঝালো আদানপ্রদানের পর ভাব বিনিময়ে উৎসমুখগুলো শুকিয়ে গেছে তাদের। এখন কেবল যন্ত্রের মতো দিনযাপন।

সকালে উঠে একটুকরো কাগজে গৃহস্থালির প্রয়োজনের জিনিসপত্রগুলোর নাম লিখে রেখে যায় মালিনী। তারপর, সেই জিনিসপত্র জুটিয়ে কৌশিক ফিরে এলে তার শুদ্ধ হবার পালা। একটা বড়ো বালতিতে হালকা সোডা মেশানো জল করে রাখে মালিনী। জিনিসটা চামড়ায় জ্বালা ধরালেও সেটা কৌশিককে মেনে নিতে হয়েছে। একরকম নিরুপায় হয়েই। বিকল্প তো কিছু নেই হাতে।

এর পর যৎসামান্য রান্নাবান্না সেরে কৌশিকের থালায় খাবারগুলো দিয়ে মালিনী অপেক্ষা করে। সেটা তুলে নিয়ে কৌশিক নিরাপদ দূরত্বে সরে গেলে সে নিজে খায় ও বাসনপত্রগুলো ফের একবার অবশিষ্ট সোডার জলে ধুয়ে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়।

তবে আজ, বেশ কয়েকদিন বাদে সে-রুটিনের ব্যত্যয় হল একটু। একটু বেলা করেই বাজারে গিয়েছিল কৌশিক আজ। গত দিনতিনেক কোনো নতুন সংক্রমণের খবর না থাকায় দুদিন ধরেই বাজারের ওপর নিষেধের কড়াকড়ি কমে এসেছে। দোকানপাট সব খুলছে আস্তে আস্তে। দুপুর অবধি বেচাকেনাও চলছে মোটামুটি।

গিয়ে জানা গেল, লকডাউন এবারে যে-কোনো সময় তুলে দেওয়া হবে। সদর থেকে বিড়িপাতা কেনবার ফড়েরা বাজারে এসেছে ফের বেশ ক'দিন বাদে। তারাই খবর নিয়ে এসেছে। খবরটা শুনে একঝলক মুক্তির হাওয়া যেন বয়ে গিয়েছিল কৌশিকের মনে। কিন্তু বাড়ি ফিরে সেটা চুপসে গেল একেবারে হঠাৎ করেই। খুশি-খুশি মুখে উঠোনের ঢুকে এসে সে দেখে বারান্দার একটা খুঁটি ধরে মালিনী চুপ করে বসে রয়েছে। উনুনের পাশে ভাতের হাঁড়িটা নামানো। ফ্যান গালা হয়নি তার। তাকে দেখে কোনো কথা না বলে উঠে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

আবার নতুন করে কী হল কে জানে! এই ক'দিনে মেজাজের যা বহর দেখা গিয়েছে তাতে এখন একে কিছু জিজ্ঞাসা করা আর হাড়িকাঠে গলা ঢুকিয়ে দেওয়া একই ব্যাপার। তবে টর্চারটা আর বেশিদিন সইতে হবে না এইটাই যা সান্ত্বনা। যা খুশি করুক গে। স্নান সেরে রান্নাঘর থেকে একটা থালা নিয়ে এসে কৌশিক ফেনাভাত খানিকটা

তাতে তুলে নিয়ে একটু তেল-নুন ছড়িয়ে খেয়ে নিল। তারপর থালা ধুয়ে হাঁড়ির বাকি ভাতে জল দিয়ে সেটা বারান্দায় তুলে রেখে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ল গিয়ে।

***

ঘুম ভাঙল কাঁধে কার ঘন ঘন ঝাঁকুনি খেয়ে। ধড়মড় করে উঠে বসে কৌশিক দেখে ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে। নরেন এসেছে। একটা ট্রে-তে দু'কাপ চা নিয়ে এসে তাকে ডাকছিল সে। কৌশিক উঠে বসতে একটা কাপ বাড়িয়ে ধরে বলে, "চলে এলাম স্যার।"

"চলে এলে... মানে?"

নরেন মাথা নেড়ে হাসল, "সন্ধেবেলা লকডাউন তুলে নিয়েছে স্যার আকাইবুরু থেকে। খবরটা পেয়েই ছুটতে ছুটতে আসছি। কী যে দুশ্চিন্তায় কেটেছে ক'টা দিন স্যার! এবারে তাড়তাড়ি আপনাদের রান্না সারি আগে। ফিরতে হবে আবার। মায়ের শরীরটা..."

"কী হল তাঁর? করোনা-টরোনা..." কৌশিক সাবধান হল।

"না স্যার। পরশু পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছে। এখন চান-বাহ্যি সব কোলে করে চলছে কি না। যাই, ম্যাডামকে চা-টা দিয়ে রসুই বের করে নি।"

"হ্যাঁ যাও," বলতে বলতেই মাথা ঝাঁকাল কৌশিক, "কিন্তু সাবধান। মেজাজ সুবিধের নয়। কী হয়ছে কে জানে, দুপুর থেকে না খেয়ে দোর দিয়ে শুয়ে আছে।"

"ওনার উৎপাতে আমাদের অভ্যেস আছে স্যার। আগেও এসেছেন! তবে মানুষটা ভালো। সামলে নিচ্ছি," বলে হাসিমুখে বেরিয়ে গেল নরেন।

রাত বেড়েছে। টিমটিমে হ্যারিকেনের আলোয় বাড়ির চারপাশটা ভূতুড়ে দেখায়। দূরে আকাইবুরুর গায়ে একফালি চাঁদের মরা আলো। চায়ের কাপটা হাতে করে বারান্দায় এসে একটা সিগারেট ধরাল কৌশিক। মালিনীর ঘরের দরজাটা আধখোলা। ভেতরে হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়েছে নরেন। ঘরের ভেতর তার চলাফেরার শব্দ...

খানিক বাদে উদ্বিগ্নমুখে ঘর থেকে নরেন বেরিয়ে আসতে কৌশিক তার দিকে ভ্রূ উঁচিয়ে তাকাল। নরেনের মুখে তীব্র আতঙ্কের ছাপ ছিল, "আ... আমি বাড়ি যাই স্যার। আমি..."

"বাড়ি যাবে? মানে?"

"ম্যাডামের ঝেঁপে জ্বর এসেছে। তাড়সে ভুল বকছে স্যার। আ... আমি..."

কৌশিকের সারা শরীর বেয়ে একটা হিম স্রোত বয়ে গেল।

"এই অবস্থায় তুমি..."

কেমন যেন কুঁজো হয়ে পড়েছে নরেন। ভেতরে একটা যুদ্ধ চলছে যেন তার। খানিক বাদে আস্তে আস্তে বলল, "বাড়িতে দু'দুটো বুড়ো মানুষ স্যার। খেটে খাই। একে তো এই ছ'টা মাস একটা পয়সার মুখ দেখিনি। এবারে যদি এ-জিনিস বাড়িতে ঢোকে..."

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কৌশিক, "যাও তবে। শুধু লোকাল থানায় যদি একটা খবর দিয়ে যেতে পারতে..."

"পারব না স্যার," নরেন মাথা নাড়ল, "গেলেই আমাকেও কোয়ারেন্টিন করে দেবে পনেরোদিন। খাব কী?"

নরেন চলে যেতে একটুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কৌশিক। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে এসে ঝোলা থেকে ওষুধের পাউচটা, গ্লাভস আর মুখোশ বের করে নিয়ে মালিনীর ঘরে এসে ঢুকল। কয়েকটা প্যারাসিটামল তার থাকেই ওতে। এই মুহূর্তে ওই একটি ওষুধ বাদে আর কিছু করবার নেই তার।

বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটা জ্বরের তাড়সে গোটা বেডশিটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। এলোমেলো বেডশিটের মধ্যে তার জ্বরতপ্ত মুখখানা জেগে থাকে কেবল।

"শুনছেন?"

একটু অস্বস্তি নিয়েই চৌকিটার পাশে এসে দাঁড়াল সে। সাবধানে... খুব সাবধানে হাতটা তার কপালে ঠেকিয়ে দেখল একবার। কপালটা পুড়ে যাচ্ছে গরমে।

"শুনছেন? হ্যালো... শুনছেন? "

বারতিনেক ডাকবার পরে চোখদুটো খুলে গেল তার। টকটকে লাল দৃষ্টিহীন দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে অসম্বদ্ধ দু'একটি কথা। ট্যাবলেটটা তার মুখে গুঁজে দিয়ে জলের গ্লাসটা সামনে ধরল কৌশিক। তৃষ্ণার্ত মরুভূমির মতই জলটুকু শুষে নিল মালিনী। তারপর ফের চোখদুটো বুজে এলিয়ে পড়ল বিছানায়।

রাত বাড়ছিল। জ্বর সেই একই জায়গায় আটকে রয়েছে। সারা শরীরে মৃদু খিঁচুনি শুরু হয়েছে মেয়েটার। বিছানার পাশ থেকে সরে এল কৌশিক। জ্বরটা যেভাবে হোক কন্ট্রোল করা দরকার।

বাইরে বের হয়ে গিয়ে বাড়ির পেছনদিকের টিউব ওয়েলটা থেকে আধ বালতি জল ভরে নিয়ে ফিরে এল ফের কৌশিক। বারবার এভাবে ক্লোজ কন্ট্যাক্টে আসা... কিন্তু সে-মুহূর্তে আর কোনো উপায় ছিল না তার।

মাস্কটা মুখে এঁটে, পায়ের কাছে বালতিটা রেখে একটা গামছা তাতে ভিজিয়ে নিল কৌশিক। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নিয়েছে। ওটা পরে ধুয়ে নিলেই হবে সাবান জলে। তারপর সাবধানে মেয়েটার মাথাটা তুলে ধরে গামছাটা ছড়িয়ে দিল তার কপালে।

আরাম পেয়েছে মেয়েটা। একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরে কৌশিকের উরু জড়িয়ে ধরে চোখ বুজল সে।

এক-একটা মিনিট যেন এক-একটা ঘণ্টার মতো কেটে যাচ্ছিল কৌশিকের। ঘড়ির ডায়াল আস্তে আস্তে রাত তিনটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যে বারদুয়েক

বালতির জল পালটে এনেছে সে। মেয়েটা ঘুমোচ্ছে নিঃসাড়ে।

তাপ একটু কম লাগছে কি? কৌশিক তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। ঘামছে? তার গলায়, বুকের খোলা অংশটুকুতে...

সাবধানে একবার মেয়েটার গলায় হাত ছুঁইয়ে দেখল কৌশিক। হঠাৎ বুকের থেকে একটা পাষাণভার সরে গেছে যেন তার। ঘামছে ও। জ্বরটা ব্রেক করছে... এযাত্রা...

"কী অসভ্যতা করছেন আপনি? সরুন আমার বিছানা থেকে। এইভাবে রাতে একলা ঘরে..."

হঠাৎ দুর্বল অথচ তীক্ষ্ণ গলাটা একটা জ্বলন্ত কাঁটার মতো এসে ধাক্কা দিল কৌশিকের কানে। যেন একটা বৈদ্যুতিক শক খেয়ে সে ছিটকে গেছে বিছানাটা ছেড়ে ঘরের অন্যপ্রান্তে।

বিছানায় উঠে বসেছে মালিনী। তার চোখে একই সঙ্গে ভয়, ঘেন্না আর তীব্র রাগের মিশেল ছিল।

"আ...আমি... আপনার টেম্পারেচারটা..."

"টেম্পারেচার? বাজে কথা বলবেন না। ঘুমের ভেতর সোজা একেবারে বিছানায় উঠে এসে গায়ে হাতফাত দিয়ে..."

নাঃ। রাগ নয়। একটা গভীর দুঃখ ছেয়ে ফেলছিল কৌশিককে। বিছানা থেকে নেমে এসেছে মেয়েটা। টলছে একটু একটু। ওর পক্ষে এমনটা ভাবা অস্বাভাবিক নয়। গত কয়েকঘণ্টা কোনো চেতনা ছিল না ওর। কী হয়েছিল, কী করেছে কৌশিক সে-সময়টা সে ওর জানবার কথা নয়। কিন্তু তবু, একটু বিশ্বাস... একটু ভরসা কি সত্যিই করতে পারত না মালিনী?

"এখনও এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে?"

মাথা নাড়ল কৌশিক। তারপর বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, "রাত এগারোটায় একটা ৬৫০ এমজি প্যারাসিটামল পড়েছে। জ্বরটা রিল্যাপ্‌স করলে সকাল সাতটায় আর একটা নেবেন। আপনার বালিশের কাছে রাখা রয়েছে।"

কলকাতা

যেন গভীর একটা পুকুরে ডুবে চলেছিল সে। জলের চাপ বাড়ছে ক্রমাগত। প্রাণপণে একটু বাতাস টেনে নিতে চায় তার ক্লান্ত ফুসফুসদুটো... বড়ো যন্ত্রণা...

না। চেতনা হারালে চলবে না। এই নির্জন ফ্ল্যাটে কেউ নেই এখন তার কাছে। কেউ আসবে না। শ্বাসের কষ্টটা কাল শেষরাত্রি থেকেই চূড়ান্ত চেহারা নিয়েছে। প্রাণপণে লড়ছিল কৌশিক তার সঙ্গে।

বেলা কত হল? কে জানে। পুরুলিয়া থেকে ফিরে আসবার পর দিন তিনেক ধরে জীবনটা ফের সবে পুরোনো চেনা ছকে বইতে শুরু করেছিল তার। আর তারপর...

শরীরে অস্বস্তিটা শুরু হয়েছিল গতকাল রাত থেকেই। বুকের ভেতরটা কেমন খামচে ধরা একটা অনুভূতি। পাত্তা দেয়নি কৌশিক। সিজন চেঞ্জের সময়। ওরকম একটু-আধটু হতেই পারে। সিগারেট খাওয়াটা এইবার কমাতে হবে একটু আর রোজ একটু ওয়ার্ক আউট...

...আর তারপর, শেষরাত থেকে...

ফোনটা যে কোথায় রয়েছে... জলপাইগুড়িতে একটা ফোন করতে পারলে... উঁহু। বাবা বুড়োমানুষ। শুধুমুদু উদ্বিগ্ন হবেন। তাহলে হর্ষকে অফিসে একবার... ফোনটা যে কোথায়... মাসি? ও মাসি... ধুস্! আজ রোববার। মাসির অফ ডে... নরেন... ট্রেকার ডেকে দেবে একটা? আমি...

ছেঁড়া-ছেঁড়া সচেতন চিন্তার টুকরোগুলো সঙ্গে জ্বরবিকারের ছবিগুলো গলে-মিশে এক হয়ে যাচ্ছিল তার... মেয়েটা... তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে... দেখতে দেখতে মুখটা বেঁকেচুরে বদলে গিয়ে... ও কে? ও... আচ্ছা উপুড় হয়ে শুলে একটু আরাম হয়? কাজটা কঠিন... খুব কঠিন... ডানদিকের পাঁজরাগুলোয়... ডানদিকের? নাকি...

ফের একবার সেই অন্ধকার, গভীর জলটার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল সে। একটু বাতাসের জন্য তীব্র আক্ষেপে শরীরটা বেঁকেচুরে যায় তার...

...কোত্থেকে একটা বিরক্তিকর শব্দ আসছে। ক্র-র-র- ক্র-র-র-

"আঃ! থামবে তুমি মা? আ-আমি... আমি আর একটু ঘুমোব। আজ রোববার না?"

তবু...ফের শব্দটা উঠে আসে তার যন্ত্রণাকাতর অর্ধচেতনাকে ছিঁড়েখুঁড়ে। কলিং বেল-এর শব্দ! কেউ এসেছে! আর একজন মানুষ!

শরীরের শেষ শক্তিটুকু খরচ করে উঠে দাঁড়াল কৌশিক। যে-কোনো মূল্যে ওই দরজাটার কাছে পৌঁছোতে হবে তাকে...

***

"যান মশাই। নিতান্ত বয়েসটা কম। কো-মর্বিডিটি নেই কোনো, তাই দিনসাতেকের ভোগান্তি করেই বেঁচে গেলেন এযাত্রা। রিপোর্ট পরিষ্কার। আমি রিলিজ লিখে দিচ্ছি। এই টাইপ-সি স্ট্রেনটা যে কী প্রচণ্ড ভিরুলেন্ট মশাই! কেস রিপোর্ট যা দেখছি, তাতে পুরুলিয়ায় বাংলার একমাত্র স্ট্রেন-সি হটস্পটটায় গিয়ে বসে ছিলেন ওখানকার আউটব্রেকের গোটা পিরিয়ডটা। আপনারা এডুকেটেড লোক হয়ে কীভাবে যে..."

কৌশিক মাথা নেড়ে বাইরের দিকে দেখল একবার। জানালা দিয়ে বাইপাসের

গাড়িঘোড়ার স্রোত চোখে পড়ে। মন্দার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের এই এইটথ ফ্লোর থেকে অনেকটা আকাশ দেখা যায়। আইসিইউ থেকে বেরোবার পর গত তিনদিন নির্জন কেরেন্টিনে ওই আকাশ দেখেই সময় কেটে গেছে তার।

"টাকাপয়সা সইসাবুদের ব্যাপারগুলো..."

"ডোন্ট ওরি," ডাক্তারবাবু মাথা নাড়লেন, "ও আপনার বাড়ির লোক সামলে নিয়েছেন সেসব। ভদ্রমহিলা এই ক'দিন দুবেলা এসে খোঁজও নিয়ে গেছেন বাইরে থেকে। কাল সন্ধেবেলা পেমেন্টও সব মিটিয়ে দিয়েছেন। এখন ঘরের ছেলে ঘরে যান তো মশাই। আসবার সময় দেখলাম লাউঞ্জে ওয়েট করছেন সেই সকাল থেকে এসে। আর এই যে, আপনার ফোনটা। নিয়ে যাবেন। চার্জ নেই বোধ হয়।"

লকার থেকে প্লাস্টিকের পাউচে আটকানো ফোনটা হাতে নিয়ে একবার খুলে দেখল কৌশিক। মা... জলপাইগুড়ি থেকে...

***

হুইল চেয়ারে বসে লাউঞ্জে বের হয়ে আসতে আসতে কৌশিকের চোখদুটো ভিড়টার অলিগলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আর তারপর, পেছন থেকে একটা পরিচিত গলা বলে উঠল, "থ্যাঙ্ক ইউ ভাই। আপনি ওঁর ব্যাগটা নিন। আমি চেয়ারটা নিচ্ছি।"

কৌশিক মুখ ঘুরিয়ে দেখল একবার। মালিনী। সেই চেনা জিন্‌স টি-শার্ট। পনিটেল করা চুল কাঁধ ছাপিয়ে।

"উফ! যা ভোগালেন আমায় ক'টা দিন! কাজকর্ম চুলোয় উঠেছিল সব। কী কুক্ষণে যে সেদিন আপনার ফ্ল্যাটে এসেছিলাম! জাস্ট একটা 'সরি' বলবার জন্য আসা। তো এসে দেখি ওই অবস্থা। অতবড়ো ভারী শরীর মেঝে থেকে টেনে তোলা... একটাও লোক নেই যে ডেকে হেল্প চাইব। শেষে কোনোমতে বিছানায় এনে শুইয়ে মাথায় জল ঢালতে ঢালতেই মন্দারে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে..."

গাড়ি ছুটছিল গিরীশ পার্কের দিকে।

"আপনি আমার ফ্ল্যাটের অ্যাড্রেস..."

মালিনী জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বাইরে দেখতে দেখতেই বলল, "গেস্ট হাউসের রেজিস্টার থেকে নরেনদা বের করে দিল।"

"নরেন? মানে..."

"সকালে আপনি বেরিয়ে যাবার পর ও ফিরে এসেছিল তো! আগের দিন রাতে ভয়ে পালিয়ে যেতে পরদিন ওর বউ নাকি বকেঝকে ফেরত পাঠিয়েছে। বলে, অতিথকে বিপদে ফেলে পালিয়েছ, ধম্মে সইবে না। তখন জ্বর নেমে গেছে দেখে খানিক ভরসা পেয়ে শেষে ট্রেকার ডেকে টাউনে এনে ডাক্তার দেখাল। ইউটিআই

হয়ে গিয়েছিল। আপার ট্র্যাক্টে। ডাক্তার বলছিল, রাত্তিরে জ্বরটা কন্ট্রোল হওয়াতে বেঁচে গিয়েছি নাকি। নইলে কিডনিতে পার্মানেন্ট ড্যামেজ হয়ে যেতে পারত।"

"ওষুধপত্র?"

"চলছে এখনও।"

কৌশিক চিন্তিত মুখে ঘুরে দেখল একবার তার দিকে, "এই কন্ডিশানে এভাবে একটা ইনফেকশনের রুগি ঘাঁটলেন এসে... কাজটা ঠিক করেননি আপনি।"

হঠাৎ একঝলকের জন্য সেই তীব্র চাউনিটা ফিরে এল মালিনীর চোখে। নাকের পাটাদুটো ফুলে উঠেছে তার, "না করলেই ভালো হত, তাই তো? আমি যখন ওভাবে শুয়ে পড়েছিলাম, আপনি সারাটা রাত আমার সঙ্গে থেকে ঠিক করেছিলেন? তখন বুদ্ধি করে চলবার কথা মনে হয়নি? আমি জ্বরবিকারের ঘোরে কী না কী বলে ফেলেছি, তখন বুদ্ধি করে একবার আমায় বলতে পারেননি, কতটা রিস্ক নিয়ে আমার প্রাণটা বাঁচিয়েছেন?

"অসুস্থ শরীর নিয়ে, ঠিকানা খুঁযে খুঁজে বাড়ি বয়ে এসে প্রাণটা বাঁচালাম, তার জন্য একট সিম্পল ধন্যবাদও দিলেন না। উলটে জাজ করতে বসেছেন? ওকে! ফ্ল্যাটে নামিয়ে দিয়ে আমি সোজা ফিরে যাচ্ছি তাহলে। আই ডোন্ট কেয়ার। আমি..."

একটা স্বস্তির হাসি ছড়িয়ে যাচ্ছিল কৌশিকের মুখে। এই মালিনীকে সে চেনে। রাগি, কথায় কথায় ফোঁস করে ওঠা মালিনী। সে একটু হেসে বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু এবেলাটা একেবারে আমার ওখানেই খেয়ে গেলে হত না? মানে, আমার কন্ডিশন যা, তাতে ভাতে-ভাত দুটি যদি করে দেন তাহলে আমিও দুটি..."

"হুঁঃ। তা চাল কি আছে বাড়িতে? নাকি সেটাও কিনে নিয়ে ঢুকতে হবে?"

কৌশিক তার দিকে তাকিয়ে হাসল, "কী যে বলেন! মা বলেন তণ্ডুল হলেন লক্ষ্মী। সবসময় ঘরে লক্ষ্মী রাখতে হয়। আমি এখন আর তত লক্ষ্মীছাড়া নই।"

...আবহমানকাল ধরে বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্পের মাধুর্যের গতিপথ এগিয়েছে— ছোটো-ছোটো গল্পের প্লট আমরা নিজেদের মধ্যে বুনে যাই, খুঁজে যাই। এই আখ্যানে লেখক একের পর এক দৃশ্যের অবতারণা করেন যার রেশ বুনে দেয় এক অপার কৌতূহল, আমরা নিজেরাই নিজেদের আবিষ্কার করি গল্প থেকে উঠে আসা বিভিন্ন চরিত্রে কিংবা নিজেরাই হয়ে উঠি এক-একটি চরিত্র !

শব্দ প্রকাশন
SHABDO PROKASHON
9 789394 659766